হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ গাযযালী (রহঃ)-এর
হাকিকাতে রূহ গ্রন্থের বাংলা রূপ

রূহ কি এবং কেমন

বাংলা অনুবাদ ও বিশ্লেষণ
আলহাজ্জ মাওলানা এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্‌শী
[এম.এম. (ফার্স্ট ক্লাস); ডি.এফ; বি.এ (অনার্স); এম.এ.
প্রাক্তন এম.ফিল রিসার্চ ফেলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]
(সহকারী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা)

রশীদ বুক হাউস
৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচীপত্র

কিছু কথা ১৩

দৃষ্টিপাত-(ক)

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রহঃ)-এর পরিচিতি ১৭
শিক্ষা-দীক্ষা ১৮
ইমামুল হারামাইনের পরিচয় ২০
সালজুক শাহী বংশ ২৪
উজিরে আজম নিজামুল মুলক ২৫
ইমাম গায্যালী (রহঃ) নিজামুল মুলকের দরবারে ২৭
ইমাম সাহেবের নির্জন বাস এবং নানাদেশ ভ্রমণ ৩৩
ইমাম সাহেবের পীর ৩৫
দামেশক গমন ও তথা থেকে প্রস্থান, অতঃপর বাইতুল মুকাদ্দাস তাশরীফ আনয়ন ৩৫
হজ্জ ও যিয়ারাত ৩৬
পুনরায় অধ্যাপনা ৩৮
শত্রুদের বিরোধিতা ৩৯
অধ্যাপনার জন্য পুনরায় অনুরোধ ও তা প্রত্যাখ্যান ৪৫
ইমাম গায্যালী (রহঃ)-এর রচনা ও গ্রন্থাবলি ৪৭

দৃষ্টিপাত-(খ)

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ গায্যালী (রহঃ)
সম্পর্কে মুফতি শাহ দীন যা লিখেছেন নাম ও পরিচয় ৫১
১। জীবন চরিত পরিক্রমা ৫১
২। মতবাদ এবং প্রভাব ৫৪
৩। তাঁর আন্তরিকতা ৫৬

গাযযালীর রচনাবলি ৫৮
এহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন ৫৯
ইন্তেকাল ৬২
পথিকের অগ্রবাক্য ৬৪
পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা ৬৭

প্রথম অধ্যায়

দিক দর্শন
"রূহ" ৭৫
মিছবাহুল লুগাত-এর বর্ণনা ৭৫
আল-কুরআনে 'রূহ' শব্দের ব্যবহার ৭৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেখুন একটু নজর করে ৮

তৃতীয় অধ্যায়

রূহের অস্তিত্ব ৮৬
রূহ এবং প্রবৃত্তি ৮৮
একটু আলোর ঝলক ৯০

চতুর্থ অধ্যায়

গভীরভাবে একটু ভাবুন ৯
১। শানে নুযূল ৯
২। এই আয়াতটি কোথায় নাযিল হয়েছিল ৯৫
৩। রূহ সম্পর্কে কারা প্রশ্ন করেছিল এবং প্রশ্নকারীদের উদ্দেশ্য কী ছিল ৯৬
৪। এই আয়াতে রূহ বলতে কী বুঝানো হয়েছে ৯৭
৫। প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কিত বিশ্লেষণ ১০০

পঞ্চম অধ্যায়

আল-কুরআনে 'নাফস' শব্দের ব্যবহার ১০৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

উর্দু অনুবাদকের ভূমিকা ১২১
মানবাত্মার স্বরূপ ১২১
বিশ্লেষণাত্মক পাদটীকা ১২৩
হাকীকতে রূহ গ্রন্থের সূচনা ১২৪
পরিপাটি রূপে সৃষ্টি করা এবং রূহ ফুঁকে দেয়ার প্রশ্ন ১২৪
রূহ ফুঁকার প্রশ্ন ১২৬
ফয়েয কাকে বলে ১২৮
বিশ্লেষণাত্মক পাদটীকা ১২৮

সপ্তম অধ্যায়

রূহ অনুচ্ছেদ ১৩০
সাজুয্য অনুচ্ছেদ ১৩১
সংযুক্ত অনুচ্ছেদ ১৩৩
আল্লাহর সুরতে আদম কথার অর্থ ১৩৯

অষ্টম অধ্যায়

বিশ্লেষণাত্মক পাদটীকা
রূহ সম্পর্কে আলোচনা ১৪৭
মানবাত্মা এক জাতীয় জিনিস ১৫৮
'আল্লাহর সুরতে আদম' কথার বিশ্লেষণ ১৬১
১৩. রূহ চিরন্তন (অপৃষ্ট) হওয়া সম্পর্কে মতামত ১৬৪
১৪. ফিরিশতাদের শ্রেণিভেদ ১৬৬
১৫. দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক স্থাপনের পঞ্চ পর্ব ১৬৯

নবম অধ্যায়

লাউহ্-কলম বলতে কী বুঝায়? ১৭০

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ

মৃত্যুর সাথে কিয়ামত কায়েম হওয়ার অর্থ ১৭১

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ

দেহশূন্যাবস্থায় আত্মার অবস্থান ১৭৩

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ ঃ মীযান ১৭৪

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ ঃ হিসাব প্রসঙ্গ ১৭৬

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ ঃ শাফায়াত ১৭৬

পাদটীকা

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ ঃ মীযান

১৬. মীযান পরিমাপ নিয়ন্ত্রক ১৭৭

উস্তরলাব ঃ বিশ্লেষণ

১৭. উস্তরলাব ১৭৯

বিশ্লেষণ ঃ শাফায়াত

১৮. শাফায়াত পাঁচ প্রকার ঃ ১৭৯

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ

১৯. দরূদ, যিয়ারতে রাওজা মুবারক, শাফায়াত ১৮১

অনুচ্ছেদ ঃ পুলসিরাত ১৮৩

দশম অধ্যায়

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ ঃ পুলসিরাত প্রসঙ্গ ১৮৪

পাদটীকা ঃ বীরত্ব ১৮৮

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ
আল্লাহতে বিশ্বাস, ফিরিশতা, ঐশীগ্রন্থ, রাসূল ও আখিরাতে ঈমান প্রসঙ্গে ১৮৮

পাদটীকা
নশ্বর সৃষ্টির জন্য ১৯১
২৪. নবী (আঃ)-দের প্রতি ঈমান আনার যৌক্তিক ভিত্তি ১৯২

একাদশ অধ্যায়

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ
জান্নাতের স্বাদ এবং সুখভোগ প্রসঙ্গ ১৯৫

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ
আযাবে কবর ১৯৮

বিশ্লেষণাত্মক পাদটীকা
২৬. আল্লাহর দীদার লাভ ২০১
২৭. জান্নাতে ছবির বাজার ২০২
২৮. কবরের আযাব ২০৩
৩১. আত্মার বিকল্প দেহ ২০৩

দ্বাদশ অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২.
নেক ও বদ আমল অন্যের খাতে লিপিবদ্ধ হওয়ার প্রমাণ ২০৯

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ
স্বপ্নে আল্লাহ তায়ালার দীদার লাভ ২১৩
'মিসাল' এবং 'মিস্‌ল'-এর তফাৎ ২১৫

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ

সারকথা ২২১

বিশ্লেষণাত্মক পাদটীকা

৩৩. লতীফা-ই কলবী, ইলম-ই শরীয়ত ও তরীকত ২২৩
৩৪. 'মুশাহাদা' নূর দর্শন ২২৪
৩৫. নেক ও বদ আমল অন্যের খাতে যাওয়া ২২৪
৩৬. খাবে মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দর্শন লাভ ২২৫
৩৭. সদৃশপূর্ণ উপমা প্রসঙ্গ ২২৬
৩৮. আল্লাহ্র কি ছবি সুরত আছে? ২২৬
৩৯. ইন্দ্রিয়ভূত বিষয় ২২৬
৪০. 'আকল' জ্ঞান বলতে কী বুঝায়? ২২৭
৪১. ইলম ও দুধের উপমা ২২৭
৪২. ইয়ন (জন্তু) প্রসঙ্গ ২২৭
৪৩. জিব্রাঈল দর্শন ২২৭
৪৪. দাহইয়া কাল্‌বীর সুরতে জিব্রাঈল (আঃ) ২২৮
৪৫. মানুষের সুরতে জিব্রাঈল (আঃ) ২২৮
উপসংহার ২২৯
উর্দু অনুবাদক কর্তৃক বিবৃত ঃ ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর জীবন কথা ২৫৪

দৃষ্টিপাত-(ক)

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্‌যালী (রহঃ)-এর পরিচিতি

প্রাচীন খোরাসান নামক প্রদেশটি ইতিহাসে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। তারই একটি জেলার নাম তুস। তুসের অন্তর্গত তাহেরান ও তাওকান নামক শহর দুটি তুলনামূলকভাবে তথাকার অন্যান্য শহর থেকে অধিক পরিচিত ছিল। হিজরী চারশো পঞ্চাশ সন মুতাবিক একহাজার আটান্ন খ্রিস্টাব্দে ইমাম গায্‌যালী (রহঃ) তাহেরান শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

ইমাম গায্‌যালী (রহঃ)-এর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ, উপাধি হুজ্জাতুল ইসলাম। আর গায্‌যালী নামে সারা দুনিয়ায় পরিচিত। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ এবং দাদার নামও মুহাম্মদ। আর পিতামহের নাম আহমদ। গায্‌যাল শব্দটির অর্থঃ সুতা বিক্রেতা বা যে সুতার ব্যবসা করে। ইমাম গায্‌যালী (রহঃ)-এর পিতা সুতার ব্যবসা করতেন। এ কারণে তাঁদের পারিবারিক পরিচয় হয়ে গিয়েছিল গায্‌যালী বলে। এরূপ যে ব্যক্তি আতরের ব্যবসা করে তাকে আত্তার বলা হয়।

কিন্তু আল্লামা সামআনী বলেন, তুস জেলার অন্তর্গত তাহেরান শহরের সংলগ্ন একটি গ্রাম গায্‌যালা নামে পরিচিত। ইমাম সাহেব সেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন বলেই তাকে গায্‌যালী বলা হয়। মূলতঃ আল্লামা সামআনীর একথার কোনো ভিত্তি নেই। কেননা তুস জেলায় গাযযালা নামক কোনো গ্রাম কখনো ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই ইমাম সাহেবের গায্‌যালী নামকরণের প্রথমোক্ত কারণটিই সত্য ও সঠিক বলে ধরে নিতে হবে।

ইমাম গায্‌যালী (রহঃ)-এর পিতা মুহাম্মদ যে কোন ঘটনাবশতঃ শিক্ষার আলো থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত ছিলেন। অবশ্য এজন্য সারা জীবন তিনি যথেষ্ট অনুতাপ করেছেন। আর যাতে করে তাঁর নিজের মতো স্বীয় সন্তান দু'টিও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না থাকে সে জন্য তিনি তাঁর সন্তান দু'টিকে উচ্চ শিক্ষিতরূপে গড়ে তুলবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কিন্তু মানুষ যা আশা করে সবক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁর আশা পূরণ

করেন না। এক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁর আশা পূরণ করেছিলেন কিন্তু তা ইমাম সাহেবের পিতার মাধ্যমে হয়নি। ইমাম গাযযালী (রহঃ) সমগ্র মুসলিম জগতে শ্রেষ্ঠ বিদ্বানরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর পিতা সে ক্ষেত্রে নিজে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেননি। কেননা তাঁর সন্তান দু'টি যখন একান্তই অপ্রাপ্তবয়স্ক, তেমনি অবস্থায় হঠাৎ একসময় তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করলেন। যখন তাঁর মৃত্যুসময় ঘনিয়ে এল তখন তিনি তার এক সূফী বন্ধুকে ডাকিয়ে এনে পুত্রদ্বয়—ইমাম সাহেব ও তাঁর ছোট ভ্রাতা আহমদ গাযযালীকে তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, হে প্রিয় ভ্রাতঃ! আমি নিজে লেখাপড়া কিছুই শিখতে পারিনি। তবে মনে আশা ছিল আমার ছেলে দু'টিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মনের মতো মানুষ করে তুলব; কিন্তু আমার সে আশা মনেই থেকে গেল। যে রোগে আমি আক্রান্ত হয়েছি মনে হচ্ছে এ রোগ থেকে আর আমি সেরে উঠব না। তাই তোমার নিকট আমার এই অনুরোধ থাকল, বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে তুমি আমার এই ছেলে দু'টির শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করবে।

শিক্ষা-দীক্ষা

পিতা মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁরা দু'ভাই উক্ত সূফী সাহেবের তত্ত্বাবধানে থেকে প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষায় মনোনিবেশ করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর একদা পিতৃবন্ধু তাদেরকে বললেন, তোমাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য তোমাদের পিতা আমার নিকট যে অর্থ গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন, তা শেষ হয়ে গেছে, তারপর আমার নিজের আর্থিক অবস্থাও তেমন সচ্ছল নয় যে, তোমাদের শিক্ষার ব্যয়ভার আমি বহন করতে পারি; সুতরাং আমার মতে তোমরা দু'ভাই এখন থেকে এমন কোনো মদ্রাসায় ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শুরু কর, যথাকার কর্তৃপক্ষ নিজেরাই গরিব শিক্ষার্থীদের খরচপত্র চালিয়ে নেয়। এমতাবস্থায় ইমাম সাহেব পিতৃবন্ধুর পরামর্শানুযায়ী নিজেই এরূপ কোনো মদ্রাসার খোঁজে বের হয়ে পড়লেন।

সে যুগে শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে প্রায় সবদেশে এরূপ প্রচলন ছিল যে, বিশিষ্ট আলিমগণ নিজ নিজ গৃহে অথবা মসজিদে ছাত্রদেরকে শিক্ষা

তালীম দিতেন এবং এসব ছাত্রের সমস্ত খরচ বহন করতেন স্থানীয় ধর্মপ্রাণ ধনী লোকগণ। এই অবস্থার ফলে দেশের ধনী-দরিদ্র যে কোনো শিক্ষার্থীই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হবার সুযোগ লাভ করত। ইমাম গায্যালী (রহঃ)-ও এরূপ একটি সুযোগ জুটিয়ে ফেললেন। তিনি ফিকাহ্ শাস্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়ের কিতাবসমূহ তাঁদেরই শহরের আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রাযকানীর নিকট সমাপ্ত করলেন। তারপর তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য জুরজান শহরে চলে গেলেন এবং সেখানে ইমাম আবু নছর ইসমাইলী (রহঃ)-এর নিকট শিক্ষা গ্রহণ শুরু করলেন। সেকালে নিয়ম ছিল, শিক্ষকগণ যে বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন ছাত্রগণ তা সাথে সাথে লিখে ফেলত। এ জাতীয় লিখে রাখা বস্তুগুলোকে তা'লীকাত বলা হতো।

এভাবে ইমাম আবু নছর ইসমাইলী (রহঃ)-এর নিকট কিছুকাল শিক্ষা লাভ করে ইমাম গায্যালী (রহঃ) জুরজান শহর থেকে স্ব-গৃহে ফিরবার পথে এক ভয়ানক বিপদে পতিত হলেন। পথিমধ্যে এক নির্জন স্থানে তিনি একদল দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হলেন। তাঁর অন্যান্য মালপত্রের সাথে স্ব-লিখিত তা'লীকাতগুলোও লুণ্ঠিত হলো। তাতে তিনি অত্যন্ত বিচলিত ও মর্মাহত হয়ে দস্যু সরদারের নিকট গিয়ে বললেন, আমার সব জিনিস তোমরা রেখে দিয়ে শুধু আমার লিখিত তা'লীকাতগুলো আমাকে ফেরত দাও। কারণ এগুলোর জন্যই আমি এই বিদেশে এসে বহু কষ্ট স্বীকার করেছি। পক্ষান্তরে, এ জিনিসগুলো দ্বারা তোমাদের কোনো লাভ হবে না। তাঁর কথা শুনে দস্যু সরদার হো হো করে হেসে উঠে বলল, বাঃ! তবে তো তুমি দেখছি, একটি বিদ্যার জাহাজ। এই লিখিত কাগজগুলোর মধ্যেই যদি তোমার বিদ্যা সীমাবদ্ধ থেকে থাকে তবে এক মূর্খ আর তোমার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তবে নাও, এগুলো না হলে যখন তোমার একেবারেই চলবে না বলছ তখন এগুলো তুমি নিয়ে যাও।

দস্যু সরদারের কথায় ইমাম সাহেব খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। তারপর গৃহে ফিরে গিয়ে নিজের লিখিত তা'লীকাতগুলো সম্পূর্ণই মুখস্থ করতে বসে গেলেন। একাদিক্রমে দীর্ঘ তিন বছর কঠোর পরিশ্রম করে তিনি তা'লীকাতগুলো সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ করে ফেললেন। সাথে সাথে তাঁর জ্ঞান-পিপাসা যেন আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। সুতরাং আরো অধিক ও উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য তিনি আবার গৃহত্যাগ করে বের হয়ে পড়লেন।

সময়টি ছিল তখন ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষার চরম উন্নতির যুগ। ইসলামি রাজ্যসমূহের প্রায় প্রত্যেক শহরে-নগরে হাজার হাজার দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত আলিম অবস্থান করতেন এবং প্রত্যেক আলিমেরই অন্ততঃ একটি করে নিজের শিক্ষাগার ছিল। তবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার পিঠস্থান ছিল তখন ইরাকের অন্তর্গত বাগদাদ নগরী এবং নিশাপুর শহর। নিশাপুর ছিল ইমাম সাহেবের বাসস্থানের নিকটবর্তী শহর। সুতরাং তিনি ব্যাপকতর শিক্ষা ও উচ্চতর জ্ঞান লাভের আগ্রহাতিশয্যে তথায় গিয়ে তৎকালীন খ্যাতনামা আলিম ইমামুল হারামাইনের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

এই নিশাপুরেই ইসলাম জগতের সর্বপ্রথম সাংগঠনিক শিক্ষাগার 'মাদ্রাসায়ে বায়হাকিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইমামুল হারামাইন এ মাদ্রাসারই ছাত্র ছিলেন। কারো কারো মতে অবশ্য মাদ্রাসায়ে বায়হাকিয়া সর্বপ্রথম মাদ্রাসা নয়; বরং বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসাই মুসলিম জাহানের প্রথম মাদ্রাসা। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন এই শেষোক্ত মতেরই সমর্থক। তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, বাগদাদের বহু পূর্বেই নিশাপুর শহর ইসলামি শিক্ষার পিঠস্থান হিসেবে গৌরব লাভে ধন্য হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহ। কেননা, অনেকেরই মতে বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হবার বহু পূর্ব থেকেই নিশাপুর বায়হাকিয়া, সাদিয়া ও নাসরিয়া প্রভৃতি মাদ্রাসাগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিয়মিত চলে আসছিল এবং এগুলোর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বনামধন্য শাসক সুলতান মাহমুদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নছর ইবনে সবুক্তগীন।

ইমামুল হারামাইনের পরিচয়

ইমামুল হারামাইনের প্রকৃত নাম আবদুল মালেক। জিয়াউদ্দিন তাঁর কুনিয়াত। পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর ইমামুল হারামাইনের হঠাৎ পিতৃবিয়োগ ঘটলে তিনি নিশাপুরের বায়হাকিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। প্রসিদ্ধ আলেম আবুল কাসেম আসকাফী তখন এই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। সেখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করে ইমামুল হারামাইন বাগদাদ গমন করেন এবং তথাকার আলিম-ওলামা, জ্ঞানী-গুণীদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করে তিনি বিশেষভাবে উপকৃত হন। এভাবে শিক্ষা-দীক্ষায় ও জ্ঞানে-গুণে সম্পূর্ণরূপে পরিপক্বতা লাভ করে

তিনি বাগদাদ থেকে নিশাপুরে প্রত্যাগমন করেন এবং তথাকার এক বড় মাদ্রাসায় শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন।

ঠিক এমনই সময় আমীর কান্দারীর ইঙ্গিতে বাদশাহ আলেফ আরসালান সালজুকি এক ফরমান জারি করলেন যে, এখন থেকে প্রত্যেক মসজিদে শুক্রবার জুমআর খুতবায় যেন ইমাম আবুল হাসান আশআরীর উপর অভিশাপ বর্ষণ করা হয়। ঘটনাক্রমে ইমামুল হারামাইন ছিলেন আশআরী সম্প্রদায়ের লোক। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই এ ফরমান জারিতে তিনি বিশেষভাবে মনঃক্ষুণ্ন হলেন। যার ফলে তিনি নিশাপুর ত্যাগ করে পবিত্র মক্কা ও মদীনায় চলে গেলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, তিনি শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞানে-গুণে সুপরিপক্ক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কাজেই তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও বিচক্ষণতার কারণে মক্কা ও মদীনায় তিনি যথেষ্ট মর্যাদা ও সম্মান অর্জন করেন। ফলে দু'টো স্থানেই তাঁর শিষ্যের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাছাড়া তাঁর আগমনের পর থেকে মক্কা ও মদীনার জটিল ফতোয়াসমূহ তাঁরই নিকট আসতে শুরু হয়। এমনিভাবে তাঁর খ্যাতি ও সুযশ বৃদ্ধি পেতে পেতে সবার নিকট তিনি ইমামুল হারামাইন উপাধিতে ভূষিত হন।

এদিকে বাদশাহ আলেফ আরসালান সালজুকী আমীর কান্দারীকে মন্ত্রিত্ব থেকে পদচ্যুত করে নিজামুল মুলককে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই নিজামুল মুলকের আদর্শ, চরিত্র, ন্যায়পরায়ণতা এবং সত্যনিষ্ঠার খ্যাতি সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর এসব গুণের কথা ইমামুল হারামাইনেরও কর্ণগোচর হয়। তিনি তখন হারামাইন তথা মক্কা-মদীনা থেকে বিদায় নিয়ে জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। জ্ঞানগ্রাহী মন্ত্রী নিজামুল মুলক জ্ঞানসমৃদ্ধ ইমামুল হারামাইনকে সাদরে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে অধ্যাপনার কাজে লাগিয়ে দেয়ার জন্য একটি বিরাট শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করেন। মন্ত্রী নিজামুল মুলকের নামানুসারেই ঐ শিক্ষাগার বা মাদ্রাসাটির নাম রাখা হয় মাদ্রাসায়ে নিজামিয়া।

ইমামুল হারামাইন আবুল মালেক কেবলমাত্র শিক্ষা-দীক্ষায়ই নেতৃস্থানীয় ছিলেন না; বরং মাযহাবের সুযোগ্য ওস্তাদ হিসেবেও পরিগণিত হয়েছিলেন। যেমন ইমামত, ওয়াজ-নসীহত, ধর্মীয় ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইত্যাদি যাবতীয় কাজের দায়িত্ব তাঁর উপরই ন্যস্ত ছিল। এমনকি

স্বয়ং বাদশাহও তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করতেন। একবার এরূপ একটি ব্যাপার ঘটে গেল—ইমামুল হারামাইন সুলতান মালিক শাহ্ সালজুকীর একটি শাহী ফরমান সম্বন্ধে ঘোষণা করলেন যে, মালিক শাহর এই ফরমান সম্পূর্ণ ভুল। এ ধরনের ভুল আদেশ জারি করার তাঁর কোনো অধিকার নেই। কিন্তু দেখা গেল বাদশাহ মালিক শাহ এই ব্যাপারে ইমামুল হারামাইনের কোনো বিরোধিতা না করে বা তাঁর বিরুদ্ধে কোনোরূপ উচ্চবাচ্য না করে বরং পুনরায় ঘোষণা করলেন যে, সত্যিই তাঁর আদেশটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। এ ব্যাপারে ইমামুল হারামাইন যা বলেছেন তা-ই সত্য ও নির্ভুল। মোটকথা ইমামুল হারামাইন এভাবে দেশের খোদ বাদশাহ থেকে শুরু করে আপামর জনসাধারণ প্রত্যেকের কাছে স্বীয় যোগ্যতার বলে সম্মানিত শ্রদ্ধেয়রূপে গণ্য ছিলেন।

ইমাম গায্যালী (রহঃ) এই মহান ব্যক্তির শিক্ষা-দীক্ষা ও যোগ্যতার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং গভীর আগ্রহ ও একান্ত মনোযোগের সাথে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞানার্জন করতে থাকেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি শিক্ষা গ্রহণ কার্য সমাপ্ত করেন এবং তখন থেকে নিজেকে সমগ্র দেশে একক ও অদ্বিতীয় আলিম হিসেবে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করে তুলেন।

ইমামুল হারামাইন প্রতিষ্ঠিত তাঁর নিজস্ব মাদ্রাসায় তখন মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল চার শতাধিক। তাঁদের মধ্যে হারেছি, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ খাদী এবং গায্যালী (রহঃ) প্রমুখই ছিলেন শ্রেষ্ঠ মেধাবী ও সুযোগ্য শিক্ষার্থী। অবশ্য হারেছি ও খাদী প্রমুখদের সুনাম ও যোগ্যতার গৌরব শুধু ততদিনই স্থায়ী ছিল, যতদিন তাঁরা শিক্ষার্থী জীবন যাপন করেছিলেন। শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর কর্মজীবনে পদার্পণ করে এমন কিছুই করতে পারেননি, যাতে করে তাঁরা তাঁদের শিক্ষাজীবনের সে গৌরবকে ধরে রাখতে পারেন।

পক্ষান্তরে, ইমাম গায্যালী (রহঃ) দুনিয়ায় আবির্ভূত হয়েছিলেন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও কালজয়ী প্রতিভা হিসেবে। তাই শিক্ষাজীবনের প্রথম লগ্ন থেকেই যে প্রতিভাসুলভ গৌরবরাশি তাঁর মধ্যে এসে দানা বেঁধেছিল, আমরণ ক্রমবর্ধমানরূপে তা তাঁর মধ্যে অক্ষুণ্ন এবং অব্যাহত ছিল। এমনকি জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর সে ব্যাপকতর গৌরব সমগ্র জগতে

ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অদ্যাবধি তা সারা মুসলিম জাহানে সম্পূর্ণ অম্লান ও প্রোজ্জ্বল রয়েছে।

ইমামুল হারামাইন চারশো আটাত্তর হিজরী সনে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র নিশাপুরে শোকের ছায়া নেমে আসে। একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত সারা শহরের সব দোকানপাট বন্ধ থাকে। আর মাদ্রাসার ছাত্রগণ সারাটি বছর ধরে এই বুযুর্গের জন্য গভীর শোক পালন করে। বস্তুতঃ যে যুগে তদঞ্চলের বিভিন্ন দেশেও তাঁর মতো প্রতিভাবান ও সর্বমুখী জ্ঞানী দ্বিতীয় কোনো আলিম ছিল না। সুতরাং তাঁর মৃত্যুতে আপামর জনসাধারণ যে এরূপভাবে শোকাভিভূত হয়ে পড়বে তাই তো স্বাভাবিক।

ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন লিখেছেন, ইমাম গায্যালী (রহঃ) ঐরূপ প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্ব ইমামুল হারামাইনের মতো লোকের জীবদ্দশায় সবারই শ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থন হন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ইমামুল হারামাইন তাঁর শিষ্য গায্যালী (রহঃ)-এর সাহায্য ও পরামর্শ নিয়ে বহু কাজ করেছেন, এতে তিনি কখনো কোনোরূপ দ্বিধাবোধ করেননি; বরং বিভিন্ন স্থানে সমাবেশে ও বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট তিনি তাঁর এই সুযোগ্য শিষ্যের শত প্রশংসা করেছেন ও তাঁর গৌরব বর্ধনমূলক নানারূপ আলাপ-আলোচনা করেছেন। মূলতঃ তিনি নিজেই এরূপ শিষ্যের ওস্তাদ হতে পারার জন্য নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতেন। পক্ষান্তরে, ইমাম গায্যালী (রহঃ)ও সৌভাগ্যক্রমে ইমামুল হারামাইনের মতো যোগ্য ওস্তাদের নিকট থেকে তাঁর শিক্ষা লাভের সুযোগ হওয়ায় নিজ জীবনকে সার্থক এবং ধন্য মনে করতেন এবং এজন্যই তিনি তাঁর এই ওস্তাদের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সংশ্রব ত্যাগ করেননি; বরং দীর্ঘ সময় তাঁর সাহচর্যে থেকে মনের মতো করে তাঁর থেকে সবরকম জ্ঞান আহরণ করেছেন। যাই হোক তাঁর এই মহান গুরুর ইন্তেকালের পরই তিনি নিশাপুর ত্যাগ করেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তখন সমগ্র মুসলিম জাহানে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলিম ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ। আর এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র আটাশ বছর।

সালজুক শাহী বংশ

পরিস্থিতিগত কারণে দেখা যায় যে, ইমাম গাযযালী (রহঃ) এ সময় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের তৎকালীন রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। সুতরাং এ কারণেই আমরা তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থাও কিছুটা এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি।

আব্বাসীয় খেলাফতের গৌরব-সূর্য তখন অস্তমিত প্রায়। তাদের দাপট ও শান-শওকত স্তিমিত হয়ে এসেছিল। সুতরাং আব্বাসীয় রাজবংশের এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের চারদিক থেকে তখন বিদ্রোহের ঝড় শুরু হয়ে গেল। যার ফলে সাম্রাজ্য এবং শাসন ক্ষমতার বহু দাবিদার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বিদ্রোহীদের পুরোভাগে দেখা গেল তুর্কি জাতিকে। সারা দুনিয়ায় তাদের প্রভুত্ব কায়েম করে ফেলল। মুসলিম জাহানের অধিকাংশ দেশেই তাদের বিজয় নিশান উড্ডীন হলো। ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর সময় সালজুক বংশই ছিল সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী। তুঘলক বেগ ছিলেন সালজুক বংশের প্রথম নরপতি। তিনি হিজরী চারশো উনত্রিশ সনের প্রথম দিকে তুস আক্রমণ করেন। এর আঠারো বছর পর চারশো সাতচল্লিশ হিজরীতে তিনি ইরাক জয় করেন। তারপর চারশো পঞ্চান্ন সনে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

তুঘলক বেগের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলেফ আরসালান রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিছুদিনের মধ্যে তিনিও পরলোক গমন করেন। তখন তাঁর পুত্র মালিক শাহ সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। এই মালিক শাহের শাসনামলেই সালজুকী সাম্রাজ্য শিক্ষা-দীক্ষায়, ধন-সম্পদে এবং বিজয় অভিযানে গৌরবময় শীর্ষস্থান অধিকার করে। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন লিখেছেন, সালজুকী শাসক মালিক শাহের আমলে তাঁর সাম্রাজ্য এতদূর বিস্তার লাভ করেছিল যে, অন্য কোনো সুলতানের আমলে তা সম্ভবপর হয়নি। তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল তুর্কের শেষ শহর কাশগড় থেকে সুদূর বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত।

উজিরে আজম নিজামুল মুলক

সুলতান মালিক শাহ অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। দেশের জনসাধারণের সুবিধার জন্য তিনি রাজ্যের নানাস্থানে কূপ খনন এবং অসংখ্য সেতু নির্মাণ করেছিলেন। তিনি দেশের জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধানে এমন কার্যকর ও শক্তিশালী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যে, তুর্কিস্তান থেকে শুরু করে সিরিয়ার শেষ সীমা পর্যন্ত যে কোনো বাণিজ্য কাফেলা কোনো প্রকার প্রহরী ও সতর্কতা অবলম্বন ব্যতীতই নির্বিঘ্নে যাতায়াত করত। কখনো কোথাও কোনোরূপ দুর্ঘটনা ঘটত না। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সালজুকী শাসকের এই গৌরবের মূলে ছিল, উজীরে আযম নিজামুল মুলকের অসাধারণ প্রতিভা ও তাঁর অবদান। এই উজীরে আযমের সাথে ছিল ইমাম গায্যালী (রহঃ)-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং গভীর হৃদ্যতা।

উজীরে আযম নিজামুল মুলকের প্রকৃত নাম হাসান ইবনে আলী। তিনি ইমাম গায্যালী (রহঃ)-এর জন্মস্থান তুস জেলার অন্তর্গত রাজকান পল্লির অধিবাসী—এক সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশের কৃতি সন্তান। হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান অর্জন করার পর তিনি অত্যধিকরূপে পার্থিব মোহের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। কীভাবে অজস্র ধন-সম্পদ, ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধি অর্জন করা যায়, কীভাবে মানব সমাজের উচ্চ গৌরবের অধিকারী হওয়া যায় সর্বক্ষণ এই চিন্তায় তিনি বিভোর থাকতেন। অচিরেই তাঁর এই চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-সাধনা ফলপ্রসূ হয়ে দেখা দিল। শীঘ্রই তিনি বলখ শাহী দরবারে মীর মুন্সির পদলাভ করলেন। তারপর ধীরে ধীরে সুলতান আলেফ আরসালানের মন্ত্রিত্ব পদে পদন্নোতি পেয়ে গেলেন। চারশো পঁয়ষট্টি হিজরী সনে আলেফ আরসালান মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি লেগে যায়। কিন্তু নিজামুল মুলকের বিশেষ বিচক্ষণতার ফলে মৃত সুলতানের অন্যতম পুত্র মালিক শাহ সিংহাসন অধিকারে সক্ষম হলেন। প্রকৃতপক্ষে মালিক শাহই ছিলেন ভ্রাতাদের মধ্যে সর্বাধিক যোগ্য। তবুও তিনি সিংহাসন অধিকার করার পর সাম্রাজ্য শাসনের সমস্ত দায়িত্ব উজীর নিজামুল মুলকের উপর ছেড়ে দিলেন। মালিক শাহ অতঃপর চারশো পঁচাশি হিজরী সনে মৃত্যুবরণ

করলেন। এই সুলতানের অধীনেই উজীর নিজামুল মুলক তাঁর যোগ্যতার বলে এমনভাবে সাম্রাজ্যের আয়তন ও গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন, যা মুসলিম খেলাফতি শাসনের পর আর কোনো সুলতানের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে নিজামুল মুলকের অবদান ছিল অতুলনীয়। মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্র তিনি মক্তব-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবার ব্যবস্থাও করে দেন। এমনকি আমর নামক একটি দ্বীপ যেখানে বাইরের লোকের কোনো গমনাগমন ছিল না-ই বলা চলে; সেখানেও তিনি একটি বিরাট মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার অস্তিত্ব তথায় আজও বিদ্যমান আছে।

আল্লামা কাজভীনী বলেন, ঐ সময় দেশের মাদ্রাসাগুলোর প্রতি বছরের খরচ ছিল লক্ষাধিক আশরাফী (স্বর্ণ দীনার)। এই খরচ সম্পূর্ণ সরকারি তহবিল থেকে বহন করা হতো। তাছাড়া নিজামুল মুলক নিজ ব্যক্তিগত সম্পত্তির এক-দশমাংশও দেশের শিক্ষা খাতে খরচ করতেন। সালজুকী আমলের প্রচলিত মুদ্রার মান ছিল এতদ্দেশীয় পঁচিশ টাকার সমান। নিজামুল মুলকের ব্যক্তিগত দান ব্যতিরেকেও মাদ্রাসাগুলোর উন্নয়নকল্পে বিভিন্নখাতে রাজভাণ্ডার হতে বার্ষিক অতিরিক্ত দেড় কোটি মুদ্রা ব্যয় করা হতো। বস্তুতঃ সে যুগে শিক্ষা খাতে ব্যয়ের এতবড় অঙ্ক আর কোনো দেশে দেখা যায়নি।

নিজামুল মুলক নিজে একজন প্রখ্যাত আলিম এবং জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এজন্যই তিনি জ্ঞানী-গুণীদের যথাযথ সম্মান করতে জানতেন। তৎকালে আবু আলী ফারমুদী সে দেশে শিক্ষা-দীক্ষায় শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন নিজামুল মুলকের দরবারে আগমন করতেন, তখন তিনি স্বীয় আসন ছেড়ে দিয়ে আবু আলী ফারমুদীকে বসতে দিতেন। ইমামুল হারমাইন এবং আবু ইসহাক সিরাজীকেও তিনি অত্যধিক সম্মান দেখাতেন। তাঁদের আগমন বার্তা শোনার সাথে সাথেই তিনি স্বয়ং দরবার থেকে বের হয়ে তাঁদেরকে সম্বর্ধনা জানাতেন। শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানী-গুণীদের প্রতি তার এরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণেই রাজকীয় দরবারটি একটি শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। শত সহস্র আলিম, জ্ঞানী-গুণী সর্বদা তাঁর

দরবারে বিনা বাধায় যাতায়াত করতেন এবং তাঁরা তথায় যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতেন। দরবারে আলিম এবং জ্ঞানী-গুণীদের আলাপ-আলোচনায় নিজামুল মুলক নিজেও শরিক হতেন। আর এভাবে তাঁদের থেকে তিনি বহু জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতেন।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) ছিলেন অত্যন্ত নম্র এবং বিনয়ী প্রকৃতির লোক। ইমামুল হারামাইনের সংশ্রবে থেকে তিনি তাঁকে গুণী ও জ্ঞানীদের যেভাবে সম্মান করতে দেখেছিলেন, নিজের চরিত্রেও তা তিনি ফুটিয়ে তুলতে সর্বদা যত্নবান থাকতেন। এ ঘটনাটিও তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, আবু ইসহাক সিরাজী যখন আব্বাসীয়দের বিশেষ দূত হিসেবে বাগদাদ থেকে নিশাপুর আসছিলেন তখন পথিমধ্যস্থ প্রত্যেকটি শহরের অধিবাসী তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে শহর থেকে বের হয়ে এসেছিল এবং প্রত্যেকেই তাঁকে নজর-নিয়াজ দিয়ে সম্মানিত করেছিল।

তিনি যখন নিশাপুর পৌছলেন, তখন ইমামুল হারামাইন তাঁকে প্রাচীরের বাইরে এসে সম্বর্ধনা জানালেন এবং তাঁর লাঠিখানা নিজ কাঁধে নিয়ে তাঁর সাথে সাথে চলতে লাগলেন। মোটকথা, আলিমদের সাথে এরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা মিশ্রিত আচার-ব্যবহার প্রত্যক্ষ করে এবং নিজে তা পুরোপুরিভাবে আয়ত্ত করেই শিক্ষায়তন থেকে বের হলেন এবং তারপর নিজামুল মুলকের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) নিজামুল মুলকের দরবারে

হযরত ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর জ্ঞান ও গুণ-গরিমার কথা পূর্ব থেকেই দূর-দূরান্তে পৌছে গিয়েছিল। নিজামুল মুলকও এ খবর ভালোভাবে রাখতেন। তাই তিনি যখন নিজামুল মুলকের দরবারে উপস্থিত হলেন তখন তাঁকে যথেষ্ট সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে সম্মানিত আসনে বসতে দিলেন।

উল্লেখ্য যে, সে যুগে কারো জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা-দীক্ষা, বিচক্ষণতা ও যোগ্যতা পরিমাপ করার মাপকাঠি ছিল তর্কযুদ্ধ। এজন্য সময় সময় আমীর-উমারাদের দরবারে আলিম-ওলামাদের বিতর্কানুষ্ঠান বা তর্কযুদ্ধের আসর বসত। যিনি তর্কযুদ্ধে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল এবং জব্দ করতে

পারতেন তাকে বিজয় মালা পরিয়ে শাহী দরবার হতে সম্মানিত করা হতো। ক্রমে ক্রমে এই তর্কযুদ্ধ এতবেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, প্রায়ই বড় বড় শহরে বিশেষ জাঁকজমকের সাথে আলিম-ওলামাদের বিতর্কানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতো। জনসাধারণ বিশেষ আগ্রহের সাথে এসব তর্কসভায় যোগদান করতেন। কালক্রমে এই তর্কযুদ্ধ অনুষ্ঠান একটি প্রচলিত নিয়মে পরিণত হলো।

ইমাম গায্যালী (রহঃ) যখন নিজামুল-মুলকের রাজ দরবারে উপস্থিত হলেন তখন প্রচলিত স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই এ জাতীয় একটি তর্কযুদ্ধের মজলিসের ব্যবস্থা করা হলো। এমনকি পর পর বিভিন্ন বিষয়ের উপর কয়েকটি তর্কযুদ্ধে তিনি বিশেষ দক্ষতার সাথে জয়লাভ করলেন। সাথে সাথে তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং সবলোকেই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

নিজামুল মুলক এতদিন দূর থেকে ইমাম সাহেবের যোগ্যতার সংবাদ শুনে এসেছিলেন। এবার চোখের সামনে সন্দেহাতীতরূপে তা প্রত্যক্ষ করে তাঁকে নিজামিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করলেন। এ সময় ইমাম সাহেবের বয়স মাত্র চৌত্রিশ বছর। বলা বাহুল্য যে, ইতোপূর্বে এত অল্প বয়সে নিজামিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হওয়ার আর কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। উক্ত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদ লাভ করাই কিরূপ দুর্লভ ও সম্মানজনক ছিল, সে সম্বন্ধে শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ঐ মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করার আকাঙ্ক্ষায় বহু আলিম প্রতীক্ষা করে করে কবরে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তথাপি তাদের মনের আশা পূর্ণ হয়নি।

স্বনামখ্যাত আলিম ও বুযুর্গ ফখরুল ইসলাম শাশী মুহাম্মদ ইবনে আহমদ নিজামিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁর অন্তর এক অভাবনীয় ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে উঠে। তিনি ভাবের আধিক্যে অশ্রু গদগদ কণ্ঠে নিম্নোক্ত মর্মের কবিতাটির আবৃত্তি করেন।

"কী বলব, যোগ্য আলিম থেকে বিশ্বজগৎ আজ খালি হয়ে গেছে। তাই আমার মতো অযোগ্য অধমকে নেতৃত্বের আসনে বসানো হয়েছে। যদি এভাবে আলিমশূন্য হয়ে না যেত তবে সত্যিই আমার মতো গুণহীন ব্যক্তির নেতৃত্বের আসন লাভ জগতের জন্য এক দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হতো।"

চারশো চুরাশি হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে ইমাম গায্যালী (রহঃ) অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা সহকারে বাগদাদ নগরীতে প্রবেশ করতঃ নিজামিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করেন। অতঃপর কিছুদিনের মধ্যেই এ পদে তাঁর যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ সবার নিকট পরিস্ফুট হয়। এমনকি তাঁর ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী জ্ঞান-গরিমা এবং বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়ে স্বয়ং সুলতান তাঁকে নিজ মন্ত্রী সভার অন্যতম সদস্যরূপে গ্রহণ করেন। তাঁর বুদ্ধির প্রখরতায় আমীর-উমারা ও মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যগণ প্রত্যেকেই তাঁর গুণগ্রাহীরূপে পরিণত হয়ে যান। ক্রমে ক্রমে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, যে কোনো সমস্যা-সঙ্কুল ব্যাপার সমাধানে তাঁর থেকে পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক হিসেবে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ঐ সময় ইসলামের কৃষ্টি ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল সালজুকী সাম্রাজ্য এবং আব্বাসীয় রাজ্য। ইমাম সাহেব এই উভয় দেশের সমতুল্য ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে পড়লেন।

চারশো পঁচাশি হিজরী সনে সুলতান মালিক শাহ সালজুকী মৃত্যুবরণ করলে শাহী মহলের তুরকান খাতুন দরবারের আমীর-উমারা ও উজীরগণকে চাপ দিতে লাগলেন যে, সুলতানের চার বছর বয়স্ক পুত্র মাহমুদকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করানো হোক। সাথে সাথে বাগদাদের খলীফা মুকতাদির বিল্লাহ্ তাঁর নামে খুতবাহ্ পড়ার জন্য অনুরোধ করলেন। খলীফাও নিজের দুর্বলতার কারণে অগত্যা এতেই রাজি হলেন যে, সাম্রাজ্যের যাবতীয় কাজকর্ম তুরকান খাতুনের নামে পরিচালিত হবে এবং খুতবাহ আব্বাসীয় বংশের নামে পাঠ করা হবে।

এদিকে তুরকান খাতুন বেঁকে বসলেন, ।তিনি বললেন, মুদ্রায় আমার নাম অঙ্কিত হবে। ফলে সমস্যার কোনো সমাধান না হওয়ায় ইমাম গায্যালী (রহঃ)-কে প্রতিনিধি হিসেবে তুরকান খাতুনের নিকট প্রেরণ করা হলো। ইমাম সাহেবের অমায়িক ব্যবহার এবং অকাট্য যুক্তির নিকট হার মেনে তুরকান খাতুন নিজের দাবি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হলেন। আর এভাবে এক অবধারিত রক্তক্ষয়ী বিরাট সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। হিজরী চারশো ছিয়াশি সনে মুকতাদির বিল্লাহ্ মারা গেলে মুসতাজহার বিল্লাহ খলীফার আসন অলংকৃত করলেন। তাঁর শাসনভার গ্রহণ অনুষ্ঠানে ইমাম গায্যালী (রহঃ)-ও উপস্থিত ছিলেন।

খলীফা মুসতাজহার বিল্লাহ একজন যথেষ্ট বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তাই শিক্ষিত ও শিক্ষাবিদদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর মর্যাদাবোধ এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি। সুতরাং অত্যল্পকালের মধ্যেই তিনি ইমাম গায্যালী (রহঃ)-এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হলেন এবং উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় হৃদ্যতার সৃষ্টি হলো। এদিকে বাত্বেনিয়া সম্প্রদায় এ সময় সারাদেশে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির সৃষ্টি শুরু করেছিল। তখন খলীফা ইমাম গায্যালী (রহঃ)-কে এই মর্মে অনুরোধ জানালেন যে, আপনি এদের বিরুদ্ধে একখানি উপযুক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম সাহেব খলীফার অনুরোধে শীঘ্রই একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন এবং খলীফার নামানুসারে গ্রন্থখানার নাম রাখলেন 'মুসতাজহারী'।

একদিকে তিনি গ্রন্থ রচনার কাজে নিবিষ্ট থাকতেন অন্যদিকে জনসাধারণের মাঝে ওয়াজ-নসীহতেও সময় দিতেন। তাঁর সেই মূল্যবান ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশাবলি শায়খ সাঈদ ইবনে কায়েস লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। পরে ঐ ওয়াজ-নসীহত এবং উপদেশাবলি দ্বারা একখানা বিরাট গ্রন্থ প্রস্তুত করে তার নাম দেয়া হলো "মাজালেসে গায্যালীয়া"। ইমাম সাহেবকে পাণ্ডুলিপিখানা দেখানো হলো, তিনি তা মনোযোগের সাথে দেখে তার ভুল-ত্রুটিগুলো স্বহস্তেই সংশোধন করে দিয়েছিলেন।

ইমাম সাহেবের নির্জন বাস এবং নানাদেশ ভ্রমণ

জগতের বহু সূফী-সাধক ও সংসার-বিরাগী ব্যক্তিই নির্জন বাস অবলম্বন করেছেন। কিন্তু ইমাম সাহেবের লৌকিক সংসার পরিত্যাগ করা একটি বিস্ময়কর ঘটনা। এই সম্বন্ধে তিনি তাঁর রচিত "আল-মুনকায মিনাদ দালাল' গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম গায্যালী (রহঃ)-এর শিক্ষার মূল মর্মই ছিল, স্বীয় মাযহাব ব্যতীত অন্য কোনো মাযহাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা এবং ভিন্ন মাযহাব সম্বন্ধে অতিরিক্ত ঘাঁটাঘাঁটি করতে না যাওয়া। কিন্তু তিনি জীবনের প্রথম অবস্থা থেকেই যে কোনো মাযহাবের লোকের সাথে সমস্ত বিষয়েই আলাপ-আলোচনা করতেন। ঐ সময় নিশাপুরে সালজুকী শাসনের প্রাবল্য ও প্রাধান্য থাকায় তাদের মাযহাব ব্যতীত অন্যান্য মাযহাবের তেমন কোনো প্রচলন ছিল না। পক্ষান্তরে, বাগদাদ ছিল যে কোনো মাযহাবের

মতবাদ ও আলাপ-আলোচনা বা সমালোচনার কেন্দ্রস্থল। মোটকথা যে কোনো মাযহাবের লোকই এখানে থেকে অন্যের সাথে আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হতে পারত। কেউ-ই কাউকে এ ব্যাপারে আইনতঃ বাধা দিতে পারত না।

ইমাম গায্যালী (রহঃ) বাগদাদ গমন করে বিভিন্ন মাযহাবের লোকের সাথে মেলামেশা করতঃ তাদের মতবাদ সম্বন্ধে অবগত হলেন। যার ফলে তাঁর জীবনধারা ও মতবাদ-মনোভাব এক ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে লাগল। এ সম্বন্ধে ইমাম সাহেব নিজেই বলেন—

"প্রথম থেকেই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, সঠিক এবং নির্ভুল তত্ত্বের অনুসন্ধান করা। তাই সর্বশ্রেণির লোকের সংস্পর্শে এসে ক্রমশঃ আমার মনে হতো আমি যে মতবাদে বিশ্বাসী তার ভিত্তি বুঝি শিথিল হয়ে গেল। এরপর ধারণা হলো—এই ধরনের অনুকরণীয় মতবাদে তো ইয়াহুদি এবং খ্রিষ্টান সবাই বিশ্বাসী। কিন্তু এটা তো প্রকৃত জ্ঞান নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, দশ-এর সংখ্যা তিন-এর সংখ্যা থেকে অধিক। এখন যদি কেউ বলে যে, না, তিন-এর সংখ্যাই দশ-এর সংখ্যা থেকে অধিক। আর বলে হাঁ, আমার কথাই ঠিক, কারণ আমি লাঠি দিয়ে সাপ বানাতে পারি। অতঃপর সে সাপ তৈরি করেও দেখায়, তবুও আমি বলব, সাপ তৈরি দ্বারা এটা কখনো সত্যি বলতে পারে না যে, দশ-এর চেয়ে তিন-এর সংখ্যা অধিক।

তাই আমি চিন্তা করতে লাগলাম যে, এরূপ মৌলিক জ্ঞান আমি কতটা অর্জন করতে পেরেছি। চিন্তা করে দেখলাম, অনুভূত এবং প্রমাণিত বস্তু এবং জ্ঞান ব্যতীত আমার আর অন্য কিছু নেই। এরপর তথ্যানুসন্ধানের অবস্থা যখন বেড়ে গেল, তখন বাস্তব অস্তিত্বের প্রতিও সন্দেহের উদ্রেক হলো। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন হলো যে, কোনোকিছুর প্রতিই আর বিশ্বাস রইল না। এভাবে দুটি মাস অতীত হবার পর আল্লাহর অনুগ্রহে এই অবস্থা কিছুটা শিথিল হলেও মাযহাব সম্বন্ধীয় সন্দেহ যথাযথভাবেই থেকে গেল। মুতাকাল্লিমীন, বাত্বেনীয়া, দার্শনিক ও সূফী এই চারটি সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটির মতবাদ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু করলাম।

এরপর আমি তর্কশাস্ত্র সম্পর্কিত পূর্ববর্তীদের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করলাম কিন্তু কোনো কিছুতেই আমি তৃপ্তি পেলাম না। কেননা তার

সারমর্ম থেকে যা উদ্ভব হয়ে আসে, তা হয়তো কোনো ইমামের অনুসরণ অথবা ইজমা কিংবা কুরআন ও হাদীসের "নস" ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। অথচ এগুলোর কোনোটিই সে সব লোকের প্রতিকূলে প্রমাণস্বরূপ পেশ করা যেতে পারে না। কারণ তারা প্রকাশ্য বস্তু ব্যতীত অন্য কোনো কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

দর্শন শাস্ত্রের যে পরিমাণ অংশ অবধারিত ও সুনিশ্চিত সত্য, তা কোনো মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত নয়। পক্ষান্তরে, 'খোদাতত্ত্ব' নামক যে অংশটি সম্পৃক্ত তা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বাত্বেনিয়া সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ মতবাদ ইমামের অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ইমামের তত্ত্ব ও তথ্যজ্ঞান যে সম্পূর্ণ সঠিক ও নির্ভুল তার প্রমাণ কোথায়?

অবশেষে আমি সূফীবাদ বা তাছাওফ তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি মনোনিবেশ করলাম এবং এই মতবাদের উপর ইমাম জুনায়েদ বাগদাদী, শিবলী ও বায়েজিদ বোস্তামী প্রমুখ মহাত্মা ও মহামনীষীদের রচিত গ্রন্থসমূহ পাঠ করলাম। দেখা গেল, কেবলমাত্র ইলম দ্বারা নয়; বরং ইলম ও আমল উভয়ের দ্বারা ওটা অর্জন করা সম্ভব। আর আলেমের জন্য প্রয়োজন পরিশ্রম ও পরহেজগারী। এদিকে আমার নিজের মধ্যেও খুলুছিয়তের অভাব ছিল। তদুপরি বিভিন্নমুখী শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি ছিলাম আমি দারুণ আগ্রহী। কারণ তখন সম্মান ও মর্যাদা অর্জনের প্রধান ও প্রকৃত পন্থাই ছিল নানাবিধ জ্ঞানার্জন ও তা অকৃপণভাবে বিতরণ। তাই চারশো আটাশি হিজরী সনের কোনো এক সময় আমার মনে খেয়াল চাপল যে, সবকিছু ছেড়ে দিয়ে যা করে চলেছি তা পরিত্যাগ করে কোথাও চলে যাই। আমার মনের এই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থার মধ্যে প্রায় ছ'টি মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। নিজের মনকে বুঝাতে ও শাসাতে লাগলাম— যেভাবে হোক এই যে সম্মান, মর্যাদা, খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছি, অবশ্যই এগুলো বিসর্জন দিতে হবে।

যখন আমার মনে এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা ও ধারণা প্রবল আকার ধারণ করল তখন আমার মাদ্রাসার অধ্যাপনা ও জনসাধারণের সাথে কথাবার্তা বলা ও আলাপ-আলোচনা করা পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেল। আরো নানারূপ উপসর্গ দেখা দিল। সাথে সাথে পাকস্থলির

ত্রুটিজনিত কারণে হজমী শক্তি হ্রাস পাওয়ায় আমি পানাহার পর্যন্ত ত্যাগ করলাম। নিজের অনাগ্রহ সত্ত্বেও শুভাকাঙ্ক্ষীগণ চিকিৎসক ডেকে আনল। এক বড় চিকিৎসক আমাকে বললেন, আপনার মন-মানসিকতায় যে চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক হয়েছে, তা বলবৎ থাকলে আপনার জন্য কোনো চিকিৎসাই ফলপ্রসূ হবে না। আমি নিজের রোগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলাম। তাই চিকিৎসকের সাথে বৃথা বাক্যব্যয় না করে তাকে সহজেই বিদায় করে দিলাম।

শেষ পর্যন্ত আমি দেশত্যাগ করে বিদেশ ভ্রমণে বের হওয়ার দৃঢ়সংকল্প করে ফেললাম। আমার এই সঙ্কল্পের কথা শুনে ওলামা সম্প্রদায় ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সবাই একবাক্যে আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, আপনার এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ হবে ইসলামের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। আমরা একথা চিন্তা করতে পারি না যে, জনসাধারণের উপকার ও এরূপ একটি ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করা আপনার পক্ষে কীভাবে সম্ভব হতে পারে? কিন্তু যেই যা বলুক না কেন, কোনো ফলোদয় হলো না।

ইমাম গায্যালী (রহঃ) কারো কথায় কর্ণপাত না করে স্বীয় সঙ্কল্পেই অটল থাকলেন। ইবনে খালদুন বলেন, হিজরী সন চারশো আটাশির কোনো এক সময় ইমাম সাহেব তাঁর রাজকীয় শান-শওকত ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করে একখানি কম্বল মাত্র সম্বল করতঃ সিরিয়ার পথে বের হয়ে পড়লেন। এ সময় তিনি পানাহার প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিলেন। একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত অভুক্ত থাকায় ক্ষুধায় যখন একেবারে অস্থির হয়ে পড়তেন তখন সামান্য শাক-সবজি আহার করে জীবন রক্ষা করতেন।

কোনো কোনো গ্রন্থের বর্ণনায় এরূপ দেখা যায় যে, ইমাম সাহেব এভাবে সংসার ত্যাগ করার পরিকল্পনা বেশ কিছুদিন পূর্ব থেকেই করে রেখেছিলেন। কিন্তু সংসারের নানারূপ সম্পর্কের রজ্জু ছিন্ন করা সহজ কার্য নয়। তাই সংকল্প কার্যকর করে তুলতে তাঁকে বেশ কিছু সময় নিতে হলো। প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি—একদিন ইমাম সাহেব কোনো এক মজলিসে ওয়াজ করছিলেন, ঘটনাক্রমে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আহমদ গায্যালী যিনি একজন বিখ্যাত কামিল সূফী ছিলেন; তিনিও ঐ মজলিসে সেদিন উপস্থিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে লক্ষ্য করে একটি কবিতার কতিপয় পংক্তি আবৃত্তি করলেন। কবিতার মর্ম এরূপ—

"তুমি আমাকে হেদায়েত করে চলেছ অথচ নিজে সুপথ প্রাপ্তির চেষ্টা করছ না। অন্যকে এত ওয়াজ-নসীহত করছ অথচ তুমি তো নিজে শুনছ না। হে নিষ্প্রাণ ও নির্জীব পাথর! আর কতদিন তুমি এভাবে লোহাকে ধার দিতে থাকবে? অথচ তুমি নিজে ধারালো হওয়ার জন্য কোনো চেষ্টাই করছ না।"

উল্লেখ্য যে, কনিষ্ঠ ভ্রাতার এই পংক্তি ক'টি ইমাম সাহেবের অশান্ত ও উদভ্রান্ত মনকে একটি বড় রকমের ধাক্কা দিল। তাই তিনি মনে মনে যে সঙ্কল্প করে রেখেছিলেন, তা আরো দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

সিরিয়া পৌঁছে ইমাম সাহেব তাঁর দৈনন্দিন কাজগুলো একটি নিয়ম-মাফিক করে যেতে লাগলেন। তিনি তথাকার বিখ্যাত জামেয়ায়ে উমুভীর পশ্চিম দিকস্থ মিনারে আরোহণ করে তার দরজা বন্ধ করে দিতেন এবং সারাদিন মুরাকাবাহ ও মুশাহাদায় লিপ্ত থাকতেন। এভাবে প্রায় দু'টি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। তথাকার লোকগণ তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল যে, আপনার মতো মহান ব্যক্তি যখন আপনা থেকেই আমাদের এখানে তাশরীফ এনেছেন এ আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে। যখন আপনাকে আমরা আল্লাহর রহমতে পেয়েই গেলাম তখন আর আপনি আমাদের কিছু উপকার করতে অবহেলা কেন করবেন? আপনার নিকট আমাদের এতটুকু দাবি যে, যতদিন আপনি এখানে অবস্থান করবেন ততদিন জামেয়ার শিক্ষার্থীদেরকে কতটুকু সময় তালীম দিয়ে বাধিত করবেন। ইমাম সাহেব তাদের এই অনুরোধ রক্ষা করে জামেয়ার পশ্চিম পার্শ্বস্থ একটি কক্ষে বসে শিক্ষার্থীদের কিছুদিন তালীম প্রদান করতে লাগলেন।

ইমাম সাহেব নিজেই বর্ণনা করেছেন, মুরাকাবাহ মুশাহাদাহর নিয়ম-কানুন আমি তাছাওফের গ্রন্থসমূহ পাঠে শিক্ষালাভ করেছি। তবে এত সাফল্য লাভ করার জন্য কিতাবী ইলমই যথেষ্ট নয়; বরং তার জন্য প্রয়োজন কোনো কামিল মুরশিদের বায়আত গ্রহণ করা। তবে তিনি কোন মুরশিদের হাতে নিজে বায়আত করেছিলেন, সে সম্পর্কে অনেক জীবনীকারই নীরব থেকেছেন। অবশ্য কতিপয় ঐতিহাসিকের মতে, ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর শায়খ ও মুরশিদ ছিলেন হযরত শায়খ আবু আলী ফারমাদী (রহঃ)।

ইমাম সাহেবের পীর

শায়খ আবু আলী ফারমাদী (রহঃ) তৎকালে একজন সুবিখ্যাত বুযুর্গ ও কামিল সূফী ছিলেন। শাহী দরবারেও তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। খোদ নিজামুল মুলক তাঁকে এত বেশি সম্মান করতেন যে, তিনি কখনো তাঁর দরবারে পদার্পণ করলে নিজামুল মুলক স্বীয় আসন থেকে উঠে পড়তেন এবং ফারমাদী (রহঃ)-কে তাঁর রাজাসনে উপবেশন করাতেন। তারপর নিজে অতি বিনয়ের সাথে দরবারে অন্য আসনে উপবিষ্ট হতেন। অথচ নিজামুল মুলকের দরবারে ইমামুল হারামাইন এবং আবুল কাসেম কুশাইরীর আগমনে তিনি কেবলমাত্র উঠে দাঁড়িয়ে তাদেরকে সম্ভাষণ জানাতেন, এর বেশি আর কিছু করতেন না। কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, এসব আলিম দরবারে এসে সম্মুখেই আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যান। যার ফলে আমার জন্য স্বেচ্ছাচারিতার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, শায়খ আবু আলী ফারমাদী আমার সামনেই আমার দোষ-ত্রুটিগুলো আলোচনা করেন এবং আমাকে জনসাধারণের প্রতি অত্যাচার, অনাচার ও উৎপীড়ন করতে নিষেধ করেন। ইমাম গায্যালী (রহঃ) সম্ভবতঃ ছাত্র জীবনে যখন তাঁর বয়স সাতাশ বছর তখন এই বুযুর্গের নিকট ইলমে বাত্বেনের দীক্ষা নিয়েছিলেন।

দামেশক গমন ও তথা থেকে প্রস্থান, অতঃপর বাইতুল মুকাদ্দাস তাশরীফ আনয়ন

সিরিয়ায় দু'বছর অতিবাহিত করার পর ইমাম সাহেব বাইতুল মুকাদ্দাস যাওয়ার অভিপ্রায়ে রওয়ানা করে পথে দামেশকে উপস্থিত হন এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করবেন বলে নিয়ত করেন। তথায় অবস্থানকালে দামেশকের সুবিখ্যাত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান মদ্রাসায়ে আমিনিয়া পরিদর্শনের খেয়ালে একদা তথায় উপস্থিত হন। এ সময় একজন প্রধান অধ্যাপক কোনো এক বিষয়ে তালীম দিতে গিয়ে এরূপ বলছিলেন যে, এই ব্যাপারে ইমাম গায্যালী এই মতবাদ পোষণ করেন এবং তা-ই অন্যান্য মতবাদ থেকে দৃঢ় ও তত্ত্বভিত্তিক। উক্ত অধ্যাপক অবশ্য ইমাম

গাযযালী (রহঃ)-কে প্রত্যক্ষভাবে চিনতেন না। তাঁর মুখে একথা শুনে ইমাম সাহেব আত্ম-গৌরবের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, একথা মনে করেই দ্রুত সেখান থেকে উঠে এলেন এবং কিছু সময়ের মধ্যেই দামেশক পরিত্যাগ করে বাইতুল মুকাদ্দাস রওয়ানা হলেন। যদিও কয়েকদিন দামেশকে অবস্থান করা তাঁর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অহংকার উজ্জীবিত হওয়ার আশঙ্কায় তিনি এক মুহূর্ত তথায় থাকা নিজের জন্য নিরাপদ মনে করলেন না। বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছে সেখানে তিনি রুদ্ধদ্বার কক্ষে দিবানিশি মুরাকাবাহ মুশাহাদায়ই নিমজ্জিত থাকলেন। লোকসমক্ষে বের হওয়া যেন তিনি নিজের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করলেন।

হজ্জ ও যিয়ারাত

নীরব নিস্তব্ধভাবে বাইতুল মুকাদ্দাসের যিয়ারাত কার্য সমাপনের পর ইমাম সাহেব হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পবিত্র মাযার মাকামে খলীলে উপস্থিত হলেন। এরপর তিনি হজ্জ আদায় করার উদ্দেশ্যে তথা হতে মক্কা ও মদীনার পথে রওনা হলেন। এ সময় তিনি দীর্ঘদিন মদীনায় অবস্থান করেছিলেন। এই সফরকালীন অবস্থায়ই মিসর এবং এসকান্দারিয়ায় অবস্থানও করেছিলেন।

ইবনে খালদুন বলেন যে, এসকান্দারিয়া থেকে ইউছুফ ইবনে তাশফীনের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে ইমাম সাহেব মারাকাশ গমনের ইচ্ছা করেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ জানতে পেরে তিনি মারাকাশ গমনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন।

বিদেশে ভ্রমণকালে ইমাম সাহেব যে কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করেছিলেন, তা সত্যি বিস্ময়কর। ভ্রমণাবস্থায় একদা একব্যক্তি ইমাম সাহেবকে একটি ছোট পানির মশক হাতে জনমানবহীন মরুপথে মামুলি পোশাক পরিহিতাবস্থায় দেখতে পেল। ইতোপূর্বে এক সময় এই ব্যক্তি তাঁকে চার শতাধিক ছাত্র পরিবেষ্টিতাবস্থায় অধ্যাপনার কাজে ব্যাপৃত দেখেছিল। তাই সে বিস্ময়াভিভূত হয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার পূর্ববর্তী কাজ থেকে একাজ কি আপনার নিকট উত্তম বোধ হয়? ইমাম সাহেব তার মুখে

এরূপ কথা শুনে একবার মাত্র তার দিকে অবহেলার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আপন মনে নিজের পথে চলে গেলেন।

ইমাম গায্যালী (রহঃ) মাকামে খলীলে পৌঁছে মনে মনে তিনটি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। যেমন, আর কোনোদিন কোনো বাদশাহর দরবারে যাব না, তাদের প্রেরিত হাদিয়া, উপঢৌকন গ্রহণ করব না এবং বাহাছ-মুবাহাছা অর্থাৎ তর্কযুদ্ধে অংশগ্রহণ করব না। বলাবাহুল্য যে, তিনি এই প্রতিজ্ঞাগুলো জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পালন করেছিলেন।

ঐতিহাসিক ইবনে আসীর তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এই সফরকালীনই ইমাম সাহেব তাঁর সুবিখ্যাত অমর গ্রন্থ এহইয়াউ উলূমিদ্দীন রচনা আরম্ভ করেন। দামেশক নগরীর হাজার হাজার শিক্ষাবিদ এই গ্রন্থখানি তাঁর নিজের নিকট অধ্যয়ন করেন। অবশ্য কোনো কোনো ঐতিহাসিক আবার এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক ইবনে আসীরের নিকট এরূপ প্রশ্ন রেখেছেন যে, ইমাম গায্যালী (রহঃ)-এর ন্যায় একজন উদাসচিত্ত ও অনিয়মতান্ত্রিক ব্যক্তির পক্ষে বহু ক্লেশ স্বীকার করে বিদেশ ভ্রমণের সময় এ ধরনের চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ এত উচ্চাঙ্গের অমূল্য গ্রন্থ রচনা করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে?

তাদের এ প্রশ্নটি একেবারে অমূলক নয়। এটা সহজেই উড়িয়ে দেয়া যায় না। কারণ তিনি তখন যেরূপ উদাস অবস্থায় সফরে বের হয়েছিলেন, তখন তাঁর পক্ষে এমন একটি কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করা সাধারণের বোধগম্যের বাইরে। পক্ষান্তরে, একথাও ভুললে চলবে না যে, তাঁর সফরে দীর্ঘ দশটি বছর ঠিক একই অবস্থায় অতিবাহিত হয়নি; বরং এর কিছুদিন উদাসীন অবস্থায়, কিছুকাল আধ্যাত্মিক চিন্তায় কেটে গেলেও বাকি সময়টি স্বাভাবিক অবস্থায়ই অতিবাহিত হয়েছে বলে সে সময়টিই তিনি রচনা কার্য ও শিক্ষামূলক অন্যান্য কাজে ব্যয় করেছেন।

'কাওয়ায়েদুল আকায়েদ' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, সফররত অবস্থায় বাইতুল মুকাদ্দাসবাসীদের একান্ত অনুরোধে তিনি উক্ত গ্রন্থখানি রচনা করেন। 'আমানুল ইসলাম' উপাধিধারী ইমাম সাহেবের অন্যতম সাগরিদ আবুল হাসান আলী ইবনে মুসলিম ঐ সফরের সময়েই ইমাম গায্যালী (রহঃ)-এর নিকট থেকেই উক্ত গ্রন্থখানি পাঠ করেন। ইমাম সাহেব

"মুনকায মিনাদ দালাল"-এ লিখেছেন—হজ্জব্রত সমাধা করার পর পরিবার-পরিজনের আকর্ষণে আমি পুনরায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হলাম। অথচ ইতোপূর্বে আমি বাড়ি বা স্বদেশের নাম শুনলেই চমকে উঠতাম এবং তা থেকে দূরে পালিয়ে বাঁচতাম। সে যাই হোক অবস্থার বিবর্তনে আমি বাড়ি এসে পৌঁছলাম এবং তথায় এসে গভীরভাবে মুরাকাবাহ-মুশাহাদায় আত্মনিয়োগ করলাম। অবশ্য দেশ ও দশের বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে মাঝে মাঝে মুরাকাবাহ ভঙ্গ করতে হতো।

অন্যত্র ইমাম সাহেব বলেছেন, অক্লান্ত আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে আমার আত্মা এমনভাবে নিষ্কলুষ ও পবিত্র হয়ে গিয়েছিল যে, আমার মনের যাবতীয় দ্বন্দ্ব ও দ্বিধা-সন্দেহের অবরোধ-প্রাচীর এ সময় ভেঙ্গে খান খান হয়ে গিয়েছিল এবং আল্লাহর অনুগ্রহে এভাবেই আমি সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত হলাম।

পুনরায় অধ্যাপনা

মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সন্দেহ দূর হয়ে প্রকৃত সত্যের আলোকে আলোকিত হবার পর ইমাম সাহেব দেখলেন, তখন যুগটিই যেন ক্রমে ক্রমে মাযহাবের প্রভাবমুক্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছে এবং দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার প্রবল প্রভাবে মাযহাবী মতবাদের আধিপত্য বহুলাংশে হ্রাস পেতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় তিনি আবার সংসার-বিরাগী হবার মনস্থ করলেন। ঠিক এমন সময় শাহী দরবার থেকে পুনরায় তাঁকে মাদ্রাসার অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধপত্র নিয়ে এক কাসেদ এসে হাজির হলো। ইমাম সাহেব তখন কোন পথ অবলম্বন করবেন তা স্থির করে উঠতে পারছিলেন না। তাই তিনি তাঁর একান্ত হিতৈষী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবের নিকট কর্তব্য নির্ধারণের জন্য পরামর্শ চাইলেন। তারা সবাই তাঁকে একবাক্যে বৈরাগ্য গ্রহণ করতে বারণ করলেন। তাছাড়া এসময় স্থানীয় বহু বুযুর্গের প্রতি আল্লাহ স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে তাঁদের জানিয়ে দিলেন যে, তোমরা গাযযালীকে বল যে, বাদশাহী অনুরোধপত্রই আল্লাহর খুশির উপকরণ। অতএব তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন যুক্তিযুক্ত নয়। সর্বোপরি খোদ ইমাম সাহেবের মনে সহসা এরূপ একটি ধারণার উদয় হলো যে, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে— প্রত্যেক শতকের প্রথমে একজন

মুজাদ্দিদের আবির্ভাব হয়। সৌভাগ্যক্রমে সেই শতাব্দী শুরু হতে আর মাত্র একমাস অবশিষ্ট ছিল। ইমাম সাহেবের মনে কথাটি জাগরুক হবার সাথে সাথেই তাঁর সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেল। সুতরাং তিনি চারশো একানব্বই হিজরী সনের যিলকদ মাসের দ্বিতীয় তারিখ পুনরায় নিজামিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করলেন এবং সুষ্ঠুভাবে কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন।

ইমাম গায্যালী (রহঃ) কথাবার্তায় ও লিখায় বিভিন্ন স্থানে যাকে সুলতানুল ওয়াক্ত অর্থাৎ তৎকালীন বাদশাহ বলে অভিহিত করেছিলেন, তিনি নিজামুল মুলকের জ্যেষ্ঠপুত্র ফখরুল মুলক এবং তৎকালীন বাদশাহ মালিক শাহের উজীরে আযম, তিনি ছিলেন অত্যধিক শিক্ষানুরাগী, সদালাপী এবং বন্ধুপ্রিয়। তিনি নিজে ইমাম গায্যালী (রহঃ)-কে নিজামিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

আল্লাহর কি মর্জি, কিছুদিন যেতে না যেতেই এই জ্ঞানী-গুণী লোকটির উপর কঠিন বিপদ নেমে আসল। অর্থাৎ হিজরী পাঁচশো সনের মুহররাম মাসে বাত্বেনিয়া সম্প্রদায়ের এক গুপ্তঘাতকের হাতে উজীরে আযম ফখরুল মুলক নিষ্ঠুরভাবে শাহাদাতবরণ করলেন। এই ঘটনায় ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর মনে অত্যন্ত অশান্তি দেখা দিল। হঠাৎ তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনা দমে গেল। তাই কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অধ্যক্ষের পদে ইস্তফা দিয়ে নিজ জন্মভূমি তুস চলে আসলেন। অতঃপর স্বীয় গৃহ সংলগ্ন একটি স্থানে খানকাহ ও মাদ্রাসা তৈয়ার করে একই সাথে জনসাধারণকে জাহেরী ও বাত্বেনী শিক্ষাদান কাজে আত্মনিয়োগ করলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এই কাজে ব্যাপৃত থাকলেন।

শত্রুদের বিরোধিতা

ক্রমবর্ধমানভাবে দেশ ও দশের নিকট ইমাম সাহেবের যেমন সুনাম, সুযশ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে চলেছিল তেমনিভাবেই তাঁর শত্রুদলও ক্রমেই ভারি হয়ে উঠছিল। বিশেষতঃ তাঁর রচিত এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে তিনি যেভাবে যুগের পীর-মুরশিদগণের আসল ও প্রকৃত রূপ জনসাধারণের নিকট তুলে ধরেছিলেন তাতে করে সারা দেশটাই তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। দেশে তাঁর তখন শত্রুর অভাব ছিল না। তবে

বিশেষ একটি দল প্রকাশ্যে ও গোপনে তাঁর সাথে চরম শত্রুতা সাধনে বদ্ধপরিকর হলো।

এ সময় সানজার ইবনে মালিক শাহ সালজুকী ছিলেন খোরাসানের অধিপতি। ঘটনাক্রমে সালজুক খান্দানের সবাই ছিলেন ইমাম আযম হযরত আবু হানীফা (রহঃ)-এর ভক্ত। ভক্তি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তারাই সর্বপ্রথম ইমাম আযম (রহঃ)-এর মাযারে গম্বুজ নির্মাণ করে দেন।

যৌবনের সূচনালগ্নে ইমাম গায্যালী (রহঃ) উছুলে ফিকাহ সম্বন্ধীয় "মানখুল" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানির কোনো একস্থানে তিনি ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) সম্বন্ধে কতিপয় অশালীন, অমার্জিত ও অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করেন। বলাবাহুল্য যে, এই কিতাবখানিই ছিল ইমাম সাহেবের শত্রুদের পক্ষে হাতিয়ার। তারা এই কিতাবখানি নিয়ে সানজারের শাহী দরবারে উপস্থিত হলো এবং এর সাথে অতিরিক্ত রং লাগিয়ে ইমাম সাহেবের নামে কুৎসা রটনা করল। তারা ইমাম সাহেবের মতবাদকে ওলট-পালট করতঃ ও তাঁর ভুল ব্যাখ্যা প্রকাশ করতঃ দাবি জানাল যে, গায্যালীর এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে দ্বীনের খেলাপ এবং এটা কুফরী মতবাদ।

সুলতান সানজার গভীর মনোযোগের সাথে তাদের কথা শুনলেন এবং মনে মনে দারুণ ক্রোধান্বিত হলেন। কারণ তিনি নিজে এমন কোনো শিক্ষিত লোক ছিলেন না যে, এসব বিষয়ে ফায়সালা বা সমাধান দিতে পারেন। যার ফলে তিনি ইমাম সাহেবের শত্রুদের অভিযোগকেই সত্যরূপে গ্রহণ করলেন এবং ইমাম সাহেবকে দরবারে উপস্থিত হবার জন্য তখনই সমন জারি করলেন।

ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইমাম গাযযালী (রহঃ) মাকামে খলীল অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাযার শরীফ যিয়ারত করাকালীন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি জীবনে আর কোনোদিন কোন শাহী দরবারে তাশরীফ নিবেন না। সুতরাং সেক্ষেত্রে তিনি এক ভীষণ সমস্যায় পড়ে গেলেন। অপরদিকে শাহী সমনের গুরুত্বও কম নয়। সেদিকেও তাঁর লক্ষ্য ছিল। সুতরাং তিনি "মুশাহাদে রেদা" নামক স্থানে গিয়ে সেখান থেকে সুলতানের নিকট বিস্তারিতভাবে একখানি পত্র লিখে পাঠালেন। পত্রের মর্ম ছিল ঃ

সুদীর্ঘ ছয় বছর কাল আমি সুলতান মালিক শাহের দরবারে ছিলাম। বাগদাদ, ইস্পাহান প্রভৃতি বড় বড় শহরগুলোতে তার কার্যাবলির নিদর্শন দেখেছি। তাছাড়া বহুবারই সুলতান আমীরুল মু'মিনীন, অন্যান্য আমীর-উমারা এবং শাহী দরবারের বড় বড় পণ্ডিতদের সাহচর্য লাভ করার সৌভাগ্যও আমি অর্জন করেছি এবং এভাবে দুনিয়ার হাল-চাল দেখার সুযোগ আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন। অতঃপর আমি দীর্ঘদিন মক্কা ও মদীনা শরীফ অবস্থান করেছি। তারপর মাকামে খলীলে যিয়ারত কালে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আর কখনো আমি কোনো রাজা-বাদশাহর দরবারে গমন করব না। তাঁদের হাদিয়া, উপঢৌকন গ্রহণ করব না এবং কোনোদিন কোসো তর্কযুদ্ধেও অংশগ্রহণ করব না। অতঃপর দীর্ঘ বারো বছর যাবত আমি আমার সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে আসছি। সুতরাং মাননীয় সুলতানের খেদমতে আমার আরজ এই যে, আমাকে যেন আপনার শাহী দরবারে উপস্থিত হওয়া থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। পক্ষান্তরে, শাহী সম্মান রক্ষার তাগিদে আমি নিবেদন করছি যে, "মাশহাদে রেবা" নামক জায়গাটিতে আমি উপস্থিত হতে পারি। শাহী মহলে গমন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং কোনোক্রমেই যেন আমাকে তথায় উপস্থিত হতে পুনঃনির্দেশ প্রদান করা না হয়।

ইমাম সাহেবের পত্র পাঠ করে সুলতান সানজার ইমাম সাহেবের সাথে যে কোনোভাবে সাক্ষাত করার প্রয়োজন মনে করলেন এবং দরবারে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করে বললেন— আমার মনে হয় ইমাম গাযালী (রহঃ)-এর সাথে সাক্ষাতে আলাপালোচনা করে তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

সুলতানের কথা শুনে ইমাম সাহেবের শত্রুভাবাপন্ন লোকদের মন আতঙ্কিত হয়ে উঠল। কারণ তাদের সন্দেহ হলো যে, না জানি শেষ পর্যন্ত সুলতান ইমাম গাযালীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন। অতএব তারা আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল যাতে ইমাম সাহেবকে তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে দিয়ে শাহী দরবারে উপস্থিত করা যায়। তারা সুলতানের নিকট দাবি করল যে, দরবারে যদি সে একান্তই না আসে তবে দরবারের বাইরে কোথাও একটি বিতর্কানুষ্ঠানের আয়োজন করা হোক এবং তথায় তাকে উপস্থিত করা হোক।

ইমাম-বিরোধী দলের এরূপ দাবির খবর তুরস্কের ওলামায়ে কেরামদের নিকট পৌছল। তাঁরা তখন সমবেতভাবে সুলতানের ছাউনিতে পৌছে বিরোধী দলকে বললেন, আমরা ইমাম গায্যালী (রহঃ)-এর সাধারণ শিষ্য। তাঁর মতবাদ সম্পর্কিত বিতর্কিত মাসয়ালার ফায়ছালার ভার সর্বাগ্রে আমাদের উপরই অর্পণ করা হোক। আমরা যদি আপনাদের প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে না পারি তবে তখনই তাঁর নিকট এটা পেশ করার প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু আমরা বর্তমান থাকাকালে প্রথমেই এই মাসয়ালা সম্পর্কে ইমাম সাহেবকে প্রশ্ন করার কথা উঠে না।

ইমাম সাহেবের সাগরিদমণ্ডলী এবং তাঁর বিরোধীদের মধ্যে এভাবে দারুণ ঝগড়ার সৃষ্টি হলো। জোরে-সোরে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। এমতাবস্থায় সুলতান ইমাম সাহেবকে উপস্থিত করে মীমাংসা করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। সুতরাং এই ঝগড়া যেন আর সামনে না হয় তজ্জন্য তিনি উজীরে আযম মুঈনুল মুলককে নির্দেশ দিলেন, ইমাম সাহেবকে সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত করা হোক।

অগত্যা ইমাম সাহেব তথায় উপস্থিত হয়ে উজীরে আযম মুঈনুল মুলকের সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি যথেষ্ট সম্মান এবং শ্রদ্ধার সাথে ইমাম সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে বাদশাহর সম্মুখে হাজির হলেন। ইমাম সাহেব সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র সুলতান সানজার উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে তাঁর সাথে আলিঙ্গন করলেন। তারপর তাঁকে রাজকীয় আসনে উপবেশন করালেন।

ইমাম সাহেব জীবনে বহু রাজা-বাদশাহর দরবার দেখেছেন, তাদের শাহী শান-শওকত ও জাঁকজমক অবলোকন করেছেন, কিন্তু এই সুলতান সানজারের আড়ম্বর ও জাঁকজমক দেখে একাধারে আতঙ্কিত ও বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন, তাঁর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তিনি তাঁর সাথে করে একজন কারীকেও নিয়ে এসেছিলেন। তিনি সেই কারী সাহেবকে বললেন, কুরআনের কিছু আয়াত পাঠ কর। নির্দেশানুযায়ী কারী সাহেব নিম্নোক্ত মর্মের আয়াত পাঠ করলেন। "আল্লাহ-ই কি বান্দাদের জন্য যথেষ্ট নয়।" এই আয়াত শুনে তাঁর (ইমাম সাহেবের) মনে এক নব ভাবের সৃষ্টি হলো, অতঃপর তিনি সানজারকে লক্ষ্য করে এক দীর্ঘ বিবৃতি

প্রদান করলেন। তারপর আরো আলাপ-আলোচনার পর তিনি সুলতানকে বললেন, আপনার নিকট আমার দুটি নিবেদন ঃ

প্রথমতঃ তুসের অধিবাসীগণ অত্যাচার ও অব্যবস্থার ফলে পূর্ব থেকেই মরণ দশায় উপস্থিত। তদুপরি এবার তারা শৈত্য ও দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত, এখন শুধু মৃত্যুর প্রহর গুণছে। আপনি তাদের এই দুরবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে তাদের প্রতি একটু সদয় হোন। তাহলে আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। কত বড় অনুতাপের কথা যে, মুসলমানদের চিরোন্নত শির দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্বিপাকের ভারে অবনত হয়ে গেছে, অন্যদিকে আপনার বাহন-অশ্বের গর্দানও অবনমিত হয়েছে; কিন্তু তা হয়েছে স্বর্ণ ও মণিমুক্তার হারের অত্যধিক ওজনে।

দ্বিতীয়তঃ সুদীর্ঘ বারো বছর যাবত আমি লোক সংস্রব পরিত্যাগ করে নির্জনতা অবলম্বন করেছিলাম। সেই দীর্ঘদিন পর ফখরুল ইসলাম আবার আমাকে এখানে আসতে বাধ্য করলেন। আমি তাকে বলেছিলাম, আমরা এমন যুগে বসবাস করছি যখন কেউ যদি কোনো খাঁটি ও সত্যকথা বলে তবে সাথে সাথে দেশের সব লোকই তার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। ফখরুল ইসলামকে আমি বহু বুঝালাম কিন্তু তিনি আমার কথায় কর্ণপাত না করে বললেন যে, দেশের বর্তমান সুলতান যথেষ্ট ন্যায়পরায়ণ এবং আদর্শ নরপতি। তারপর যদি অন্যায় বা অঘটনীয় কিছু সংঘটিত হয় তবে আমি তার মুকাবেলা করব ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে কোনো ত্রুটি করব না।

এখন আমার বিরোধী দল আমার বিরুদ্ধে শাহী দরবারে অভিযোগ এনেছে যে, আমি ইমাম আযম আবু হানীফার প্রতি কটূক্তি করেছি এবং তাঁর সম্পর্কে অবমাননাকর বাক্য ব্যবহার করেছি। তাদের আমার সম্পর্কে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন বরং এহইয়াউল উলূমে আমি ইমাম আযম সম্বন্ধে আমার চূড়ান্ত অভিমত ও মতবাদ প্রকাশ করেছি। আমার মতে তিনি ফিকাহ শাস্ত্রের যুগ প্রবর্তক।

বিরোধী দলের লোকগণ যে আশঙ্কা করেছিল, তা-ই কার্যকরি হলো। অর্থাৎ ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর জ্ঞানের গভীরতা ও বিচক্ষণতার সম্মুখে সুলতান সানজার মাথানত করলেন। তিনি ইমাম সাহেবের জ্ঞানগর্ভ ও বিচক্ষণতা সুলভ কথাবার্তায় এবং আলাপ-আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে বললেন,

আজ যদি ইরাক এবং খোরাসানের সকল আলিম এখানে উপস্থিত থাকতেন তাহলে সবাই আপনার এই মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ মন্তব্যগুলো শ্রবণ করে ধন্য হতে পারতেন এবং আমি নিশ্চিতরূপে মনে করি যে, তাতে তাদের মনের প্রশ্ন ও কালিমাসমূহ নিশ্চিহ্নে ধূয়ে মুছে তা পরিষ্কার হয়ে যেত। তা যখন হলো না তখন আপনি স্বহস্তে আপনার বক্তব্যগুলো অনুগ্রহ করে লিখে রেখে যান। আমি তা সমগ্র দেশে প্রচারের ব্যবস্থা করে দেব। যাতে করে লোকগণ জানতে পারে যে, আলিমদের সম্পর্কে আপনার কিরূপ ধারণা। পরিশেষে আমার অনুরোধ এই যে, আপনাকে অবশ্যই আবার মাদ্রাসার অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করতে হবে। আপনার অবশ্যই স্মরণ আছে যে, আমার এক সাধারণ খাদেম ফখরুল মুলক আপনাকে নিশাপুর থাকতে বাধ্য করেছিল। আমি এখন থেকে নির্দেশ জারি করে দেব দেশের সমস্ত ওলামায়ে কেরাম যাতে অন্ততঃ বছরে একবার করে আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে নিতে পারে। অতঃপর ইমাম সাহেব সুলতান সানজারের সাথে আরো দীর্ঘক্ষণ ধরে আলাপালোচনা করলেন। তারপর দরবার থেকে বের হয়ে শহরাভিমুখে রওয়ানা হলেন। যখন তিনি শহরে উপস্থিত হলেন সমস্ত শহরবাসী ইমাম সাহেবকে আন্তরিক অভ্যর্থনা ও প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানাল। অবস্থা দেখে ইমাম সাহেবের অন্তর্জ্বালা নির্বাপিত হওয়া দূরের কথা তা আরো দ্বিগুণভাবে জ্বলে উঠল। তাঁরা তাঁকে কীভাবে ঘায়েল করতে পারে, কীভাবে তাঁকে অপমান করা যায় নতুন করে সেই ষড়যন্ত্রে আত্মনিয়োগ করল। তাই একবার তারা দল বেঁধে ইমাম সাহেবের দরবারে গিয়ে সরাসরি তাঁকে প্রশ্ন করল যে, মাযহাব সম্পর্কে আপনার অভিমত কী এবং কোন মাযহাবকে আপনি মেনে নেবেন? ইমাম সাহেব জবাবে বললেন, এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, আমি কুরআন ও জ্ঞানকে মেনে চলি। ইমামদের কাউকেই আমি অনুসরণ করি না। বিরোধী দল একথা শোনার সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল এবং তাঁর এই সম্পর্কিত রচনাবলি ও মন্তব্যসমূহের জোরালো প্রতিবাদ লিখে তাঁর কাছে পেশ করে চলে গেল। ইমাম সাহেব এসব প্রতিবাদের বিস্তারিতভাবে জবাব লিখে তাদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

অধ্যাপনার জন্য পুনরায় অনুরোধ ও তা প্রত্যাখ্যান

অবশেষে এসব সমস্যার সমাধান হলো ঠিকই, কিন্তু ইমাম সাহেবের সর্বজনপ্রিয়তা তাঁর শত্রুপক্ষকে স্বস্তিতে থাকতে দিল না। পাঁচশো হিজরী সনে সুলতান মুহাম্মদ ইবনে মালিক শাহ যখন নিজামুল মুলকের জ্যেষ্ঠপুত্র আহমদকে উজীরে আযম পদ অর্পণ করে কা'য়াম উদ্দীন নিজামুল মুলক সদরুল ইসলাম উপাধিতে ভূষিত করেন তখন তিনি ইমাম গায্যালী (রহঃ)-কে পুনরায় বাগদাদে ফিরিয়ে আনার মনস্থ করেন। যেহেতু বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসা ছিল মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সকল দেশের জ্ঞান-পিপাসুরা জ্ঞান আহরণের জন্য এখানে এসেই সমবেত হতো। সেহেতু এরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইমাম গায্যালী (রহঃ)-এর মতো অদ্বিতীয় জ্ঞানী ও শিক্ষাবিদের এই মাদ্রাসার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা প্রয়োজন।

মাদ্রাসার পরিচালকবৃন্দ এই দৃষ্টিতেই ইমাম সাহেবকে পুনরায় মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত হলো। একই কারণে বাগদাদের খলীফাও এদিকে দৃষ্টি দিলেন।

তখন তুস জেলা ছিল শাহজাদার শাসনভুক্ত। আর সদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ফখরুল মুলক ইবনে নিজামুল মুলক ছিলেন সানজারের উজীর। সুলতান প্রধানমন্ত্রীর মারফত এক পত্রে ইমাম সাহেবকে নিজামিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনার জন্য অনুরোধ জানাতে বললেন। ঐ পত্রের সাথে তিনি নিজেও একখানি পত্র লিখে পাঠালেন। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল এই যে, সারা দেশবাসী সুলতান মুনতাজহার বিল্লাহকে অনুরোধ জানিয়েছেন যে, যে প্রকারেই হোক ইমাম সাহেবকে যেন নিজামিয়ার অধ্যাপনার জন্য বাধ্য করা হয়। অতঃপর ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর নামে এক শাহী ফরমান প্রেরণ করা হলো। শাহী দরবারের সদস্যদের দস্তখত বিশিষ্ট এই ফরমানে বিশেষ জ্ঞাতব্য স্বরূপ লিখিত হলো যে, খেলাফত ও সালতানাত সম্পর্কিত সকল ব্যাপারে ইমাম সাহেবের মতামতকেই চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

উজীরে আযম আহমদ ইবনে নিজামুল মুলক ইমাম সাহেবের নিকট লিখিত পত্রে এরূপ একটি কথাও লিখেছিলেন যে, মাননীয় ইমাম সাহেব!

একথা সত্য যে, আপনি যেখানেই থাকবেন সেখানেই একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যেখানে আপনার মতো ব্যক্তির সচ্ছলভাবে জীবনযাপন ব্যবস্থা হতে পারে সেখানেই আপনার অবস্থান করা উচিত। আর শুধু তাই নয়; বরং স্থানটি সারা মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রস্থল হওয়া চাই। সবদিকে লক্ষ্য করে বাগদাদকেই সেই কেন্দ্রস্থল হিসেবে স্বীকার করতে হয়।

যথাসময় শাহী ফরমান ও উজীরে আযমের পত্র ইমাম সাহেবের নিকট পৌঁছে গেল। কিন্তু তিনি নিজামিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপনার কাজ পুনরায় গ্রহণ করতে কিছুতেই রাজি ছিলেন না। তাই তিনি বাগদাদ না যাওয়ার অভিপ্রায়ের কারণ দর্শিয়ে একখানি পত্র লিখলেন। পত্রখানির মর্ম এই ঃ

(১) পূর্বে যখন আমি বাগদাদে ছিলাম তখন আমার পরিবার-পরিজনের ঝামেলা ছিল না। কিন্তু এখন তদসম্পর্কিত জটিলতা দেখা দিয়েছে। এখন আমার পরিবার-পরিজন আমার গৃহ ত্যাগের দায়িত্ব বহন করতে মোটেই রাজি হচ্ছে না।

(২) বর্তমানে আমার নিকট এখানে প্রায় দুশো ছাত্র শিক্ষা গ্রহণরত আছে। আমি এখান থেকে চলে গেলে তাদের পক্ষে আমার সাথে বাগদাদ যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। যার ফলে এতগুলো শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণ করা অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়াবে।

(৩) মাকামে ইব্রাহীমে আমি যে প্রতিজ্ঞা তিনটি করেছিলাম পরিস্থিতির প্রয়োজনে একবার যদিও তা আমি ভঙ্গ করেছি, পুনরায় তা ভঙ্গ করা আমার পক্ষে কোনোরূপেই সম্ভব নয়। তদুপরি আমি মাদ্রাসা থেকে কোনোদিনই ভাতা বা বেতন গ্রহণ করিনি এবং এখনো তা করব না। অথচ বাগদাদে আমার জীবিকা নির্বাহের দ্বিতীয় কোনো পন্থাও নেই। মোটকথা সুলতান, খলীফা ও উজীরের পক্ষ থেকে শত পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও তিনি বাগদাদ যেতে রাজি হলেন না; বরং স্পষ্টভাবেই তাদের সব আবেদন-নিবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন এবং তিনি স্বগৃহেই অবস্থান করতে লাগলেন।

ইমাম গায্যালী (রহঃ) তাঁর পাঠ্যাবস্থায় হাদীস অধ্যয়ন করতে পারেননি বলে মনে মনে খুবই অনুতপ্ত ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর দুঃখ ও অশান্তির সীমা ছিল না। তবে আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে তাঁর মনের এই

আকাঙ্ক্ষাও ঘটনাক্রমে পুরা হয়েছিল। তৎকালে হাফেজ উমর ইবনে হাসান বাউয়াসী নামক একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি একবার তুস জেলায় ভ্রমণ করতে এলে ইমাম সাহেব এক পরম সুযোগ মনে করে তাঁকে নিজ গৃহে মেহমান হিসেবে রাখেন এবং তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা করতে থাকেন। তাছাড়া তিনি আবু ইসমাইল হাকামীর নিকট থেকেও হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।

ইমাম সাহেব শেষ বয়সে যদিও মুরাকাবাহ মুশাহাদাহ ও ইবাদাত-বন্দেগীতে অধিকাংশ সময় লিপ্ত থাকতেন তবু অবসর সময় তাঁর গ্রন্থ রচনা অব্যাহতভাবে চলছিল। বিশেষতঃ উসুলে ফিকাহ শাস্ত্রের 'মুসতাছনা' নামক উচ্চাঙ্গের গ্রন্থখানি তিনি পাঁচশো চার হিজরীতে রচনা করেন।

ইমাম গায্যালী (রহঃ)-এর রচনা ও গ্রন্থাবলি

জগতে যেসব ক্ষণজন্মা প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই কর্মময় দৃশ্য যেমনি অদ্ভুত তেমনি বিস্ময়কর। তাঁদের জীবনের কর্মধারার প্রতি লক্ষ্য করলে অবাক হতে হয়। ইমাম গায্যালী (রহঃ) ছিলেন তাদেরই অন্যতম; বরং তাঁর জীবনের ধারা ছিল বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-ভাবনা ছিল এক অভিনব স্বাতন্ত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। তাই তিনি নিজস্ব চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতার আলোকে এমন এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মতবাদ প্রকাশ করেছেন যে, তৎকালীন প্রায় অধিকাংশ ওলামার তা মনোঃপুত হলো না। এজন্য সমকালীন ওলামাদের সাথে তাঁর নানাবিষয় নিয়ে সংঘাত শুরু হলো। তাঁকে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হলো বার বার। অবশ্য তাঁর কালজয়ী প্রতিভা এবং অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতার কাছে বিরোধিগণ হার মানলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর অভিমতকেই অকাট্য ও অখণ্ডনীয় বলে স্বীকার করে নিলেন। এ ছিল তাঁর কর্মময় জীবনের একটি দিক। অন্য দিকে উচ্চ শিক্ষা-দীক্ষা লাভ, জ্ঞান সাধনা, আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন, গভীর ও একনিষ্ঠভাবে ইবাদাত-বন্দেগী, তাসবীহ-তাহলীল ও মুরাকাবাহ-

মুশাহাদায়ও তিনি কারো তুলনায় পিছনে ছিলেন না। তবু এতসব কাজের মধ্যেও তিনি তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারাকে মুসলিম জনসাধারণের সামনে স্থায়ীভাবে রেখে যাবার জন্য গ্রন্থ রচনায়ও তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন। আর এক্ষেত্রেও তিনি যে বিস্ময়কর কীর্তি রেখে গেছেন তা মুসলিম জাহানে চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। নিম্নে আমরা তাঁর রচনা ও গ্রন্থাবলি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করছি।

ইমাম গায্যালী (রহঃ) তেমন দীর্ঘজীবী লোক ছিলেন না। মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়স কাল তিনি জীবিত ছিলেন। তবে সম্ভবতঃ বিশ বছর থেকেই তিনি গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। জীবনের এগারো কি বারো বছর মরু প্রান্তর, বন-উপবন এবং পার্বত্যাঞ্চলে অতিবাহিত করেন। বাকি জীবনে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, জ্ঞান-সাধনা, লোকের প্রশ্ন-ফতোয়ার জবাব দেন। বাহাছ-মুবাহাছায় শরিক হওয়া প্রভৃতি কাজগুলো করেও অবশিষ্ট সময়ে তিনি বহুসংখ্যক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। তাঁর সেই রচিত গ্রন্থাবলির বিশেষ উল্লেখযোগ্য কতিপয় নামের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করছি ঃ

(১) এহইয়াউ উলূমিদ্দীন, (২) ইমলা ইলা মুশকিলিল এহইয়া, (৩) আরবাঈন, (৪) আসমাউল হুসনা, (৫) আল-ইকতিছাদু ফিল ইতেকাদ, (৬) ইলযামুল আওয়াম, (৭) আসরারি মুআমালাতুদ্দীন, (৮) আসরারুল আনওয়ারিল ইলাইয়া বিল আয়াত, (৯) আখলাকুল আবরার, (১০) আসরারুল ইত্তিবাইস সুন্নাত, (১১) আসরারুল হুরুফি ওয়াল কালিমাত, (১২) আইয়্যুহাল ওয়ালাদ, (১৩) বিদয়াতুল হিদায়াত, (১৪) বাসিত, (১৫) বায়ানু ক্বাওলাইনিশ শাফেয়ী, (১৬) বায়ানু ফাজায়িলুল ইবাহিয়াহ, (১৭) বাদায়িউস সুনয়ি, (১৮) তাম্বীহুল গাফিলীন, (১৯) তালবিসি ইবলীস, (২০) তুহফাতুল ফালাছিফাহ, (২১) তা'লীক্বাত ফী ফুরুইল মাযহাব, (২২) তাহছীলুল মাযহাব, (২৩) তাহছীলুল আদিল্লাহ, (২৪) তাফারিক্বা বাইমাল ইসলামি ওয়াল যিনদিক্ব, (২৫) জাওয়াহিরুল কুরআন, (২৬) হুজ্জাতুল্লাহুল হক্ব, (২৭) হাক্বীক্বাতুর রূহ, (২৮)

খুলাছাতুর রাসায়িল ইলা ইলমিল মাসায়িল, (২৯) ইখতিছারুল মুখতাছার লিল মাআনী, (৩০) আর রিসালাতুল কুদসিয়্যাহ, (৩১) আসসিরুল মাসুন, (৩২) শরহে দায়েরায়ে আলী ইবনে আবি তালিব, (৩৩) শিফাউল আলিল আলা মাসয়ালাতিত তালীল, (৩৪) আক্বীদাতুল মিছবাহ, (৩৫) আজায়িবু সানয়িল্লাহ, (৩৬) উনকুদুল মুখতাছার, (৩৭) গাওয়াতুল ফাওর ফী মাসায়িলিদ দাওর, (৩৮) আওরুদ দাওর, (৩৯) ফাতওয়া, (৪০) আল ফিকরাতু ওয়াল ইবরাতু, (৪১) ফাওয়াতিহুস সাওর, (৪২) আল ফারকু বাইনাছ ছালিহ ওয়া গাইরিছ ছালিহ, (৪৩) আল ক্বানূনুল কুল্লী, (৪৪) ক্বানূনুর রাসূল, (৪৫) আল কুরবাতু ইলাল্লাহ, (৪৬) আল ক্বিসতাসুল মুসতাক্বীম, (৪৭) ক্বাওয়ায়িদুল আক্বায়িদ, (৪৮) আল ক্বাওলুল জামীলু ফী রদ্দে আলা মান গাইরাল ইনজীল, (৪৯) কিমিয়ায়ি সা'আদাত, (৫০) কাশফুল আওয়ামিলি আখিরাহ, (৫১) কানযুল ইদ্দাত, (৫২) আল লুবাবুল মুনতাহা ফী ইলমিল জিদাল, (৫৩) আল মুস্তাসকা, (৫৪) আল মানখূল, (৫৫) মাখাযু ফিল খুলফিয়াতি বাইনাল হানাফিয়াহ, (৫৬) আল মুবাদি ওয়াল গায়াত, (৫৭) আল মাজালিসুল গাযযালিয়্যাহ, (৫৮) মাক্বছিদুল ফালাছিফা, (৫৯) আল মুনকাযু মিনাদ্দালাল, (৬০) মীয়ারুন নাজার, (৬১) মীয়ারুল ইলম ফিল মানতিক, (৬২) মাহকুন নজর, (৬৩) মিসক্বাতুল আনওয়ার, (৬৪) আল মুস্তাজহারু ফী রাদ্দিল বাত্বেনিয়াহ, (৬৫) আল মীযানুল আমল, (৬৬) মাওয়াহিমুল বাত্বেনিয়াহ, (৬৭) আল মুনযিল আলী, (৬৮) সিরাজুস সালেকীন, (৬৯) আল মাকনুন ফিল উছুল, (৭০) মুসাল্লামুস সালাতিন, (৭১) মুফাসসালুল ফী ওয়াসিলিল ক্বিয়াম, (৭২) মিনহাজুল আবেদীন, (৭৩) দাক্বায়িকুল আখবার, (৭৪) আল মাআরিফুল অক্কলিয়াহ, (৭৫) নছীহাতুল মুলক, (৭৬) ওয়াজিয, (৭৭) ওয়াসিত, (৭৮) মুক্কাশিফাতুল কুলুব, (৭৯) ইয়াকুতুত্ তাবীল ফিত তাফসীর, (৮০) ওয়াছায়েল।

উল্লেখ্য যে, ইমাম সাহেব রচিত গ্রন্থাবলির যেগুলোর নাম উদ্ধার করা গেল, আমরা কেবল এখানে তা-ই উল্লেখ করলাম। এছাড়া তাঁর রচিত আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে। বুস্তান নামক এক গ্রন্থে আল্লামা নববী

উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম গাযযালীর জীবনের গ্রন্থ রচনাকালীন সময়ের সাথে তাঁর রচনার গড় হিসাব করলে দেখা যায় যে, তাঁর দৈনিক রচনার গড় ছিল ষোলো পৃষ্ঠারও অধিক। তাঁর জীবনের উল্লিখিত দৈনন্দিন অন্যান্য ফরজগুলো সমাধা করে দৈনিক এই পরিমাণ কিতাব লিখা সাধারণ ও সহজ কথা নয়। অবশ্য আল্লামা তাবারী, জওযী এবং সুয়ুতির দৈনিক রচনার গড় এর চেয়েও বেশি ছিল। তবে তাঁদের রচনায় অন্যের অনুকরণ ও উদ্ধৃতির পরিমাণ অধিক ছিল। পক্ষান্তরে, ইমাম গাযযালী (রহঃ) যা লিখেছেন সবই মৌলিক রচনা।

ইমাম সাহেব সাধারণতঃ ফিকাহ, কালাম, আখলাক বা চরিত্র এবং মারিফাতের উপরই গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর এই রচনাবলি মুসলিম জাহানের প্রায় সব রাজ্যে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে। তাঁর রচনাবলি স্বীয় জীবদ্দশায় ও তাঁর মৃত্যুর পরেও একইভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস যৈনদ্দিন ইরাকী বলেছেন, ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থখানা মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ রচনা। ইমাম সাহেবের সহপাঠী আবদুল গাফের ঘায়সী বলেছেন, এহইয়াউ উলূমিদ্দীনের ন্যায় দ্বিতীয় গ্রন্থ দুনিয়ায় রচিত হয়নি। তাছাড়া ইমাম নববী বলেন, কুরআনের প্রায় পরবর্তী স্থান এহইয়াউ উলূমিদ্দীনের। শায়খ আবু মুহাম্মদ যুরযানী বলেন, জগতের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা যদি বিনাশ করে দেয়া হয়, তবে আমি একমাত্র এহইয়াউ উলূমিদ্দীনের সাহায্যেই তার পুনর্জন্ম দিতে পারব।

ইমাম সাহেবের রচনাবলির ব্যাপক স্বীকৃতির সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, ওলামায়ে কেরাম এবং সূফী সাধক সমাজ তাঁর রচনাবলির প্রতি যত বেশি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন ততটা আজ পর্যন্ত অন্য কারো রচনার প্রতি করা হয়নি।

বাসিত, ওয়াসিত, ওয়াজিয এবং ওয়াসায়েল—ইমাম সাহেব রচিত এ চারখানা ফিকাহ গ্রন্থ শাফেয়ী মাযহাবের স্তম্ভস্বরূপ। বিভিন্ন ওলামায়ে কেরাম এই গ্রন্থ চতুষ্টয়ের যে ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন, তার সংখ্যা প্রায় তিন শতাধিক।

দৃষ্টিপাত-(খ)

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ গায্যালী (রহঃ) সম্পর্কে মুফতি শাহ্ দীন যা লিখেছেন

নাম ও পরিচয়

ইমাম আল্ গাযযালী (রহঃ)-এর পূর্ণ নাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল তুসী আল শাফেয়ী (রহঃ)। তিনি ছিলেন ইসলাম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক চিন্তানায়ক, দার্শনিক এবং তর্কশাস্ত্রবিদ। ইসলাম ও ইসলামি জীবন ব্যবস্থার সকল অঙ্গনে তিনি যে পরিচ্ছন্ন দর্শন ও রূপরেখা প্রদান করে গেছেন, তা ইসলামি জগতে আলোর মশাল হয়ে চিরকাল জ্বলতে থাকবে।

১। জীবন চরিত পরিক্রমা

ইমাম আল গাযযালী (রহঃ) হিজরী ৪৫০ সালে তুস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তুস নগরেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। তিনি নায়ন্যাবুর নগরে বিশেষ করে ইমামুল হারামাইন আল জুয়ায়নীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত (হিঃ ৪৭৮/১০৮৫ খ্রিঃ) আল্ গাযযালী তাঁর সাথে ছিলেন। জীবনের প্রারম্ভ হতেই তাঁর মাঝে সংশয়ের মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁর মন ছিল জিজ্ঞাসাপ্রবণ। সূফী পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবাধীন থেকে সূফীদের ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করা সত্ত্বেও তখন সূফী মনোভাব তাঁর মনে শিকড় গাড়তে পারেনি। যখন তাঁর বয়স বিশ বছরও হয়নি, তখন থেকেই তিনি আকাঈদ ও ফিকাহের সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে গবেষণা করতে ভালোবাসতেন। তাকলীদ বা মাযহাব অনুসরণের প্রতি তখনো তাঁর আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়নি। নায়ন্যাবুর ত্যাগ করে তিনি সেলজুক ওয়াদীর নিজামুল মুলক-এর দরবারে আইনজ্ঞ আলিম বা মুফতি হিসেবে অমাত্য পদ গ্রহণ করেন। এ পদে তিনি ৪৮৪ হিজরী সাল পর্যন্ত বহাল ছিলেন। অতঃপর তিনি বাগদাদের নিজামিয়া মদ্রাসায় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি শুধু কেবল ধর্মতত্ত্বেই নয়; বরং নিশ্চিত

জ্ঞান লাভের ব্যাপারেও সংশয়বাদী হয়ে উঠেন। দর্শন শাস্ত্রে তিনি সংশয়বাদকে কোনোক্রমেই কাটাতে পারেননি। বাগদাদে তিনি ফিকাহ শাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন এবং পুস্তক প্রণয়নে ব্যস্ত থাকতেন। তৎকালে তালিমী সম্প্রদায় নামে একটি ভণ্ড ও পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এই সম্প্রদায়ের তিনটি শ্রেণি ছিল। বাতিনিয়্যা, ইমামিয়্যা এবং ইসমাঈলিয়্যা। এই তালিমী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তিনি কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন। তালিমী সম্প্রদায়ের লোকেরাই নিজামুল মুলক ও মালিক শাহকে হিজরী ৪৮৫ সালে হত্যা করেছিল। তারপর তিনি ধর্মীয় বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের মাঝে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে কঠোর সাধনা আরম্ভ করেন এবং ৪৮৩ হিজরী হতে ৪৮৭ হিজরী পর্যন্ত সমসাময়িক কালের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের আদ্যান্ত পাঠ করেন। দর্শনের মরাছায়া তাঁর মনে রেখাপাত করতে পারেনি। এবার তিনি সর্বান্তঃকরণে সূফীবাদের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন এবং এতে মনোনিবেশ করলেন। নিছক বুদ্ধিবৃত্তি ও দার্শনিক তত্ত্বান্বেষণ তাঁকে পরিতৃপ্ত করতে পারেনি। সূফী সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি আল্লাহ, নবুওয়াত ও আখিরাত সম্পর্কিত পরিপূর্ণ বিশ্বাসের অধিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হলেন। সংশয়বাদ ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-তর্কের তমসাচ্ছন্নতাকে তিনি চিরতরে বর্জন করেন। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ পাক আমাকে এই বিশ্বাসের অধিষ্ঠান দান করেছেন।

হাশর দিবসের ভয় তাঁকে বড়ই অভিভূত করেছিল। ফলে হিজরী ৪৮৮ সালের রজব মাস হতে যুলকাদা মাস পর্যন্ত তিনি আল্লাহর ভয়জনিত মানসিক পরিবর্তনের তীব্র বেদনা অনুভব করেন এবং এতে তাঁর শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয় ঘটে। অবশেষে যুলকাদা মাসে তিনি পার্থিব উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পদমর্যাদা, জ্ঞানী মনীষী ও প্রতিভাধরের মর্যাদা ও সম্মান পরিত্যাগ করে বাগদাদ হতে বেরিয়ে পড়েন এবং দরবেশের জীবন গ্রহণ করে ভ্রাম্যমাণ সাধকের জীবন ধারণ করেন। আত্মার শান্তি ও নিশ্চিত জ্ঞানের অনুসন্ধানে নিজেকে উজাড় করে দেন। আল্লাহ পাক তাঁকে এই পথে সফলতা দান করেন এবং তিনি সাফল্য লাভে সমর্থ হন। তখন হতেই তিনি প্রয়োগবাদীর ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি প্রচার করতে লাগলেন যে, বুদ্ধিবৃত্তির উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপনের প্রবণতাকে বিনষ্ট করার কাজেই বুদ্ধিবৃত্তিকে যুক্ত করা উচিত। এতে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত

হবে এই জ্ঞানই একমাত্র নির্ভরযোগ্য জ্ঞান বলে বিবেচিত হবে। জ্ঞানের শুধু কেবল দর্শনাশ্রয়ী কোনো ভিত্তি নেই। তিনি বলেন, চিন্তাশ্রয়ী ধর্মতত্ত্ববিদগণের পদ্ধতির মাঝেও কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক নিশ্চয়তা নেই। যদিও তাদের মতবাদকে সত্য বলে ধরা হয়। কোন দার্শনিক মতবাদ সুদূরপ্রসারী যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না। আল্লাহ পাক যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা মুমিনদের অন্তরকে প্লাবিত করেন কেবলমাত্র সেই জ্ঞান দ্বারাই প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করা যায়। এই ধরনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারাই নবীগণের নিকট অবতীর্ণ ওহীর দ্বারা সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং প্রকৃত আকাঈদ তত্ত্ব নির্ধারণ করা যায়।

বস্তুতঃ ইমাম গাযযালীর চিন্তাধারা তাঁর দার্শনিক অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের ফলে স্পষ্টতা লাভ করেছে এবং তাঁর সাহায্যে গ্রিক যুক্তিতর্কের সংশোধিত ও পরিমার্জিত নীতি পদ্ধতি মুসলিম চিন্তা জগতে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইমাম আশয়ারী যে কাজকে অর্ধ সচেতনভাবে শুরু করেছিলেন, ইমাম গাযযালী তা-ই পূর্ণজ্ঞানে সমাপ্ত করলেন। অধিকন্তু গ্রিক যুক্তি প্রণালী ব্যবহার করে তিনি স্বকীয় মৌলিকতা বলে একটি প্রায়োগিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তী ধর্মশাস্ত্রবিদগণ তাঁর ভাবধারা কখনো কখনো বুঝতে পারেননি এবং অনুকরণ করেননি। 'আল মুন্‌কিজু মিনাদ দালাল'—গ্রন্থে তিনি নিজে এ সম্বন্ধে যে বিবরণী লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। ব্যক্তিগতভাবে গাযযালীর নিজের জন্য এবং ইসলামি চিন্তাধারার বিকাশের জন্য দর্শনের প্রয়োজন ছিল খুবই সুস্পষ্ট।

হিজরী ৪৮৮ সালে বারকিয়ারুক সেলজুক শাসনকর্তা হলেন। ইমাম গাযযালী (রহঃ) স্বাভাবিক কর্মজীবন ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুসন্ধানে বহির্গত হবার অব্যবহিত পূর্বে 'বারকিয়ারুক' তার চাচা 'তুতুশকে' হত্যা করেন। যে খলীফার দরবারে ইমাম গাযযালী (রহঃ) উচ্চপদে আসীন ছিলেন, সেই খলীফা তুতুশের পক্ষাবলম্বন করলেন। ৪৯৯ সালে তিনি পুনরায় কর্মজীবনে প্রবেশ করবার পূর্বেই ৪৯৮ সালে 'বারকিয়ারুক' মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রায় দুই বছর সিরিয়াতে অবসর জীবন যাপনের

পর ৪৯০ সালের শেষ ভাগে তিনি হজ্জ করতে যান। তারপর তিনি নয় বছর যাবত এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ান। এই সময়ে মাঝে মাঝে তিনি পরিবার-পরিজনবর্গের সাহচর্যে আসতেন এবং জাগতিক কাজকর্ম করতেন। এই সময় তিনি 'এহইয়াউ উলূমিদ্দীন এবং অন্যান্য কয়েকখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং বাগদাদ ও দামেস্কে 'এহ্ইয়া' গ্রন্থের ভিত্তিতে অধ্যাপনা করেন। তদানীন্তন সুলতান তাঁকে নিযামিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক পদ গ্রহণে বাধ্য করেন। তিনি ৪৯৯ সালের যুলকাদা মাসে উক্ত পদ গ্রহণ করতে সম্মত হন। এই সময়ে প্রবল সংস্কার প্রচেষ্টার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এবং ইমাম গাযযালী (রহঃ) স্বয়ং তা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি এমন একজন পরাক্রমশালী ধার্মিক শাসকের একান্ত প্রয়োজন উপলব্ধি করেন, যার কর্তব্য হবে নাস্তিকতা ও অবিশ্বাস দূরীভূত করা। 'বারকিয়ারুকের' ভ্রাতা মোহাম্মদই ছিলেন দৃশ্যতঃ এইরূপ শাসনকর্তা যিনি ৪৯৮ সালে সেলজুক প্রধান হলেন। ফার্সি ভাষায় রচিত 'তিবরুল মাসবুক' মূলতঃ সৈনিকদের নির্দেশিকা গ্রন্থ এবং তা সেলজুক প্রধান মোহাম্মদকে উদ্দেশ্য করেই রচিত হয়। ইমাম গাযযালীকে পুনরায় কর্মক্ষেত্রে আহ্বানের মূলে ছিল তাঁর পূর্বতন পৃষ্ঠপোষক নিযামুল মুলকের পুত্র 'ফখরুল মুলকের' প্রভাব। তিনি খুরাসানের শাসনকর্তা সানজারের মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু ইমাম গাযযালী (রহঃ) দীর্ঘকাল রাজ দরবারে অবস্থান করেননি। নির্জনবাস ও ধ্যান-ধারণার প্রতি গভীর আগ্রহ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি তারপর তুস নগরীতে প্রত্যাবর্তন করে কয়েকজন বিশেষ অনুরক্ত শিষ্যসহ নির্জনবাস আরম্ভ করলেন। সেখানে একটি মাদ্রাসা ও একটি খানকাহ্ প্রতিষ্ঠার দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এখানে ৫০৫ হিজরী ১৪ই জুমাদাস সানী তিনি ইন্তেকাল করেন।

২। মতবাদ এবং প্রভাব

ইমাম গাযযালী (রহঃ) ফিকাহের গঠন যুগের একজন শীর্ষ মর্যাদাসম্পন্ন আলিম ছিলেন, ফিকাহ যে পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল তাকে তিনি এক নতুন অবস্থান দেয়ার চেষ্টা করেন। তিনি ফিকাহ-এর

কূটতর্কের বিরুদ্ধে জোরালোভাবে প্রচার কাজ চালান এবং ফিকাহ-কে ধর্মবিদ্যার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য করতে সম্মত হননি। কালাম শাস্ত্র সম্পর্কেও তিনি অনুরূপ নীতিই অবলম্বন করেন এবং জনসাধারণের ধর্ম বিশ্বাসকে যুক্তিবিদ্যার সাহায্যে বিন্যস্ত কতগুলো আকাঈদ সূত্রে পরিণত করার প্রবণতাকে প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করেন। তাঁর মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর অনুসরণে তিনি এই কাজে অগ্রসর হন। তিনি মুতাকাল্লিমগণের (যুক্তি-তর্কবাগীশ) অসহিষ্ণুতারও নিন্দা করেন। তিনি প্রকাশ্যে প্রচার করেন যে, যারা ইসলামের মূল নীতিমালা স্বীকার করে চলে, তারাই মুমিন বিশ্বাসী। তিনি আরো বলেছেন যে, অজ্ঞ জনসাধারণের ধর্ম রক্ষায় রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সচেষ্ট থাকা উচিত। একজন উচ্চ মর্যাদাশীল আলিম এবং জনপ্রিয় প্রচারকরূপে স্বীকৃতি লাভ করার কারণে তাঁর সংস্কার নীতিগুলো কার্যকরী হয়েছিল। তাঁর প্রস্তাবিত নীতিগুলো তৎকালীন আলিমগণের ইজমা বা ঐকমত্য লাভ করেছিল। তিনি হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বা ধর্মের নবায়নকারী হিসেবেই নয়, বরং সুষ্ঠু ভিত্তির উপর ইসলাম পুনঃ স্থাপক হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছিলেন। গ্রিক ও ইসলামে সংক্রমিত দর্শনকেও তিনি প্রকাশ্যে আক্রমণ করেছিলেন এবং এর অসারতা প্রমাণ করেছিলেন। তাছাড়া দর্শনকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় ব্যাপারে যে সকল রহস্যাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল তাকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, দর্শন নিছক একটি চিন্তাধারা মাত্র। যে কোনো সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে। তাঁর মতে দর্শনের মাধ্যমে পরম ও চরম সত্যে পৌঁছানো অসম্ভব। শুধু কেবল চিন্তাকে কেন্দ্র করে অধিবিদ্যা (Mataphysics) গড়ে উঠতে পারে না। তাঁর এই মতবাদ পরবর্তী 'আশয়ারী' চিন্তাধারায় পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ লাভ করে। ইতিবাচক কর্মের ক্ষেত্রে তিনি আল কুশায়রীর কার্যক্রম জারি রেখেছিলেন। এই ক্ষেত্রে তিনি দ্বিতীয় নবযুগের সৃষ্টি করেছিলেন।

প্রথম নবযুগের সৃষ্টি হয়েছিল 'আল আশয়ারী' কর্তৃক যুক্তিবিদ্যার সাহায্যে আকাঈদকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে। ইমাম গাযযালীর মতে ধর্মীয় নিশ্চয়তার আদি ভিত্তি হলো আনন্দজনক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

(Ecstatic Experience) এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি নিজে এবং যারা 'আরিফ' (যাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞানলাভ হয়েছে) তারা বুঝতে পারে যে, পূর্ববর্তী পিতৃ-পিতামহগণের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ছিল সত্যভিত্তিক। তারা আরো বুঝতে পারে কিরূপে এই সত্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তিনি সেই সরল বিশ্বাসীদের যুগের দিকে উৎসুক চিত্তে ফিরে তাকাতেন। ফলে, তিনি কুরআন ও হাদীসের অনুধ্যান আরম্ভ করেন নতুন পরিদৃষ্টিতে এবং আল্লাহ-প্রীতি এবং তাঁর শাস্তির ভয়ের উদ্রেক করে সনাতন ইসলামের প্রতি মানুষকে আহ্বান করতে লাগলেন। জনগণের মধ্যে প্রচলিত ধর্মীয় ধারা সম্বন্ধে তাঁর কিছুটা অসহিষ্ণুতা থাকলেও তিনি ছিলেন উদারপন্থী, মুক্তজ্ঞান-সাধনা এবং অনুসন্ধিৎসার উৎসাহদাতা। তাঁর ভাবধারা ইয়োরোপীয় চিন্তাধারায় প্রভাব বিস্তার করেছে এবং আধুনিকতম ভাবধারায় সে প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাঁর ভাবধারা ইয়োরোপে প্রথমে অনুপ্রবেশ লাভ করে Ramon Martin-এর লিখিত Pugio Fedei পুস্তক মারফত। এর দ্বারা প্রথমে প্রভাবিত হন Thomas Aquinas এবং পরবর্তীকালে Pascal।

৩। তাঁর আন্তরিকতা

তাঁর সমসাময়িকগণ প্রথমে তাঁর ধর্মীয় চেতনায় পরিবর্তনের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রথমে ছিলেন তর্কপ্রিয়, সন্দিগ্ধচিত্ত, ধর্মীয় বিষয়ে প্রগাঢ় আলিম ব্যক্তি। পরবর্তীতে হলেন অনুপ্রেরণাদীপ্ত সূফী। তাঁর যুক্তিতর্কে অভিভূত পরবর্তী দার্শনিকগণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন যে, গাযযালীর মতো একজন দর্শনজ্ঞানী ব্যক্তি মুক্তজ্ঞান সাধনায় সূফী হলেন কেমন করে? প্রকৃতপক্ষে তাদের অবাক হওয়ার পেছনে দ্বিবিধ কারণও ছিল বলে অনুমান করা যায়।

(১) তাঁর রচিত 'আল মাদনুন বিহি আলা গায়রে আহলিহি' অর্থাৎ যারা যে গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে না তাদের নিকট তা গুপ্ত থাকবে। এই পুস্তকে অবিশ্বাসমূলক ধর্মীয় মতবাদ স্থান লাভ করেনি। তাঁর রচিত

'ইমলা' গ্রন্থ তাঁরই রচিত 'এহইয়া' পুস্তকের বিরুদ্ধে সমালোচনার প্রত্যুত্তর। এই পুস্তকে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের উদাহরণ উপস্থাপন করে প্রমাণ করেছেন যে, কতিপয় বিশেষ ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তি এবং ধর্মীয় ধারণার উন্নয়ন সাধারণ্যে প্রকাশ অসঙ্গত। কারণ তারা তা হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মীয় কার্যাবলিতে আস্থা হারিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। ব্যবহারিক রীতিনীতির অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় পাওয়া যায় তাঁর লিখিত 'আরবাঈন' নামক পুস্তকে। তিনি তাঁর রচিত 'মিশকাত' ও 'মিজানুল আমল' নামক গ্রন্থদ্বয়ে মাযহাব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এতে কোনো মানুষ তার ধর্মবিশ্বাসের কতটুকু অপ্রকাশ্য রাখবে সে সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। গোড়া হতে ইসলামের ব্যবহারিক রীতিনীতি প্রকৃতপক্ষে এরূপই ছিল। এমনকি ইমাম শাফেয়ী যিনি তর্কশাস্ত্রকে অস্বীকার করেছেন, তিনিও স্বীকার করেছেন যে, বিরুদ্ধবাদীর মুকাবিলায় ধর্মকে সমর্থন দানের জন্যই কিছু সংখ্যক ব্যক্তির জন্য কালামশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। ইবনে খালদুনের মতবাদও অনুরূপই ছিল। তবে, সেই যুগে এর প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছিল। তখন একে ফরযে কিফায়া বলে মনে করা হতো, ফরযে আইন বিবেচনা করা হতো না। বস্তুতঃ এর উদ্ভব ছিল 'আশয়ারীর' "বিল্যাকায়ফের" মতোই। উচ্চতর বুনিয়াদী ধর্মতত্ত্ব কোনো দিনই পরস্পর বিরোধী ছিল না; বরং ক্রমাগত উন্নততর পথে অগ্রসর হতো এবং সাধারণ ধর্ম বিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করত। যে কোনো যোগ্য ব্যক্তি প্রয়োজন বোধে এর সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য তৎপর হতে পারত। পরিশেষে অবস্থার বিপাকে তা ইবনে রুশদের "দ্বৈত সত্য" মতবাদে পরিণত হলো। সত্যের যে বিভিন্ন রূপ ইসলাম স্বীকার করেছে, তা এরই একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত মাত্র।

(২) দ্বিতীয় প্রকার রচনাতেও তারা অনুসন্ধান চালিয়েছেন। ধর্মীয় সত্যের যে রূপটি ইমাম গাযযালী (রহঃ) আবেগময় মুহূর্তে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তা-ই তিনি রূপকের ভাষায় প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তিনি সর্বদা প্রচার করতেন যে, এমন সব ধারণা বিদ্যমান আছে যা যথাযথ পরিভাষার অভাবে ভাষায় প্রকাশ করা

দুরূহ ব্যাপার। তবে, তা রূপকের সাহায্যে বা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে। এই ধরনের প্রকাশভঙ্গিকে যখন পরীক্ষা করা হয় এবং এগুলোকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে হুবহু প্রকাশ বলে গ্রহণ করা হয় তখনই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। তাই মিশকাত গ্রন্থে রূপক বর্ণনায় সূর্যের ব্যবহার দেখে ইবনে রূশ্দ এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন যে, গাযযালী (রহঃ) হয়তো নিউ প্ল্যাটনিক মতবাদ উপস্থাপন করেছেন। এটা মোটেই সত্য নয়। আল্লাহ্র সাথে পৃথিবীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার জন্য প্রায়ই ইমাম গাযযালী (রহঃ) এই রূপক ব্যবহার প্রয়োগ করতেন। এই বিষয়ে এবং মিশকাত সম্বন্ধে W. H. T. Gairdner-এর অভিমত খুবই প্রণিধানযোগ্য। প্রধানতঃ মুনকিয-এর ভিত্তিতে J, Overmana মত প্রকাশ করেছেন যে, গাযযালী (রহঃ) তাঁর চিন্তাধারায় ইসলামি পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব হতে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু A. Tnvan Leeuwen এই ধারণাটির প্রতিবাদ করেছেন। তিনি H. Kraemer-এর সিদ্ধান্ত অনুসরণে এবং আকাঈদ ও তাহাফুতের বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, গাযযালী (রহঃ) কোনোদিনই ইসলামের মৌলিক ধারণা হতে এতটুকুও বিচ্যুত হননি।

গাযযালীর রচনাবলি

ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর প্রণীত পুস্তকাদির মোট সংখ্যা এবং এগুলোর রচনা পরম্পরা সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ কোনো তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। রচনার সময়ের কথা তো অনেক দূরের ব্যাপার। ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর রচনাবলির সাথে যে পুস্তকটি বিশ্বময় আলোচিত, আলোড়িত ও সুউচ্চ মর্যাদার স্থান লাভ করেছে— তা হলো 'এহইয়াউ উলূমিদ্দীন'। এটি তাঁর দার্শনিক গুণাবলির সংক্ষিপ্ত সার সম্বলিত স্বয়ংসম্পূর্ণ পুস্তক। যদিও এতে দর্শন, কালাম বা যুক্তিবিদ্যা এবং সূফীবাদের বিস্তৃত বিবরণ স্থানলাভ করেনি, তবুও এর আলোচনায় রয়েছে পূর্ণতার এক অনাবিল প্রবাহ। বিশেষভাবে এই বিশাল গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে নিরূপণ করলে বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারা যায় না।

এহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন

- খণ্ড-১
  - চতুর্থাংশ-১ (১০টি পরিচ্ছেদ)
  - চতুর্থাংশ-২ (১০টি পরিচ্ছেদ)
- খণ্ড-২
  - চতুর্থাংশ-১ (১০টি পরিচ্ছেদ)
  - চতুর্থাংশ-২ (১০টি পরিচ্ছেদ)

এর প্রথম খণ্ডে ধর্মনিষ্ঠা এবং ধর্মীয় কার্যকলাপের বাহ্যিক রূপ বর্ণিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় খণ্ডে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন ও হৃদয় বৃত্তির ভালো-মন্দ দিকগুলো আলোচিত হয়েছে। এই চারটি চতুর্থাংশের মাঝে আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলো নিম্নরূপ। (ক) 'রুবুউ আল ইবাদাহ' অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার প্রতি সৃষ্টির কর্তব্য কার্যাবলি। 'রুবুউ আল-আদা' অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলি (গ) 'রুবুউ আল মুহলিকাত' অর্থাৎ মানুষের জন্য ধ্বংসকারী বস্তুসমূহ এবং (ঘ) "আর রুবুউ মুনাযিয়াত' অর্থাৎ পরিত্রাণকারী বস্তুসমূহ। তাছাড়া প্রত্যেকটি 'রুবুউ' আবার দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। সর্বমোট এই চল্লিশটি পরিচ্ছেদের প্রথমটিতে এলেম বা জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কালাম বা যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা স্থান লাভ করেছে। শেষ অর্থাৎ চল্লিশতম পরিচ্ছেদে পরকাল তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। মূলতঃ এই বিশাল গ্রন্থের সকল পরিচ্ছেদেই অভিজ্ঞতা প্রসূত, সনাতন পন্থী এবং বাস্তব ভিত্তিক। দ্বিতীয়-চতুর্থাংশের অষ্টম পরিচ্ছেদে সূফীতত্ত্ব ও সূফী ভাবাবেগের সাথে সঙ্গীত বিদ্যা ও গীতের সম্পর্ক (ছামা) আলোচনা করা হয়েছে। আর তৃতীয়-চতুর্থাংশের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃতিসহ মানব হৃদয়ের বিস্ময়কর অনুভূতির বিশ্লেষণ রয়েছে। আর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের চতুর্থ রুবুউতে আল্লাহ-প্রেম বিশ্লেষিত হয়েছে। সাধারণভাবে 'এলেম' সম্বন্ধে একটি ছোট পুস্তিকা গাযযালীর 'ফাতিহা আল উলুম' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের সাথে এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। 'এহইয়াউ' ছাড়া ইমাম গাযযালীর অন্যান্য মুদ্রিত গ্রন্থাবলিকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়।

যথা ঃ (ক) ফিক্হ ও উসূল ঃ (১) কিতাবুল ওয়াজীয্ (২) আল্ মুসতাস্ফা মিন ইলমিল উসূল, (৩) শিফাউল আলল।

(খ) তর্কশাস্ত্র ও দার্শনিকগণের বিরুদ্ধে লিখিত পুস্তকাদি ঃ (১) মিয়্যার আল ইল্ম, তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত পুস্তক। (২) নিহাক আন নাজার ঃ একটি ক্ষুদ্র পুস্তক (৩) মাকাসিদ আল্ ফালাসিফা। এতে অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণযোগ্য বিষয় ছাড়া দার্শনিকগণ সকল বিষয়ে যা শিক্ষা দিতেন তৎসমুদয় সম্বন্ধে বিবৃতি। এটা হিকায়া বা হুবহু বর্ণনার দাবি করে। 'তাহাফুত আল ফালাসিফা' একখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ, যাতে দেখানো হয়েছে যে, যুক্তিতর্ক দ্বারা দার্শনিকগণ তাদের মতবাদসমূহ প্রমাণ করতে পারেননি।

৩। বাতেনী মত খণ্ডনকারী পুস্তক ঃ 'আল ক্বিছ্তাছ আল মুছতাক্বীম'।

৪। ইলম আল কালাম ঃ 'আল রিসালা আল কুদসিয়া' কিতাবটি কাওয়াইদ আল আকাইদ নামে এহইয়ার অন্তর্ভুক্ত। আল ইকতিসাদ ফি আল ইতিকাদ গ্রন্থটি পূর্বোল্লিখিত পুস্তকের বিস্তারিত সংস্করণ এবং কালামের সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত আলোচনা।

৫। যে সব পুস্তক সাধারণ পাঠকের জন্য উপযোগী নয় ঃ 'আল মাদনুন বিহি আলা গায়রে আহ্লিহি' এটি আল্লাহ, তাঁর সৃষ্টি (ফিরিশতা, জ্বিন ইত্যাদি) নবীগণ এবং তাদের মুজিযা এবং পরকালতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিত। আল মাদনুন আল সগীর ভিন্ন নাম আল আজবিবা আল গাযযালিয়া ফী আল মাসাইল আল উখরাবিয়া; মিশকাত আল আনওয়ার জ্যোতিরূপে আল্লাহর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এবং আল্লাহর দিকে আভ্যন্তরীণ আলোকের পথ নির্দেশসূচক গ্রন্থ; জীবনের শেষ দিকে রচিত গ্রন্থ।

৬। কুরআন হাদীস অবলম্বনে পূর্বপুরুষগণের ধর্ম বিশ্বাস ব্যাখ্যা বিষয়ক পুস্তক ঃ আল জাওয়াহির আল কুরআন, কিতাব আল্ আরবাঈন

প্রথমোক্ত পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ। আল্ মাকসাদ আল আসমা ফী আসমা আল্লাহ্ আল হুসনা, আল্লাহর গুণবাচক নামগুলো অনুকরণের উদ্দীপনা-মূলক গ্রন্থ; আল হিকমা ফী মাখলুকাত আল্লাহ্ ও আল্লাহর প্রজ্ঞা সম্বন্ধে সৃষ্টির সাক্ষ্য, আল দুররা আল কাছিরা, আল কাসাফ ওয়া আল তাবঈন ফী গুরুর আল খালেক আজমাঈন—মানবজাতি কী প্রকারে আল্লাহর আনুগত্য হতে বিপথগামী হয়েছে; ইলজাম আল আওয়াম আন ইলম আল কালাম; রিসালা ফী আল ওয়াজ ওয়া আল ইতিকাদ—আর একখানা ইলজাম।

৭। **ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ ঃ** আল রিসালা আল লাদুন্নিয়া যে জ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর নিকট হতে লাভ করা যায়। কিমিয়া আল সায়দাহ্ আরবি ভাষায় 'এহইয়া' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার। আইয়্যুহা আল ওয়ালাদ জ্ঞানের সাথে আর কী কী কর্মের প্রয়োজন সংক্রান্ত আলোচনা। মুকাশাফা আল কুলুব। বিদায়া আল হিদায়া, মীযান আল আমল, খুলাসা আল তাসনীফ ফী আল তাসাউফ তাসাউফের সারবস্তু, মিনহাজ আল আবিদীন অনেকে মনে করেন এটা তাঁর শেষ পুস্তক।

৮। **বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক গ্রন্থসমূহ ঃ** আল্ ইমলা আন্ ইসাকালাত আল ইহ্য়্যা—এটি ইতহাফ আল সাদা-এর হাশিয়ায় মুদ্রিত। আল তাফরিকা বাইনা আল ইসলাম আল জানদাকা, আল মুনকিজ মিন আল দালাল এই গ্রন্থটি ৫০০ হিজরীর পরে রচিত।

৯। **বিবিধ পুস্তক ঃ** আল তিব্‌র আল মাসবুক—এটি বাদশাহদের নীতিশাস্ত্র সংক্রান্ত দর্পণস্বরূপ। সিরব আল আলামাইন ওয়া কাশফু মা ফী আল দারাইন— পার্থিব কৃতকার্যতা লাভের বিষয়ে বাদশাহগণের জন্য লিখিত নিত্য ব্যবহার্য গ্রন্থ। আল তাহযীব ফী ইলম আল তাবীর স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যার মূলনীতিমূলক পুস্তক। আল্ রাদ্দ আল জামীল লি ইলাহিয়্যা ঈসা বি মারীহ আল ইনজীল। কাসিদাহ্ এবং মায়ারিজ আল কুদ্দস।

ইন্তেকাল

মুসলিম জাহানের ক্ষণজন্মা পুরুষ ইমাম গাযযালী (রহঃ) দীর্ঘজীবী হননি। মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়োক্রম কালে তাঁর জীবনের অবসান ঘটে। পাঁচশো পাঁচ হিজরী সনের ১৪ই জমাদিউস সানি সোমবার প্রত্যূষে ফজরের নামাযের পর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। আল্লামা ইবনে জাওযী ইমাম সাহেবের মৃত্যু ঘটনা তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইমাম আহমদ গাযযালীর নিকট থেকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ঐদিন ইমাম সাহেব শয্যাত্যাগ করতঃ অজু করে ফজরের নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি কাফনের কাপড় আনিয়ে তা চোখে মুখে লাগিয়ে বললেন, প্রভুর আদেশ আমার শিরোধার্য। একথা বলে তিনি দু'পা সোজা করে শায়িত হলেন। একটু পরেই সবাই দেখতে পেল যে, সব শেষ। ইমাম সাহেব আর তাদের মধ্যে নেই, তিনি বিদায় হয়েছেন।

ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর মৃত্যুতে সমগ্র মুসলিম জাহান শোক যাতনায় মূহ্যমান হয়ে পড়ল। অসংখ্য কবি শোকগাথা রচনা করে তাঁর উদ্দেশ্যে শোক প্রকাশ করল। ইমাম সাহেবের কোনো পুত্র-সন্তান ছিল না। মাত্র কতিপয় কন্যা সন্তান ছিল। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল সাতুল মণী। ইমাম কাইউমী কিতাবুল মিসবাহে শায়খ মায়দুদ্দীনের নিকট ইমাম সাহেবের বংশাবলি সম্পর্কিত একটি বর্ণনা পেশ করেছিলেন। শায়খ মায়দুদ্দীন সাতুল মণীর নিম্নতম সপ্তম পুরুষ ছিলেন। সাতশো দশ হিজরী সন পর্যন্ত ইমাম সাহেবের বংশাবলির সন্ধান পাওয়া যায়।

ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর সুযোগ্য শিষ্যসংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন অত্যন্ত উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন। মুহাম্মদ ইবনে তুমরত যিনি স্পেনের তাশকীন বংশকে উৎখাত করে স্বয়ং এক স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনিও ছিলেন ইমাম সাহেবের এক

প্রধান সাগরিদ। ইন্দোনেশিয়ার অন্যতম বিশিষ্ট আলিম আল্লামা আবুবকর আরাবীও ইমাম সাহেবের অন্যতম সাগরিদ ছিলেন। এরা ব্যতিরেকে আরো কয়েকজন প্রসিদ্ধ সাগরিদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

কাজী আবু নছর আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ, আবু ফাতাহ আহমদ ইবনে আলী, আবু মনছুর মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল, আবু সাঈদ আহমদ ইবনে আসাদ, আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মালেক, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে আল কুরদী, ইমাম আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া নিশাপুরী, আবু তাহের ইমাম ইব্রাহীম, আবুল ফাতাহ নছর ইবনে মুহাম্মদ আজারবাইজানী, আবুল হাসান সা'দুল খায়ের ইবনে মুহাম্মদ বুলনাসী, আবু তালেব আব্দুল করীম রাজী, আবু মনছুর সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ, আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ জাওযী, সূফী আবুল হাসান আলী ইবনে মাযহার দানূবী, আবুল হাসান আলী ইবনে মুসলিম জামালুল ইসলাম।

পথিকের অগ্রবাক্য

(হামদ) প্রশংসা বাক্য ঃ আকাশের তারকা, বৃষ্টির ফোঁটা, বৃক্ষপত্র, মরুভূমির বালুকা এবং স্বর্গ-মর্ত্যের অণু-পরমাণুতুল্য অনন্ত প্রশংসা সেই মহান স্রষ্টার জন্য, যিনি একত্ব ও অদ্বিতীয়তার গুণে বিভূষিত। মহিমা, মহত্ত্ব, গৌরব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহামর্যাদা যাঁর বিশেষত্ব। যাঁর শান এবং প্রতাপের পূর্ণতা কারো জ্ঞানের আয়ত্তে আসে না। যাঁর প্রকৃত পরিচয় শুধু তিনি ছাড়া আর কারো পক্ষে জানার সাধ্য নেই। যাঁর সত্যিকার পরিচয় লাভে সাধককুল শিরোমণি ছিদ্দীকদেরই ব্যর্থতা হলো শেষ কথা, আর যাঁর যোগ্য প্রশংসা এবং স্তুতিবাদে নিজেদের অসামর্থতা প্রকাশ করা হলো ফিরেশতা এবং নবী-রাসূলদেরই শেষ করণীয়।

যাঁর প্রতাপের তথা জালালিয়াতের প্রথম চমক দেখে জ্ঞানীদের জ্ঞানহারা হওয়া, জ্ঞানের শেষ প্রান্ত যাঁর সৌষ্ঠবময় দরবারের নৈকট্যাসনের সাধনায় শ্রান্ত এবং বুদ্ধিহারা হওয়া খোদাতত্ত্ব পিপাসু সালেক তথা তরীকতপন্থীদের পরিণতি। তবু এ সাধনা থেকে বিরত হওয়া কদাচ অনুচিত। কেননা খোদা তত্ত্বজ্ঞান লাভে নৈরাশ্য শুধু স্বীয় জীবনের ব্যর্থতাই ডেকে আনে। পক্ষান্তরে, কোনো সাধক আবার যেন স্রষ্টার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছে বলেও দাবি না করে। মূলতঃ খোদার সত্তার সৌন্দর্য দর্শনের চেষ্টায় লিপ্ত চোখের প্রাপ্য শুধু চোখের দৃষ্টি ঝলসে যাওয়া। এর স্থলে বরং আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি নৈপুণ্যে ও ক্রিয়াকলাপের প্রতি লক্ষ্য করলে যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির অন্তরপটে স্বভাবতঃই আল্লাহতত্ত্ব জ্ঞান প্রতিফলিত হয়। সুতরাং স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্যের প্রতি লক্ষ্য না করে কেউ যেন তাঁরই মহান সত্তার ব্যাপারে এরূপ চিন্তায় ব্যাপৃত না হয় যে, সেই সত্তা কিরূপ এবং কে তাঁকে সৃষ্টি করেছে? বরং পার্থিব জগতের সম্যক বস্তুর সৃষ্টি ও অস্তিত্ব লাভ কার দ্বারা হলো এ বিষয়টি ভাবনা-চিন্তা করা থেকে কারো মন এতটুকু মাত্র উদাসীন না থাকে। কেননা এরূপ চিন্তার ফলে প্রকৃতই অনুভূত হবে যে, এ নিখিল বিশ্বের সমুদয় মাখলুক তাঁরই মহাশক্তির বাস্তব নিদর্শন। তাঁরই অপার মহিমার

জ্বলন্ত প্রতীক এবং তাঁরই মহত্ত্বের অত্যুজ্জ্বল আলামত। সব বিস্ময়কর ও বিচিত্র বিষয়বস্তুর উৎস কেবল তাঁরই হেকমত ও কুদরত। যার যে সৌন্দর্যতা সব তাঁরই সুন্দরতর নূর থেকে নিঃসৃত। যা কিছু বিদ্যমান সব তাঁরই থেকে উদ্ভূত। তাঁরই উসিলায় যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব। বরং তিনি স্বয়ংই সবকিছু। কেননা প্রকৃতপক্ষে তাঁর অস্তিত্ব ছাড়া কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই; বরং সমুদয় বস্তুর অস্তিত্ব শুধু তাঁরই অস্তিত্বের প্রতিচ্ছবি মাত্র।

(নাত) গুণকীর্তন বাক্য ঃ অফুরন্ত-অগণিত দরূদ ও সালাম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি, যিনি সব নবী-রাসূলের সরদার ও ইমাম এবং ঈমানদারদের পথপ্রদর্শক, পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালার খোদায়িত্বের খবরদার এবং আল্লাহ পাকের মনোনীত ও প্রিয়তম ব্যক্তি। তাঁর সব আল-আছহাব এবং পরিবার-পরিজনদের প্রতিও দরূদ ও সালাম যারা সবাই-ই উম্মত দরদী ও শরীয়তের পথের দিশারী।

অতঃপর হে প্রিয় পাঠক! স্মরণ রেখ, আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে কেবল অহেতুকভাবে সৃষ্টি করেননি; বরং তাদের রয়েছে বিরাট কাজ, কিন্তু তাদের সামনে আবার বিপদও রয়েছে ভীষণ। মানুষ অবশ্য অনাদি নয়, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব স্থায়ী (পরকালে পুনর্জীবিত হয়ে পাপী পুণ্যবান সবাই-ই অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে।) তাদের দেহ পিঞ্জর যদিও তুচ্ছ মৃত্তিকায় তৈরি তবু তাদের আত্মা নানা গুণে গুণান্বিত। যদিও মানবসত্তা প্রাথমিক পর্যায়ে হীন ও হিংস্র জন্তু এবং পাপী শয়তান সুলভ স্বভাব বিজড়িত থাকার ফলে মলিন ও পঙ্কিল থাকে, তবু আত্মিক সংযম ও সাধনার আগুনে প্রজ্বলিত করে নিলে সব পঙ্কিলতা দূরীভূত হয়ে তারা আল্লাহর পাক দরবারের নৈকট্য লাভের যোগ্যতার্জনে সক্ষম হয়।

'আসফালা সাফিলীন' অর্থাৎ নীচ ও নিকৃষ্টতার অতল গর্ত থেকে আলা ইল্লিয়্যীন তথা পরমোৎকৃষ্টতার উচ্চতম শিখর পর্যন্ত যাবতীয় বদ এবং নেককাজ করার উপাদান মানুষের মাঝে রয়েছে। মানুষের আসফালা সাফিলীন হলো, সে কখনো কখনো হীন ও নীচ উপাদানজনিত কুস্বভাবের কারণে হীন পশু এবং শয়তান সদৃশ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি জঘন্য রিপুগুলোর প্রভাবে পড়ে যায়। আর মানুষের আলা ইল্লিয়্যীন হলো,

সে আবার কখনো কখনো উৎকৃষ্টতম তথা ফিরেশতা সদৃশ স্বভাবের ফলে অনুরূপ গুণাবলি অর্জন করতঃ ফিরেশতাকুলেরই সমমর্যাদা লাভ করে। কাম-ক্রোধ ও অন্যান্য কুরিপুসমূহ তখন তার বশ হয়ে যায় এবং সে সেগুলোর প্রভুরূপে পরিণত হয়। এভাবে রিপুর উপর কর্তৃত্ব লাভের দ্বারাই মানুষ আল্লাহর খাঁটি বান্দা হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে।

মানুষ যখন স্রষ্টার সুষমা বা আল্লাহর মনোহারিত্ব-প্রেমে বিমুগ্ধ হয়, তখন সে মনোহারিত্বের ধ্যান ব্যতিরেকে মানুষ একটি পলকও স্থির থাকতে পারে না। শুধু আল্লাহ পাকের সৌন্দর্যোপলব্ধিই তখন তার কাছে পরম স্বর্গতুল্য হয়ে যায়। কুরআনে পাকে যে বেহেশতের উল্লেখ আছে, যার বিচিত্র শোভাদর্শনে চোখের তৃপ্তি, অপূর্ব স্বাদযুক্ত ফল ভক্ষণে রসনা ও উদরের তৃপ্তি এবং সুন্দরী হুরীদের রূপ সুষমায় হৃদয়ের তৃপ্তি তা আল্লাহর সৌন্দর্যোপলব্ধিজনিত তৃপ্তির তুলনায় একান্তই তুচ্ছ।

যেহেতু মানুষ সৃষ্টির প্রথম লগ্নে উপাদানগত দুর্বল ও নিকৃষ্ট। সুতরাং তাদেরকে এ নিকৃষ্টতা ও অপূর্ণ অবস্থা থেকে উৎকৃষ্টতম এবং পূর্ণতার অবস্থায় পৌছানো যথাযথ শ্রম, নিরলস সাধনা এবং দুর্বলতার চিকিৎসা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। জগদ্বিখ্যাত কিমিয়া অর্থাৎ পরশ পাথর বা স্বর্ণতৈরি কৌশল দ্বারা যে কোনো ধাতুকে পরিচ্ছন্ন করতঃ মূল্যবান স্বর্ণে পরিণত করা হয় তা আয়ত্ত করা যেমন কঠিন এবং সবার পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি এ কিমিয়া অর্থাৎ হীন ও হিংস্র জীব এবং শয়তানোচিত জঘন্য স্বভাবাপন্ন মানুষকে ফিরেশতাতুল্য পাক-পবিত্র ও উৎকৃষ্ট স্বভাবে বিভূষিত করে চির সৌভাগ্যের ভাগী করার প্রক্রিয়া আয়ত্ত করাও দুষ্কর এবং কারো পক্ষেই সহজসাধ্য নয়। এই পথে অগ্রসর হতে হলে 'রূহের হাকীকত' সম্পর্কে জ্ঞান হওয়া একান্ত দরকার। আসুন এই প্রয়োজনানুসারে অগ্রসর হওয়া যাক।

পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা

ইমাম গাযযালী (রহঃ) হাকীকতে রূহ অর্থাৎ 'রূহ কী এবং কেমন' গ্রন্থখানি যে পরিবেশের কারণে বন্ধুদের কথার জবাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তার সম্যক পরিচয় সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন। এই কিতাবখানি লেখা হয়েছিল 'একজন বাতেনী শিয়া' মতবাদে বিশ্বাসী বন্ধুর ভ্রান্ত বিশ্বাসকে খণ্ডন করার জন্য।

মুসলমানদের মাঝে তিনটি ফিরকা বা দল খুবই প্রসিদ্ধ। (১) সুন্নী যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত। তারা কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং কিয়াসের ভিত্তিতে ধর্মীয় বিষয়ের ফায়সালা করে থাকেন। (২) খারেজী অর্থাৎ দলচ্যুত। তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে পরিত্যাগ করে নতুন পথের অনুসারী হয়েছিল। খারেজীদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম অস্ত্রধারণ করেছিলেন মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলীফা সাইয়্যেদেনা হযরত আলী (রাঃ)। (৩) শিয়া ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রাঃ) ন্যায়তঃ খলীফা হওয়ার দাবি করেছিলেন, এই মতবাদের ভিত্তিতে এই দলের উদ্ভব হয়।

শিয়াদের ধর্মবিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরূপ ঃ (ক) তারা এক আল্লাহতে বিশ্বাস করে। (খ) তারা অনাদি অসৃষ্ট কুরআনের অবতীর্ণ হওয়াতে বিশ্বাস করে। (গ) তারা এটাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর বিশেষভাবে মনোনীত তাঁর সত্তার অংশী ইমামই হলেন মুক্তির পথ প্রদর্শক। এই তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী শিয়াদের মাঝে এমন দলও আছে, যারা মনে করে যে, ইমামের মৃত্যু হয় না বরং তিনি অন্তর্হিত হন এবং সময় হলে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে পুনঃ প্রেরিত হবেন তিনিই 'মাহদী'।

বস্তুতঃ মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামি রাষ্ট্রের নেতৃত্ব কে করবে এই প্রশ্নে সুন্নীদের নীতি ছিল এই যে, এরূপ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে মত প্রকাশ করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচিত প্রতিনিধিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং তিনি কুরাইশ বংশীয় হবেন। ইসলামি রাষ্ট্রের পরিচালক জনগণের আস্থাভাজন

হবেন। এই ধারণা প্রথম চারি খলীফা নির্বাচনের মাধ্যমে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) খলীফা পদে নির্বাচিত হবার পর তাঁর প্রথম বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিলেন যে, খলীফা যতদিন পর্যন্ত কুরআন ও সুন্নার ভিত্তিতে রাষ্ট্র এবং সমাজ পরিচালনা করবেন, ততদিন পর্যন্ত তিনি জনগণের আনুগত্যের অধিকারী থাকবেন। পরবর্তী খলীফাগণও এই নীতি মেনে নিয়েছিলেন। এমনকি যখন খেলাফত, রাজত্বে রূপলাভ করল, তখনো এই নীতির প্রতি মুসলিম শাসকগণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

পরবর্তীতে আরো দুটি মতবাদ গড়ে উঠে। একটি মতবাদ ইসলামের প্রথম গৃহযুদ্ধের সূত্রে উদ্ভূত "খারিজী"গণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচার লাভ করে। তাদের মতে খলীফার বংশ পরিচয় নিতান্ত গুরুত্বহীন। এমনকি একজন হাবশী কৃতদাসও খলীফা হতে পারবেন। খারিজীগণ মূলতঃ সিফফীনের যুদ্ধের পর খিলাফতের প্রশ্নে "সালিসী" ব্যবস্থা বিশেষতঃ অপ্রত্যাশিত সালিসী রায়ের বিরুদ্ধে খিলাফতের বৈধতা অস্বীকার করে।

অপর ফিরকা অর্থাৎ 'শিয়া' খিলাফত বনাম গণসমর্থনের ভিত্তিতে নির্বাচিত খলীফার আনুগত্য স্বীকার করতে রাজি নন। এমনকি কুরাইশ হলেও নয়। তাদের মত হলো—আহলে আল বাইত (নবীর পরিবার) অর্থাৎ হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বংশোদ্ভূতগণই ইমামতের অধিকারী। পূর্ববর্তী ইমাম তার পরবর্তী উত্তরাধিকারী ইমামের মনোনয়ন দান করবেন। শিয়া ধর্মপুস্তকসমূহে দেখা যায় যে, "যে ব্যক্তি তার সময়ের প্রকৃত ইমাম কে, তা না জেনে মৃত্যুবরণ করবে, সে কাফিররূপে মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

শিয়াদের বর্ণনানুসারে প্রাথমিক শিয়া ছিলেন তিনজন। (ক) হযরত সালমান আল ফারেসী (রাঃ) (খ) আবু যার (রাঃ) এবং (গ) হযরত মিকদাদ ইবনে আল আসওয়াদ আলকিন্দি (রাঃ)। তাঁরাই (কোনো কোনো বর্ণনাতে আরো অনেক ব্যক্তি) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রাঃ)-এর নেতৃত্বের পক্ষপাতি ছিলেন। কাজেই তারা ধর্মভ্রষ্ট হননি। অধিকাংশ শিয়াগণের মতে এই তিনজন ছাড়া অন্য সাহাবীগণ হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে

খলীফা মনোনীত করায় বৃন্তচ্যুত হয়েছিলেন—এই মত প্রকৃতই ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টতার পরিচায়ক।

খিলাফতের বিগত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, খিলাফত আল আহলে বাইত অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিজন নামে পরিচিত হযরত আলী (রাঃ) বংশীয়গণের মাঝে রক্ষিত হবে, এই ধারণা কখনো সফল হয়নি। হিজরী ৩৫—৪০ এই সময়ের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ)-এর অল্পকাল স্থায়ী খণ্ডিত খিলাফত ছিল অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ— বিক্ষুব্ধ এবং তাঁর পুত্র হযরত হাসান (রাঃ)-কে খলীফা বলাই কঠিন। প্রথম আলী বংশীয় স্বাধীন রাজ্য ১৭২ হিঃ সালে মরক্কোতে হাসান বংশীয় প্রথম ইদরীস ইবনে আবদুল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তার রাজ্যের অধিবাসীরা ছিল 'সুন্নী'। এজন্য একে শিয়া রাজ্য বলা যায় না বরং আলী বংশীয় রাজ্য বলা চলে। হযরত আলী (রাঃ) বংশীয় শাসনকর্তাদের অধীনে যে কয়েকটি রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল তন্মধ্যে ইয়ামেনের ইমাম ছিলেন শিয়া, বিশেষতঃ যায়দী।

'শিয়া' নামের উৎপত্তি নিয়েও চমকপ্রদ বিবরণ পাওয়া যায়। আরবি ভাষায় "শিয়াতুন" শব্দের অর্থ হচ্ছে দল, শ্রেণি ইত্যাদি। আর 'আলী' শব্দ দ্বারা মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)-কে বুঝানো হয়ে থাকে। 'শিআতু আলী (রাঃ)-এর অর্থ হচ্ছে হযরত আলী (রাঃ)-এর দল বা শ্রেণি। অধিক ব্যবহারের প্রেক্ষিতে "শিয়াতু আলী" শব্দটি সংক্ষেপে "শিয়া" শব্দে ব্যবহৃত হতে থাকে। কেননা হযরত আলী (রাঃ)-এর দল হতেই 'শিয়া' নামের প্রচলন হয়েছিল।

রাজনৈতিক অঙ্গণে শিয়াগণকে নানা রকম বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এজন্য তারা ধর্মীয় বিষয় অনুশীলনে মনোনিবেশ করেন। শিয়াদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এই কাজের প্রসারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। হযরত আলী (রাঃ)-এর বংশধরগণ একের পর এক শহীদ হয়েছেন। জনৈক খারিজীর হস্তে নিহত হযরত আলী (রাঃ)-এর রক্ত অপেক্ষা সরকারি সৈন্য (ইয়াজীদ) বাহিনীর হাতে নিহত তাঁর পুত্র হুসাইন (রাঃ)-এর রক্তই "শিয়া" মতবাদের ভিত্তি স্থাপনে বেশি সহায়তা করেছিল। এই ঘটনা হতেই শিয়াগণের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ প্রবণতার

আবির্ভাব হয়। শিয়াগণ তাদের অবস্থানে এতই সুদৃঢ় যে, অন্যান্য মতের সমর্থন তাদের মাঝে মোটেই পরিলক্ষিত হয় না।

শিয়া মতবাদের তিনটি প্রধান রূপ দেখা যায়। যথা ঃ

(ক) যায়দী ঃ তারা সুন্নীগণের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। তারা ঈমানের মধ্যে "আল্লাহর অভিব্যক্তি"মূলক মতবাদের নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দান করেন এবং বলেন—এর অর্থ আল্লাহ্ হতে সত্য পথের নির্দেশ লাভ করা। তারা আলী (রাঃ)-এর বংশীয় ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে অলৌকিকভাবে আধ্যাত্মিক আলোকের প্রবাহ স্বীকার করেন না। ইমামগণের শাহাদাত লাভ সম্বন্ধে আলোচনা তারা প্রধানতঃ রাজনীতি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখেন অর্থাৎ শাহাদাতকে ধর্মীয় আকাঈদ-এ রূপদান করেন না। এই যায়দী দলের সর্বকালের প্রচেষ্টা হলো মানুষের তরবারির বলে এবং আল্লাহর সাহায্যে আলী বংশীয়গণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। 'ইমাম মাহ্দীর' আবির্ভাব সম্বন্ধে নানা প্রকার মতবাদের উত্তর তারা সাফল্যের সাথে নিবারণ করেছেন।

(খ) চরমপন্থী শিয়া ঃ তাদের মতে ইমামের মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্তা সম্পূর্ণরূপে স্থিতি লাভ করে। এই অবস্থাকে সম্পূর্ণ "হুলুল" বলা হয়। ইমামের লৌকিক সত্তা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং অবশেষে তাঁর কাছে স্বয়ং আল্লাহরও কোনো স্থান থাকে না।

(গ) মধ্যপন্থী ইমামীগণ ঃ (এবং যায়দীগণ) এই মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করেন। তাদের মতে এই "হুলাতই" শিয়া মতবাদকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে এবং তারা ইসলাম হতে দূরে সরে গেছে। ইমামীগণের মতে, ইমাম মরণশীল, কিন্তু একটি স্বর্গীয় জ্যোতি (নূর) আংশিক "হুলুল" ক্রমে ইমামের মধ্যে অবস্থান করে। চরমপন্থীদের মতে ইমামের মৃত্যু হলো আধ্যাত্মিক আলোকপ্রাপ্ত সত্তার বিলোপ। কিন্তু ইমামীগণের মতে একটি ধর্মীয় প্রেরণার প্রভাবে ইমামের মৃত্যু ইমামের পক্ষে একটি আনন্দের বিষয়। ইমামের মৃত্যু তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এই আকীদা তাদের মাঝে বদ্ধমূল। কারবালার যুদ্ধে আল্লাহ্ পাক বিজয়ের ফেরেশতাকে ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি আল্লাহর নিকট যাওয়াই পছন্দ করলেন। ইতিহাসের ধারায় শিয়াদের এই তিনটি সম্প্রদায় আরো বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

যায়দী আন্দোলনের ফলে তাবারীস্থান ও দায়লামে হিজরী ২৫০ হতে এবং ইয়ামেনে হিজরী ২৮৪ হতে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠে। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে দূরত্বের জন্য এই রাজ্যগুলো রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করতে পারেনি এবং ধর্মীয় মতবাদের ঐক্য স্থাপনও সম্ভব হয়নি। ইরাকের যায়দীগণ নিজেদের বাসভূমিতে কখনো স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। প্রয়োজন ও আপদকালে ইমাম ও তাঁর অনুসারীগণ নিজেদের পরিচয় ও মত গোপন রাখতেন এবং গোপনভাবেই নিজেদের মতবাদ প্রচার করতেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হিজরী তৃতীয় শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন শিয়া দলগুলোর বাঁধন দৃঢ় হয়ে উঠতে থাকে। এর সূচনা দেখা যায় প্রথম যায়দীগণের মধ্যে। আল কাসিম ইবনে ইব্রাহীম ইবনে তাবাতাবা আল রাশসী একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিয়া আকাঈদ ও ফিক্‌হী আইনের ভিত্তি রচনা করেন। তার পৌত্র ইয়াহইয়া ইবনে আল হুসাইন ২৮৪ হিঃ সনে ইয়েমেনে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ২৫০ হিঃ সনে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন যায়দী রাষ্ট্রেরও তাবাতাবার শিক্ষা আংশিকভাবে প্রচলিত হয়েছিল। ২৯৭ হিঃ সালে ইসমাঈলী ফাতেমীগণের রাজ্য আফ্রিকাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সময়ে কারমাতী দলের কয়েকটি শাখার হস্তে উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ আরবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি ভূভাগের কর্তৃত্ব ছিল। এখানে শিয়াদের প্রধান শাখা 'ইমামী' বা ইছনা আশারিয়াগণের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অপরিহার্য মনে করছি।

শিয়া শব্দটি প্রধানতঃ ইমামীগণের সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়। তারা অধিকাংশই ইরানের অধিবাসী, ইরাকের অর্ধাংশেরও বেশি অধিবাসী এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গোষ্ঠিগুলো ছাড়াও পাক-ভারত বাংলা উপমহাদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইরানী শিয়াই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের সাহিত্যই অন্যান্য শিয়া সম্প্রদায়ের সাহিত্যের তুলনায় সর্বাপেক্ষা সহজপ্রাপ্য। ইমামীগণ মধ্যমপন্থী বলে তাদের সাহিত্য শিয়া মতবাদ ও সমস্যাসমূহের অনুধাবনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সূত্র।

শিয়া এবং সুন্নীদের মতের মাঝে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বিদ্যমান। সুন্নীগণ আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে মধ্যস্থরূপে একজন ইমামের প্রয়োজন মনে করেন না। তাদের মতে প্রত্যেক বিশ্বাসী প্রেমিকের পক্ষে আল্লাহর

সাথে মিলন সম্ভবপর; সুতরাং শিয়াদের বিশ্বাস যথা মনোনীত ইমামের মধ্যে আল্লাহর খানিকটা সত্তার অবস্থিতি এবং সুন্নীগণের বিশ্বাসের মধ্যে প্রায় দুই বিপরীত মেরুর দূরত্ব বিদ্যমান। ঠিক এইভাবে মুসলমান সাধক পুরুষগণের প্রতি এই দুই দলের সম্মান প্রদর্শনে মূল এবং উদ্দেশ্যও অনেকাংশে বিভিন্ন; সুতরাং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বৈপরীত্য ও সংঘর্ষের। এই দুই দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ ঘটে 'হাল্লাজ'-এর হত্যার ব্যাপারে ইমামী শিয়া আবু সহল আল নাওবাখতী-এর সক্রিয় অংশ গ্রহণে। হাল্লাজের এই দাবি যে, তিনি সেই যুগের গুপ্ত ইমামের ওয়াকীল—শিয়াদেরকে গুরুতরভাবে আঘাত করেছিল।

শিয়াগণ দার্শনিকগণকেও সন্দেহের চোখে দেখতেন। 'হুলাত'-এর ব্যাপারে সমস্ত ইমামীগণ মনে করতেন দার্শনিক মতবাদ শিয়া মতবাদের ভিত্তিগাত্রে আঘাত হানতে পারে। তবে, এমন অনেক গূঢ়বাদী ও দার্শনিকও আছেন যারা খাঁটি শিয়া বলে পরিচিত এবং শুধু প্রচলিত বিতর্কের ধারায় তাদেরকে শিয়াদলের বহির্ভূত বলা যাবে না। শিয়া, সুন্নী এবং দার্শনিকদের মধ্যে পারস্পরিক অনুকরণ ও বিরাগ এবং আকর্ষণ ও বিকর্ষণের দৃষ্টান্ত পাশাপাশি বিরাজমান দেখা যায়। সে যাই হোক, ইমাম গাযযালী (রহঃ) ইমামী বাতেনী শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী বন্ধুর সাথে মোনাজারাহ বা বিতর্কের মাধ্যমে প্রকৃত সত্যকে উপস্থাপন করতে গিয়ে "সঠিক দাঁড়িপাল্লার" দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং ইমামী বাতেনী মতবাদের অনুসারী বন্ধুকে হেদায়েতের পথে আনয়নে সক্ষম হয়েছিলেন। 'ক্বিছতাছুল মুছতাক্বিম'—সেই মোনাজারারই বিস্তৃত প্রকাশ।

ইমামী বাতেনী শিয়াদের মাঝে আকীদাগত যে দিকটি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে আসার সুযোগ দিচ্ছে না, ইমাম গাযযালী (রহঃ) সেই অন্ধকারের আবরণকে চিরতরে দূরীভূত করার পথ নির্দেশনা প্রদান করেছেন—'হাকীকতে রূহ' রিসালা-এর মাধ্যমে। মূল সত্যকে উদ্‌ঘাটন করার যে হিকমত তিনি বাতলে দিয়েছেন, এই দাঁড়িপাল্লার দ্বারা ঈমান ও আকীদা সংক্রান্ত সকল বিষয়ই ওজন করা যাবে এবং যথার্থ সত্য নিরূপণের পথ সহজতর হবে। এই হেকমত অনুধাবন করার তাওফীক সকলেরই নসীব হোক এই প্রত্যাশা আজকের একান্ত চাহিদা। "ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ"।

প্রথম অধ্যায়

দিক দর্শন

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ
رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً ○

"তারা আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বলে দিন, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত, এ বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে"।

(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ঃ ৮৫ ঃ পারা-১৫ ঃ রুকু-৯)

"রূহ (رُوْحٌ)"

'রূহ (رُوْحٌ) সম্পর্কে মানুষের জিজ্ঞাসার ও জানার আগ্রহ অনেক বেশি। মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান, মনীষা, প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির দ্বারা সর্বকালেই 'রূহ' সম্পর্কে জানার ও বোঝার চেষ্টা করেছে। অবস্থা, অবস্থান, প্রয়োজন ও পরিবেশের কারণে বিভিন্ন সময়ে 'রূহ' সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

আরবি ভাষায় 'রূহ' শব্দটির আরো একটি প্রতিশব্দ আছে 'নাফস' (نَفْسٌ)। রূহ এবং নাফস শব্দদ্বয়ের ব্যবহারিক ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য করলে অনেকাংশে রূহ বা নাফস কী এবং কেমন, তা অনুধাবন করা সহজ হবে।

আরবি ভাষার বিখ্যাত অভিধান 'কিতাবুল আইন' 'আস সিহাহ' 'আল মুহকাম' 'লিসানুল আরব' 'আল ক্বামুসুল মুহিত ওয়াল ক্বামুসুল ওয়াছিত' 'আকরাবুল মাওয়ারিদ' আল মুনজিদ এবং মিছবাহুল লুগাত'-এ 'রূহ' ও 'নাফস' শব্দদ্বয়ের বিশ্লেষণাত্মক ব্যবহারিক দিক তুলে ধরা হয়েছে। এ পর্যায়ে আমরা মিছবাহুল লুগাতে 'রূহ' ও 'নাফস' শব্দের যে ব্যবহারিক দিক আলোচন করা হয়েছে তা নাজেরীনদের সামনে উপস্থাপনা করতে প্রয়াস পাব।

মিছবাহুল লুগাত-এর বর্ণনা

১। اَلرُّوْحُ 'রূহ' (পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ) প্রাণ। বলা হয় هُوَ خَفِيْفُ الرُّوْحِ -

অর্থাৎ তিনি পবিত্র ও স্বচ্ছ প্রাণ। ওহী, আল্লাহর নির্দেশ। কুরআন আল্লাহর পয়গাম। জিব্রাঈল।

اَلرُّوْحُ الْاَعْظَمُ আল্লাহ তায়ালা। রুহুল কুদ্স। খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদের তৃতীয়বাদ اَلرُّوْحُ الْاَمِيْنُ হযরত জিব্রাঈল (আঃ)। সম্বন্ধ স্থাপনের

জন্য (রূহানী)। বহুবচন أَرْوَاحٌ আরওয়াহ। এক প্রকার খনিজ দ্রব্য (পারদকে নির্দেশ করা হয়) বলা হয়ঃ الْأَرْوَاحُ الْخَبِيثَةُ শয়তানসমূহ। অপবিত্র রূহসমূহ।

২। اَلنَّفْسُ 'নাফস' বা রূহ, রক্ত। বলা হয় وَفَقَ نَفْسُهُ তার রক্ত উছলে পড়ছে। দেহ। শরীর। বলা হয় هُوَ أَعْظَمُ النَّفْسِ সে বৃহদাকার দেহবিশিষ্ট। বদনজর। বলা হয় أَصَابَتْهُ النَّفْسُ তার বদনজর লেগেছে। ব্যক্তি عَيْنُ الشَّيْءِ - نَفْسُ الشَّيْءِ এবং তাকীদ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। বলা হয় جَاءَنِيْ هُوَ نَفْسُهُ و بِنَفْسِهِ অর্থাৎ সে নিজেই এসেছে। বলা হয় نَفْسُ الْأَمْرِ মূল কাজ। মূল কর্ম। শ্রেষ্ঠত্ব। হিম্মত, সম্মান, ইচ্ছা, রায়, দোষ, শাস্তি, পানি।

নাফস (نَفْسٌ) শব্দের অর্থ যদি 'রূহ' হয় তাহলে এটা স্ত্রীলিঙ্গ হবে। যেমন خَرَجَتْ نَفْسُهُ মহিলা বের হয়েছে। আর যদি ব্যক্তি অর্থে হয়, তাহলে পুংলিঙ্গ হবে। যেমন عِنْدِيْ خَمْسَةَ عَشَرَ نَفْسًا আমার কাছে দশজন লোক আছে। বহুবচন أَنْفُسٌ نُفُوْسٌ আনফুস নুফুস। বলা হয় যেমন فِيْ نَفْسِيْ أَنْ أَعْمَلَ كَذَا আমার ইচ্ছা আমি এমনই করব। وَفُلَانٌ يُؤَامِرُ نَفْسَهُ وَيُشَاوِرُ هُمَا অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি নিজের কাজে দ্বিধাগ্রস্ত। এবং তার দ্বিমত আছে, কোনোটির উপরই দৃঢ়তা নেই। বলা হয় وَخَرَجَتْ نَفْسُهُ وَجَاءَ بِنَفْسِهِ সে মারা গেছে।

এই নিরিখে জানা যায় যে, 'রূহ' শব্দের দ্বারা প্রাণ, ওহী, আল্লাহর নির্দেশ, আল্লাহর পয়গাম, কুরআন, জিব্রাইল বুঝানো হয় এবং নাফস শব্দ রূহ, রক্ত, দেহ, শরীর, বদনজর, ব্যক্তি, মূল কাজ, শ্রেষ্ঠত্ব, হিম্মত, সম্মান, ইচ্ছা, রায়, দোষ, শাস্তি এবং পানি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আল-কুরআনে 'রূহ' শব্দের ব্যবহার

'রূহ' (رُوْحٌ) শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো 'আরওয়াহ' (أَرْوَاحٌ)। আল কুরআনে রূহ শব্দটির একবচনে বহু মাত্রিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ পর্যায়ে আমরা 'রূহ' শব্দটি আল-কুরআনের কোন

সুরায় এবং কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা নিরীক্ষণ করতে প্রয়াস পাব। আসুন এদিকে লক্ষ্য করা যাক।

'রূহ' শব্দটির ব্যবহার আল্-কুরআনে সর্বমোট ২৪ বার লক্ষ্য করা যায়। তন্মধ্যে (১) সূরা বাকারাতে এর ব্যবহার দু'বার হয়েছে। যেমন (ক) ইরশাদ হচ্ছে ঃ এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তারপরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, মরিয়ম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি। এবং 'রূহুল কুদুস' বা পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁকে শক্তিশালী করেছি। তবে কি যখনই কোনো রাসূল এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয় তখনই তোমরা অহংকার করেছ, আর কতককে অস্বীকার করেছ, আর কতককে হত্যা করেছ। (সূরা বাকারাহ ঃ আয়াত-৮৭ ঃ পারা-১ ঃ রুকু ১১)। এই আয়াতে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে দুটি বিশেষ নেয়ামত দান করেছিলেন। এর একটি হচ্ছে 'স্পষ্ট প্রমাণ" যদ্বারা তাঁর সত্যতাকে নিরঙ্কুশ করেছিলেন (بَيِّنَاتٌ)।

এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে "পবিত্র আত্মা" (رُوحُ ٱلْقُدُس) যদ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছিলেন। এখানে "স্পষ্ট প্রমাণ" অর্থ হচ্ছে মুজিযা। এই মুজিযার কথা আল-কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "এবং তাঁকে বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূল করবেন; সে বলবে আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য পাখি সদৃশ আকৃতি গঠন করব, তারপর এতে আমি ফুঁৎকার দেব, ফলে আল্লাহর হুকুমে তা পাখি হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করব এবং আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করব আর তোমরা তোমাদের গৃহে যা আহার কর ও মজুদ কর, তা তোমাদেরকে বলে দেব, তোমরা যদি মুমিন হও, তবে এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ঃ ৪৯; পারা-৩ ঃ রুকু-৫)।

এই আয়াতে "পবিত্র আত্মা" বা রূহুল কুদুস বলতে হযরত জিব্রাইল ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে।

(খ) ইরশাদ হচ্ছে ঃ "এই রাসূলগণ তাদের মধ্যে কাকেও কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, তাদের মাঝে এমন কেউ রয়েছে, যাদের সাথে

আল্লাহ্ কথা বলেছেন, আবার কাকেও উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, মরিয়ম তনয় ঈসাকে 'স্পষ্ট প্রমাণ' প্রদান করেছি ও 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি.....।" (সূরা বাকারাহ্ ঃ আয়াত ঃ ২৫৩, পারা-৩ ঃ রুকু ৩৩)। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে 'স্পষ্ট নিদর্শন' ও 'পবিত্র আত্মার' প্রসঙ্গটি একান্তভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথেই যুক্ত।

(২) সূরা নিসায় "রূহ" শব্দটির ব্যবহার হয়েছে মাত্র একবার। ইরশাদ হচ্ছে ঃ হে কিতাবিগণ! দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া বলো না; মরিয়ম তনয় ঈসা মসীহ্ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং 'তাঁর আদেশ'। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে ঈমান আন.....।

(সূরা নিসা ঃ আয়াত-১৭১ ঃ পারা-৩ ঃ রুকু-২৩)।

বস্তুতঃ রূহ্ অর্থ আত্মা ও আদেশ। এখানে رُوحٌ مِّنْهُ অর্থ হচ্ছে ঃ আল্লাহর আদেশ। জীবের ক্ষেত্রে এর অর্থ আত্মা এবং আল্লাহর ক্ষেত্রে এর অর্থ আদেশ। যথা 'রূহুল্লাহ' (رُوحُ اللّٰهِ) অর্থ আল্লাহর আদেশ।

(৩) সূরা মায়িদাতে 'রূহ' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে একবার। এরশাদ হচ্ছে ঃ 'আল্লাহ বললেন, হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর। পবিত্র আত্মা (رُوحُ الْقُدُسِ) দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম.....। (সূরা মায়িদাহ ঃ আয়াত-১১০ ঃ পারা ঃ ৭ ঃ রুকু-১৫)। এখানে পবিত্র আত্মা দ্বারা জিব্রাঈল ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে।

(৪) "সূরা নাহলে 'রূহ' শব্দটি দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ (ক) তিনি তাঁর বান্দাদের মাঝে যার প্রতি ইচ্ছা নির্দেশ সম্বলিত ওহীসহ (بِالرُّوحِ) ফিরেশতা প্রেরণ করেন, এই মর্মে সতর্ক করার জন্য যে, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; সুতরাং আমাকে ভয় কর।" (সূরা নাহল ঃ আয়াত ঃ ২ পারা ঃ ১৪ ঃ রুকু-১)। এখানে 'রূহ' অর্থ ওহী, অথবা কুরআন।

(খ) "বল তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে 'রূহুল কুদুস' পবিত্র আত্মা সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছে, যারা মুমিন তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এবং হিদায়েত ও সুসংবাদস্বরূপ আত্মসমর্পণ-

কারীদের জন্য।" (সূরা নাহল ঃ আয়াত-২০২ ঃ পারা ঃ ১৪ ঃ রুকু-১৩)। আমরা জানি, রুহুল কুদুস-এর শাব্দিক অর্থ পবিত্র আত্মা। এখানেও পবিত্র আত্মা বলতে জিব্রাঈল (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে।

(৫) সূরা বনী ইসরাঈলে 'রূহ' শব্দটি একই আয়াতে দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "তোমাকে তারা 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বল, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত এবং তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে"। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ঃ ৮৫, পারা ১৫ ঃ রুকু-১০)। এই আয়াতে 'রূহে ইনসানী' ও এর হাকীকত তুলে ধরা হয়েছে। ইহুদিদের পরামর্শে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কুরাইশরা এই প্রশ্ন করেছিল। এখানে সংক্ষেপে রূহের হাকীকতকে আল্লাহর আদেশ ঘটিত (مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ) বলা হয়েছে। কারণ, রূহ জড় জগতের উর্ধ্বের বিষয়। রূহের ব্যাপার মানুষের বোধগম্য নয়। তাই এখানে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি।

(৬) সূরা শোয়ারাতে 'রূহ' শব্দটি মাত্র একবার ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "রূহুল আমিন (জিব্রাঈল আঃ) ইহা (কুরআন) নিয়ে অবতরণ করেছে।" (সূরা শোয়ারা ঃ আয়াত ঃ ১৯৩, পারা ১৯ ঃ রুকু-১১) এই আয়াতে 'রূহুল আমিন' দ্বারা জিব্রাঈল (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে।

(৭) সূরা মু'মিনে 'রূহ' শব্দটি মাত্র একবার ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "তিনি সমস্ত মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিকারী, আরশের অধিপতি, তিনি তাঁর বান্দাদের মাঝে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় আদেশসহ ওহী প্রেরণ করেন, যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে"। (সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ১৫, পারা ২৪ ঃ রুকু-২) এই আয়াতে রূহ বলতে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। (يُلْقِى الرُّوْحُ) ইউলকির রূহ শব্দ দ্বারা এ কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

(৮) সূরা মুজাদালায় 'রূহ' শব্দটি একবার ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "তুমি পাবে না আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায়, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে ভালোবাসে, হোক না এই 'বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জ্ঞাতিগোত্র, তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান সুদৃঢ় করেছেন তাঁর পক্ষ হতে

রূহ দ্বারা; .....।" (সূরা মুজাদালা ঃ আয়াত ঃ ২২, পারা ২৬ ঃ রুকু-৩)। এই আয়াতে রূহ দ্বারা শক্তিশালী করেছেন কথাটির মর্ম দু'ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়।

(ক) রূহ অর্থ হেদায়েতের আলো, যদ্বারা অন্তর শক্তিশালী হয়। (খ) রূহ অর্থ জিব্রাঈল (আঃ), যিনি মুমিনদেরকে শক্তি যোগান দেন।

(৯) সূরা নাবাতে 'রূহ' শব্দটির ব্যবহার একবার লক্ষ্য করা যায়। এরশাদ হচ্ছে ঃ "সেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া অন্যেরা কথা বলবে না এবং সে যথার্থ বলবে।" (সূরা নাবা ঃ আয়াত ঃ ৩৮, পারা ৩০ ঃ রুকু-২)। এখানে রূহ বলতে সাধারণ রূহ, অথবা সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান ফেরেশতা, অথবা জিব্রাঈল (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা, কুরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে রূহ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(১০) সূরা ক্বাদরে 'রূহ' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে একবার। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "সে রজনীতে ফেরেশতা ও রূহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।" (সূরা ক্বাদর ঃ আয়াত-৪ ঃ পারা ৩০ ঃ রুকু-১)।

এই আয়াতে ব্যবহৃত "রূহ" শব্দটির অর্থ ও মর্ম দু'ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। (ক) কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে রূহ বলতে ঐ সকল পবিত্র সত্তা বা ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে, যাদের মর্যাদা ও শক্তি সর্বাপেক্ষা বেশি। (খ) আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে রূহ বলতে 'রূহুল আমিন' অর্থাৎ জিব্রাঈল (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। যেমনটি ৭৮ ঃ ৩৮ আয়াতে লক্ষ্য করা যায়।

(১১) সূরা ওয়াকিয়াতে 'রূহ' শব্দটির ব্যবহার একবার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখপূর্ণ উদ্যান।" (সূরা ওয়াকিয়া ঃ আয়াত ঃ ৮৯, পারা ২৭ ঃ রুকু-৩)। এই আয়াতে রূহ বলতে আরাম, শান্তি, সুখ ও সুখপূর্ণ পরিবেশকে বুঝানো হয়েছে।

(১২) সূরা ইউসুফে 'রূহ' শব্দটি দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তাঁর সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর আশীষ ও করুণা হতে তোমরা

নিরাশ হয়ো না, কেননা কাফির ছাড়া কেউই আল্লাহর আশীষ হতে নিরাশ হয় না।" (সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ঃ ৮৭, পারা ১৩ ঃ রুকু-১০)

এই আয়াতে রাউহিল্লাহ (رَّوْحِ اللّٰهِ) শব্দটি দু'বার এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে ঃ আল্লাহর আশীষ, করুণা, অনুগ্রহ ও দয়া।

(১৩) সূরা হিজ্‌র-এ 'রূহ' শব্দটির ব্যবহার মাত্র একবার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "যখন আমি একে সুঠাম করব এবং এতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা এর প্রতি সেজদাবনত হবে।" (সূরা হিজর ঃ আয়াত-২৯ ঃ পারা ১৪ ঃ রুকু-৩)। এই আয়াতে 'রূহ' বলতে প্রাণশক্তি বা আত্মাকে বুঝানো হয়েছে, অথবা আল্লাহর নির্দেশকে বুঝানো হয়েছে।

(১৪) সূরা মরিয়মে 'রূহ' শব্দটি মাত্র একবার এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "তারপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করবার জন্য সে পর্দা করল, তারপর আমি তার নিকট আমার রূহকে পাঠালাম, সে তাঁর নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।" (সূরা মরিয়ম ঃ আয়াত-১৭ ঃ পারা ১৯ ঃ রুকু-২)। এই আয়াতে 'রূহ' বলতে জিব্রাঈল (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে।

(১৫) সূরা আম্বিয়াতে 'রূহ' শব্দটি মাত্র একবার এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "সেই নারী যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল, তারপর আমি তার মাঝে আমার 'রূহ' ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন করেছিলাম।" (সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত—৯১ ঃ পারা ১৭ ঃ রুকু—৬)। এই আয়াতে রূহ শব্দের দ্বারা আল্লাহর নির্দেশ বা প্রাণশক্তি অথবা আত্মা অথবা হযরত ঈসা (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে।

(১৬) সূরা তাহরীমে 'রূহ' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে একবার। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "(আরো দৃষ্টান্ত হচ্ছে) ইমরান তনয়া মরিয়মের যে তাঁর সতীত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিল এবং সে ছিল অনুগতদের একজন।" (সূরা তাহরীম ঃ আয়াত—১২ ঃ পারা—২৮ ঃ রুকু—২)। এই আয়াতেও রূহ বলতে আত্মা, প্রাণশক্তি বা আল্লাহর নির্দেশকে বুঝানো হয়েছে।

(১৭) সূরা শোরাতে 'রূহ' শব্দটির ব্যবহার একবার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ, তুমি জানতে না কিতাব কী এবং ঈমান কী? অথচ একে আমি করেছি আলো, যার দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মাঝে যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করি, তুমি তো কেবল সরল পথ প্রদর্শন কর।" (সূরা শোরা ঃ আয়াত-৫২ ঃ পারা ২৫ ঃ রুকু-৫)। বস্তুতঃ রূহ শব্দ দ্বারা প্রাণ, আত্মা বুঝানো হয়। এখানে রূপক অর্থে অহী অথবা আল-কুরআনকে বুঝানো হয়েছে।

কেননা অহী এবং আল-কুরআন উভয়ই মানুষের অন্তর জগতকে জীবিত ও শক্তিশালী করে।

(১৮) সূরা সাজদাহতে 'রূহ' শব্দটি এসেছে একবার। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "পরে তিনি তাকে সুঠাম করেছেন এবং এতে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন তাঁর নিকট হতে এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (সূরা সাজদাহ ঃ আয়াত-৯ ঃ পারা-২১ ঃ রুকু-১)। এই আয়াতেও রূহ বলতে আত্মা, প্রাণ, আল্লাহর আদেশকে বুঝানো হয়েছে।

(১৯) সূরা সোয়াদ-এ 'রূহ' শব্দটির ব্যবহার একবারই লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "তারপর যখন আমি একে সুঠাম করব এবং এতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা এর প্রতি সিজদাবনত হবে।" (সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত-৭২ ঃ পারা-২৩ ঃ রুকু-৫)। এখানেও রূহ বলতে প্রাণ, আত্মা বা আল্লাহর আদেশকে বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেখুন একটু নজর করে

এ পর্যন্ত 'রূহ' শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে আল-কুরআনের যে সকল উদ্ধৃতি আমরা পেশ করেছি, এর প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকালে অবশ্যই আমাদের নজরে পড়বে যে, রূহ শব্দটিকে মহান রাব্বুল আলামীন দুভাবে তুলে ধরেছেন। যথা ঃ (ক) সম্বন্ধ পদ হিসেবে এবং (খ) সম্বন্ধ পদ ছাড়া এককভাবে। তবে সম্বন্ধ পদ হিসেবে রূহ শব্দটির ব্যবহার হয়েছে সর্বমোট ছয়বার। যেমন রূহী (رُوْحِیْ) আকারে দু'বার, সূরা হিজর এবং সূরা সোয়াদ-এ। আর রূহিহী (رُوْحِهٖ) আকারে একবার সূরা সাজদাহতে। আর রূহানা (رُوْحَنَا) আকারে তিনবার সূরা মরিয়ম, সূরা আম্বিয়া এবং সূরা তাহরীমে।

'রূহ' শব্দটি ইয়ায়ে মুতাকাল্লিম যোগে 'রূহী' হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'আমার রূহ'। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ "এবং এতে আমার রূহ সঞ্চার করব"। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, সূরা সোয়াদ এবং সূরা হিজর-এর রূহী (رُوْحِیْ) শব্দ সম্বলিত আয়াতের শব্দ ও বাক্য একই। এই উভয় স্থানে একই আয়াত সংস্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ সূরা হিজর এর ২৯নং আয়াত এবং সূরা সোয়াদ-এর ৭২ নং আয়াত একই।

আরো লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, সূরা সোয়াদ-এর ৭২ নং আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ "স্মরণ কর তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি কর্দম হতে।" এই কর্দম হতে সৃষ্ট মানুষকে সুষম করার পরই তিনি এতে 'রূহ' সঞ্চার করলেন।

অনুরূপভাবে সূরা হিজর-এর ২৯নং আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াত অর্থাৎ ২৮নং আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন ঃ "স্মরণ কর! যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বললেন, আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হতে মানুষ সৃষ্টি করেছি।" সুতরাং উভয় সূরাতে মানুষ সৃষ্টির প্রসঙ্গে 'রূহ' সঞ্চার করা বা ফুঁকে দেয়ার বিষয়টি জড়িত রয়েছে

বিধায় এই দু' স্থানে রূহ বলতে মানুষের রূহ, আত্মা বা প্রাণকে বুঝাই সমীচীন হবে।

আর রূহ শব্দের সাথে হা (ه) সর্বনাম যোগে রূহিহী (رُوْحِهٖ) সম্বন্ধ পদ গঠিত হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'তাঁর রূহ'। মোটকথা, আল্লাহ পাক মানুষকে সুঠামভাবে সৃষ্টি করার পর তাঁর নিকট হতে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। লক্ষ্য করলে এও দেখা যায় যে, সূরা সাজদাহ-এর রূহিহী (رُوْحِهٖ) শব্দ সম্বলিত ৯নং আয়াতের পূর্ববর্তী ৭নং ও ৮নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ "যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে উত্তমরূপে সৃজন করেছেন এবং কর্দম হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। তারপর বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পানির নির্যাস হতে।" তাই সূরা সাজদাহ-এর ৯নং আয়াতে বর্ণিত রূহ শব্দের অর্থ মানব প্রাণ বা মানবাত্মাকে গ্রহণ করাই শ্রেয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সম্বন্ধ পদ 'রূহানা' (رُوْحَنَا) আকারে রূহ শব্দটি আল্-কুরআনে তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। রূহানা শব্দের অর্থ হচ্ছে 'আমাদের রূহ' বা 'আমার রূহ'।

সূরা মরিয়মের ১৭নং আয়াতে আল্লাহ পাক 'আমি তার নিকট আমার রূহকে পাঠালাম' বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যার কাছে রূহকে পাঠানো হয়েছিল, তিনি হযরত মরিয়ম (আঃ)। আর যাকে পাঠানো হয়েছিল, তিনি হযরত জিব্রাঈল (আঃ)। কেননা সূরা মরিয়মের ১৭নং আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াত অর্থাৎ ১৬নং আয়াতে হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর নাম সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ "স্মরণ কর, এই কিতাবে উল্লিখিত মরিয়মের কথা, যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্বদিকে একস্থানে আশ্রয় নিল।" সুতরাং এখানে রূহানা (رُوْحَنَا) বলতে হযরত জিব্রাইল (আঃ)-কে বুঝতে হবে।

অনুরূপভাবে সূরা আম্বিয়ার ৯১ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, "তারপর তার মাঝে আমি আমার রূহ (رُوْحَنَا) ফুঁকে দিয়েছিলাম।" এই আয়াতেও 'রূহ' বলতে হযরত ঈসা (আঃ)-কে বুঝতে হবে। কেননা এখানে হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর সাথে তাঁর ছেলে ঈসা (আঃ)-এর কথাও খোলাখুলি উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এখানেও 'রূহানা' সম্বন্ধ পদের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আঃ)-কেই বুঝতে হবে।

ঠিক একইভাবে সূরা 'তাহরীমে' ব্যবহৃত 'রূহানা' (رُوْحَنَا) শব্দের দ্বারাও হযরত ঈসা (আঃ)-কে বুঝতে হবে। কেননা এই আয়াতে ইমরান তনয়া মরিয়মের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে এবং "তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম" বাণীর দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে।

আরো লক্ষ্য করা যায় যে, সম্বন্ধ পদ হিসেবে 'রূহুল কুদুস' (رُوْحُ الْقُدُسِ।) পবিত্র আত্মা শব্দদ্বয় সূরা বাকারাতে দু'বার, সূরা মায়িদাহতে একবার এবং সূরা নাহলে একবার এসেছে। সকল স্থানেই 'রূহুল কুদুস' বলতে হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে।

তাছাড়া সম্বন্ধ পদ হিসেবে রূহ শব্দটি 'রূহুল আমীন' (رُوْحُ الْاَمِيْنُ।) আকারে সূরা শোয়ারাতে ব্যবহৃত হয়েছে। 'রূহুল আমীন' অর্থ বিশ্বাসী আত্মা। এর দ্বারা হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কেই বুঝানো হয়েছে।

আরো একটি বিষয় খুবই লক্ষ্যণীয় যে, আল-কুরআনে 'রূহ ও মালাইকা' এবং 'মালাইকা ও রূহ' অর্থাৎ রূহ ও ফেরেশতামণ্ডলী এবং ফেরেশতামণ্ডলী ও রূহ এভাবে মালাইকা ও রূহ শব্দটি পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা কদর-এ মালাইকা ও রূহ অবতরণের কথা বলা আছে। আবার সূরা 'নাবাতে' রূহ ও ফেরেশতাগণের সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর কথা উল্লেখ আছে। এই দু' স্থানে রূহ বলতে অনেকে হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর কথা শনাক্ত করেছেন এবং কেউ সাধারণ রূহের কথাও উল্লেখ করেছেন।

সে যাই হোক, আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, 'হাকীকতে রূহে ইনসানী' অর্থাৎ 'মানব রূহের হাকীকত'। আমরা সার্বিকভাবে 'মানব রূহের হাকীকত'কে অনুধাবন করার প্রচেষ্টার পথেই এগিয়ে যাব। এর বাইরে 'রূহ' শব্দ দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে তা আমাদের বিশ্লেষণের বিষয় নয় বিধায় সকল ক্ষেত্রে আমরা 'রূহে ইনসানীর' পরিমণ্ডলেই বিচরণ করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ।

(وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ)

তৃতীয় অধ্যায়

রূহের অস্তিত্ব

রূহের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। রূহের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে চির ভাস্বর সত্যকে মিথ্যার বেড়াজালে আচ্ছন্ন করা। قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ অর্থাৎ বল, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত। এই কথা হতে রূহের অস্তিত্বকে অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। এ সম্পর্কে তফসীরে নূরুল কুরআনে হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম যা উল্লেখ করেছেন, তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি রূহের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

(ক) "মানবদেহে যে রূহ রয়েছে তা' চোখে দেখা যায় না, তবে সে বস্তুটির কারণেই আমরা জীবিত রয়েছি। যদি তা না থাকে তাহলে আমাদের মৃত্যু হয়। এ বস্তুটির নাম হলো রূহ। যতক্ষণ রূহ মানবদেহে বিদ্যমান থাকে ততক্ষণই মানুষের অস্তিত্ব বিরাজমান থাকে। যদিও মানুষের বিবেক বুদ্ধি রূহের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু তাই বলে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। দ্বিতীয়তঃ মানুষ যখন নিদ্রিত হয়, তখন তার শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি অকার্যকর হয়ে যায়। কিন্তু রূহানী শক্তি তখন বৃদ্ধি পায়। মানুষ তখন স্বপ্নে অনেক দৃশ্য দেখে এমনকি পারলৌকিক জীবনের অনেক বিষয় সম্পর্কেও অবগত হয়। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, দৈহিক শক্তি বেকার হওয়ার পর যে বস্তুটি মানুষকে পরজগতের দৃশ্য দেখায় তাহলো রূহ।

(খ) মহান আল্লাহ্ পাক আল্-কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ

অর্থাৎ "যারা আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করে তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না, কেননা, তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা জান না।" এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শহীদগণ জীবিত বরং চিরঞ্জীব। তাদের মৃত বলা বৈধ নয়। অথচ তাদের দেহ মৃত্যুবরণ করেছে। এর দ্বারা একথা

প্রমাণিত হয় যে, শুধু মানবদেহকে পূর্ণ মানুষ বলা যায় না। তার মধ্যে থাকে অন্য আর একটি বস্তু, তারই নাম রূহ।

(গ) এমনিভাবে একথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে, মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হয় এবং জান্নাত অথবা জাহান্নামে প্রেরণ করা হয়। অথচ এসব অবস্থায় মানবদেহ মৃতই থাকে। এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, দেহ ব্যতীত মানুষের আরো একটি পরিচয় আছে। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে রূহ দেখা যায় না, কিন্তু দেখা না যাওয়া তার অস্তিত্ব না থাকার প্রমাণ নয়। আমরা ইথার বা তরঙ্গকে দেখি না, এতদসত্ত্বেও তার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করি। এমনিভাবে আমরা ফেরেশতাগণকে দেখি না, কিন্তু ফেরেশতাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারি না। ঠিক এমনিভাবে মানবদেহে রূহ রয়েছে, অথচ আমরা তা দেখি না।

এ পর্যায়ে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক, আর তা হলো রূহের অবস্থান কোথায়? দেহ কাঠামোর কোন অংশে বা কেন্দ্রে রূহ অবস্থান করে? এ প্রশ্নের জবাবে তত্ত্বজ্ঞানীগণ এবং আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সর্বসম্মত অভিমত হলো এই যে, রূহ মানবদেহের সর্বত্র সমভাবে বিরাজমান থাকে। আল্লাহ পাকের নির্দেশ ঃ

(قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي)

অর্থাৎ "বল, রূহ আমার প্রতিপালকের নির্দেশ ঘটিত।" আল্লাহ পাকের নির্দেশ যার উপর পতিত হয় বা যার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তা ষোলো আনাভাবে সর্বত্রই সমভাবে প্রযোজ্য হয়। এই নির্দেশ থেকে ব্যক্তি, বস্তু বা জীবনের কোনো অংশ খালি থাকে না বা এর বাইরে অবস্থান করে না। তাই একথা সুস্পষ্ট বলা যায় যে, মানবদেহের প্রতিটি অংশে, প্রতিটি কোষে, প্রতিটি গ্রন্থিতে রূহ একইভাবে বিরাজমান থাকে। যে সকল অঙ্গ মানবদেহের জরুরি প্রয়োজন মিটায় যেমন হাত, পা, চোখ ইত্যাদি, এগুলোর একটি বা একাধিক অঙ্গ না থাকলে বা কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেলে রূহ আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক দেহের অন্যান্য অংশে অবস্থান করে। রক্ত সঞ্চালন, তাপ বা বাতাসের উপর, নিশ্বাস প্রশ্বাসের উপর রূহ নির্ভরশীল নয়। রূহ আল্লাহ পাকের আদেশ কোনো কিছুর উপর

নির্ভরশীল হতে পারে না বলেই রূহের অস্তিত্ব সত্য এবং সৃষ্ট বস্তুর বহু পূর্বেই রূহের অস্তিত্ব ছিল। ব্যক্তি বা বস্তু বা পদার্থের মাঝে রূহের বিস্ফুরণ হয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক। পরবর্তীতে আমরা রূহের বিস্ফুরণ ক্রিয়া সম্পর্কে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের সামনে যৎকিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে প্রয়াস পাব, ইনশা আল্লাহ।

রূহ এবং প্রবৃত্তি

রূহ বা আত্মা মানবদেহস্থিত একটি পৃথক অদৃশ্য বস্তু। মহান আল্লাহ পাক অদৃশ্যে বিশ্বাস করতে বলেছেন। রূহ দৃশ্যমান নয়, অথচ রূহ আছে একথা অবশ্যই আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে। মানব জীবন বলতে যা বুঝায়, তা সার্বিকভাবে রূহ কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে।

আর 'নাফস' শব্দ দ্বারা যদি আত্মা বুঝানো না হয়, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি রূহ থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র। প্রবৃত্তি রূহের কাজ করতে পারে না। রূহ মানুষকে কল্যাণকর কাজের দিকে অনুপ্রাণিত করে এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্য উপকারী পথ ও মতের অনুসারী হওয়ার জন্য আহ্বান জানায়। পরকালীন জিন্দেগীর মুক্তি ও নিষ্কৃতির দিক নির্দেশনা প্রকাশ করে রূহ। মহান আল্লাহ পাক কর্তৃক মনোনীত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগকৃত কর্মানুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত থাকা বা হওয়ার পথ উন্মুক্ত করে তোলে রূহ। রূহানী শক্তি থেকেই পবিত্র চরিত্র মাধুর্য, বিবেকবুদ্ধি, ধৈর্য, সহনশীলতা, দানশীলতা ও মানবতাসুলভ চারিত্রিক গুণাবলি অর্জিত হয়। রূহ পবিত্রতার প্রতীক। এজন্য পবিত্র জীবনের স্বর্ণোজ্জ্বল প্রভা দেহ ও কর্মে বিকশিত করে তোলার পেছনে রূহের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। পক্ষান্তরে নাফস বা প্রবৃত্তি মানুষকে দুনিয়ার জীবনের সুখ সম্পদের দিকে, যশ-মান-গৌরব ও পানাহারের দিকে, ভোগ-বিলাসে মত্ত হওয়ার দিকে, আরাম-আয়েশে বিভোর হওয়ার দিকে এবং পাপাচার ও কামাচারের দিকে আহ্বান জানায়। আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরোধিতা করার জন্য ক্ষেপিয়ে তোলে। এমনকি মনুষ্যত্বকে পশুত্বের স্তরে অবনমিত করার পথ খোলাসা করে তোলে। বস্তুতঃ প্রবৃত্তি শয়তানের দোসর। শয়তান আগুনের তৈরি। তার কাজই হলো আল্লাহর বিরোধিতা করা, বনী আদমকে বিপথগামী করা।

কাম-ক্রোধ লোভ-মোহে আচ্ছন্ন করে মানুষকে পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত করা। এই নাফস বা প্রবৃত্তির তিনটি রূপ আল-কুরআনে তুলে ধরা হয়েছে।

(ক) নাফসে আম্মারাহ বা কুপ্রবৃত্তি, (খ) নাফসে লাউয়্যামাহ বা অনুশোচনাকারী প্রবৃত্তি এবং (গ) নাফসে মুত্‌মায়িন্নাহ অর্থাৎ প্রশান্ত প্রবৃত্তি। নাফসে আম্মারাহ বা কুপ্রবৃত্তির কাজ হলো মন্দকাজের প্রতি ধাবিত করা। পাপ, অমঙ্গল, অকল্যাণ, অপবিত্রতা ও আল্লাহদ্রোহিতার পথে ধাবিত করে মানুষকে বিপথগামী করাই 'নাফসে আম্মারাহ'-এর একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

পাপাসক্ত মানুষ কখনো কখনো পাপের প্রতি ঘৃণাবোধ করে এবং পাপ ও অন্যায়ের জন্য অনুশোচনা করে, আফসোস করে। মনে মনে ভাবে আহা! পাপ কাজে লিপ্ত না হলে কতই না ভালো হতো, কী অন্যায়ই না আমি করে ফেলেছি, এমনটি করা আমার মোটেও উচিত হয়নি। এমনিতরো অনুতাপ ও শাসন-চেতনা মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠে। এই অবস্থাকেই 'নাফসে লাউয়্যামাহ' বলা হয়।

তারপর অনুশোচনা, অনুতাপ ও আফসোসের ঘাত-প্রতিঘাতে মনের মাঝে পাপের প্রতি তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি হয়। মনের গহিন কন্দর হতে পাপ-চিন্তা ধুয়ে-মুছে লীন হয়ে যায়। এভাবে পাপ-প্রবৃত্তির অবসান ঘটে ও মনের মাঝে পুণ্যাশ্রয়ী ভাবপ্রবণতা মুক্ত ও পবিত্রতার অঙ্গণে বিচরণ করে আল্লাহ্ পাকের সান্নিধ্য লাভের জন্য উতলা হয়ে উঠে। এই অবস্থাকেই 'নাফসে মুতমায়িন্না' বা প্রশান্ত চিত্ত বলে অভিহিত করা যায়।

মোটকথা, রূহ এবং নাফসের মাঝে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। রূহ নূর হতে উৎসারিত। আল্লাহ্ পাকের ফেরেশতাগণ নূরের তৈরি। সর্বদাই তারা আল্লাহ্ পাকের বাধ্য থাকে। অবাধ্যতার লেশমাত্রও তাদের মাঝে পরিলক্ষিত হয় না। তেমনিভাবে রূহও মানবদেহে অবস্থানকালে নূরানী পরিবেশ গঠনে তৎপর থাকে। আল্লাহ্ পাকের একান্ত বাধ্য হয়ে ফেরেশতা স্বভাবে নিজেকে বিভূষিত করতে চায় এবং নূরের রজ্জুকে ধারণ করে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য ও কুরবত (قُرْبَة) হাসিল করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।

রূহ এবং নাফসের পার্থক্য নির্দেশক একটি হাদীস খুবই গুরুত্ববহ। শরহে মোয়াত্তার ভূমিকায় হাফেজ ইবনুল বার (রাহঃ) এই হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, "আল্লাহ্ পাক স্বীয়

কুদরতে হযরত আদম (আঃ)-কে পয়দা করেছেন এবং তাঁর মধ্যে নাফস বা প্রবৃত্তি এবং রূহ আমানত রেখেছেন। তাই রূহানী শক্তি থেকেই পবিত্র চরিত্র, বিবেক-বুদ্ধি, ধৈর্য ও সহনশীলতা, বদান্যতা প্রভৃতি নৈতিক গুণাবলি অর্জিত হয়। কিন্তু নাফস বা প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য হলো পাপাচার, ব্যভিচার, ক্রোধ, অহংকার, লোভ ও মোহকে শক্তিশালী করা ও চারিত্রিক দুর্বলতার পথ খোলাসা করা।"

আমরা জানি, সৃষ্টজগতের প্রতিটি বস্তুরই পরিপুষ্টির জন্য খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন হয়। আহার্য, পানীয় ও বায়ুর দ্বারাই দেহ সতেজ হয়, শক্তিশালী হয় ও পুষ্টি লাভ করে। এ দ্বারা নাফস বা প্রবৃত্তি শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং রূহানী শক্তিকে নিজের আয়ত্তে রাখতে চায়। কিন্তু রূহের পরিপুষ্টি আহার্য, পানীয় ও বায়ুর দ্বারা সাধিত হয় না। রূহের খাদ্য ও পুরিপুষ্টির একমাত্র উপাদান হচ্ছে 'আল্লাহর জিকির' বা আল্লাহর স্মরণ। সুতরাং আল্লাহর জিকির বা স্মরণের মাধ্যমে রূহ যখন পরিপুষ্টি লাভ করে, তখন দৈহিক শক্তি বা প্রবৃত্তি তাকে অধীনস্ত করতে পারে না; বরং প্রবৃত্তি বা নাফস রূহের অধীনস্ত তাবেদার হিসেবে দেহের মাঝে অবস্থান করে।

একটু আলোর ঝলক

এ পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে এতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আল কুরআনের বিশটি সূরার বাইশটি আয়াতে মোট চব্বিশবার 'রূহ' শব্দটি এসেছে। প্রেক্ষাপট, পরিবেশ, পূর্বাপর সম্পর্ক ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে রূহ শব্দটির অর্থ ও মর্ম ভিন্ন ভিন্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, এসকল বিস্তৃত আলোচনার সংক্ষিপ্ত সার বা সারাংশ হচ্ছে এই যে, রূহ শব্দটির ব্যবহার আল কুরআনে পাঁচভাবে করা হয়েছে।

১। আল্লাহ পাক তৎসৃষ্ট রূহ ফুঁৎকার করে দিলেন। এই ফুঁৎকার কর্মটি তিনি এভাবে সমাধা করেছেন।

(ক) হযরত আদম (আঃ)-এর অভ্যন্তরে রূহ ফুঁৎকার করলেন এবং তার প্রাণ সঞ্চার করলেন (১৫ ঃ ২৯; ৩৮ ঃ ৭২; ৩২ ঃ ৯)

(খ) হযরত মরিয়মের মাঝে হযরত ঈসা (আঃ)-কে গর্ভে ধারণ করবার জন্য রূহ ফুঁৎকার করলেন। (২১ ঃ ৯১; ৩৬ ঃ ১২)। এখানে রূহ রীহ অর্থাৎ বায়ুতুল্য এবং এর অর্থ প্রাণবায়ু, জীবন বায়ু। এর সৃষ্টি কৌশল একমাত্র আল্লাহর হাতে ন্যস্ত।

২। আল-কুরআনের চারটি আয়াতে রূহ্ অর্থ 'আল্লাহর আমর' বা আদেশ কিংবা এই ব্যাপারের সাথে সম্পর্কিত এবং রূহ ও আমর উভয়ের অর্থ প্রসঙ্গে মতভেদ বিদ্যমান। যেমন, সূরা বনী ইসরাঈল (১৭ ঃ ৮৫)-এ উক্ত আছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً-

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তারা আপনাকে রূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। বলুন, রূহ আমার প্রভুর আমর বা আজ্ঞা বিশেষ (اَلرُّوْحِ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ) আপনাকে সে সম্বন্ধে অতি অল্পই জ্ঞান দান করা হয়েছে।

(খ) সূরা নাহল (১৬ ঃ ২)-এ উক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যার নিকট ইচ্ছা ফেরেশতাদেরকে তাঁর অনুজ্ঞারূপ রূহ (اَلرُّوْحُ مِنْ اَمْرِهٖ) অর্থাৎ ওহীসহ অবতীর্ণ করেন, যাতে তারা এই মর্মে সতর্ক করেন যে, "আমি ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই, সুতরাং আমাকেই ভয় কর।"

(গ) সূরা মুমিন (৪০ ঃ ১৫)-এ ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ রূহ অবতীর্ণ করেন (اَلرُّوْحُ مِنْ اَمْرِهٖ) তাঁর সৃষ্টজীবের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উপর, যাতে সে সতর্ক করতে পারে।

(ঘ) সূরা শুরা (৪২ ঃ ৫২)-তে ঘোষণা করা হয়েছে যে, "আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি (اَوْحَيْنَا رُوْحًا مِنْ اَمْرِنَا) তুমিও অবগত নও কিতাব কী, অথবা বিশ্বাস কী? পক্ষান্তরে, আমি একে আলোকস্বরূপ করেছি, যদ্বারা আমি আমার বান্দাদের মাঝে যাকে ইচ্ছা তাকে পথ প্রদর্শন করি।"

তবে, একথা সুবিদিত যে, আল-কুরআনের 'আমর' (اَمْرٌ) এবং মিন্ (مِنْ) শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যাই হোক না কেন পূর্বাপর প্রসঙ্গ রূহ শব্দটিকে প্রাসঙ্গিক করে এবং সম্পর্কিত করে। যেমন (ক) উদাহরণে জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত করে। (খ) উদাহরণে ফিরেশতা এবং সৃষ্ট জীবের সাথে সম্পর্কিত করে সতর্ক করবার জন্য। (গ) উদাহরণে

সৃষ্টজীবের সাথে সতর্কতার জন্য এবং (ঘ) উদাহরণে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জ্ঞান, ধর্মবিশ্বাস, আলো এবং পথ প্রদর্শনের জন্য। সুতরাং এই রূহ আল্লাহর তরফ হতে ভবিষদ্বাণী বহন কাজের জন্য বিশিষ্ট উপায়স্বরূপ। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্ঞানে, বিজ্ঞতায় এবং বোধ শক্তিতে আল্লাহর তেজে ও আলোকে পরিপূর্ণ ছিলেন।

৩। সূরা নিসা (৪ ঃ ১৭১)-তে হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর নিকট হতে আগত রূহ বলা হয়েছে।

৪। সূরা ক্বাদর (৯৭ ঃ ৪)-এ এবং সূরা নাবা (৭৮ ঃ ৩৮)-এ এবং সূরা মায়ারিজ (৭০ ঃ ৪)-এ আর্ রূহ (الرُّوحُ) বলতে ফিরেশতাদের সঙ্গী সহচরদের বুঝানো হয়েছে।"

৫। সূরা শোয়ারা (২৬ ঃ ১৯৩)-এ আর্ রূহ আল্ আমীন (الرُّوحُ الْأَمِينُ) বিশ্বাসী রূহ বলতে জিব্রাঈল ফিরেশতাকে বুঝানো হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ "তোমার (মোহাম্মদের) হৃদয়ে বিশ্বাসী রূহ কুরআন অবতীর্ণ করেছে।

৬। সূরা মারয়াম (১৯ ঃ ১৭)-এ ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ মরিয়মের নিকট আমাদের রূহ প্রেরণ করেন, তিনি তাঁর নিকট একজন সুঠাম মানবরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

৭। সূরা নাহল (১৬ ঃ ১০২)-তে বলা হয়েছে যে, "রূহুল কুদুস" পবিত্র আত্মা কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে বিশ্বাসীগণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য।

৮। সূরা বাকারা (২ ঃ ২৭) এবং ২৫৩ আয়াতে এবং সূরা মায়িদা (৫ ঃ ১১০) এতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে রূহুল কুদুস (الرُّوحُ الْقُدُسُ) দ্বারা সহায়তা করেন। নাম এবং কর্মের এই অন্তর্নিহিত সম্পর্ক দ্বারা সংবাদবহ ফিরেশতার পরিচয় সূচিত হয়। তিনি উপরোল্লিখিত চতুর্থ উদাহরণের রূহও হতে পারেন। তাই কুরআনে রূহ শব্দে নির্দিষ্টভাবে সকল স্থানে সাধারণ ফিরেশতাগণ, মানুষের ব্যক্তিসত্তা অথবা তার আত্মা অর্থ জ্ঞাপন করা হয়নি, এমনকি এই শব্দের বহুবচন 'আরওয়াহ' (أَرْوَاحٌ)-ও ব্যবহার করা হয়নি।

চতুর্থ অধ্যায়

গভীরভাবে একটু ভাবুন

কোনো বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসার পূর্বে ভাবনা-চিন্তা করা দরকার। নিজের জ্ঞানকে, মনকে ও অভিজ্ঞতাকে একত্র করে মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করলে কোনো না কোনো সুরাহার পথ অবশ্যই পাওয়া যায়। এ পর্যায়ে আমাদের ভাবনা হলো সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৫নং আয়াত يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا - সম্পর্কে। আসুন, এবার আমাদের ভাবনার বিষয়গুলোর দিকে তাকানো যাক। (ক) এই আয়াতের শানে নুযূল কী? (খ) এই আয়াতটি কোথায় নাযিল হয়েছিল, (গ) রূহ সম্পর্কে কারা প্রশ্ন করেছিল এবং তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল? (ঘ) এই আয়াতে 'রূহ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? (ঙ) প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কিত বিশ্লেষণ এবং (চ) মানবদেহে রূহ কখন আগমন করে।

১। শানে নুযূল

এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মদীনার লোক বসতিহীন এলাকা দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে খেজুর গাছের ডাল দ্বারা তৈরি একটি লাঠি ছিল। তিনি কয়েকজন ইহুদির নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। ইহুদিরা পরস্পর বলাবলি করছিল—মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিকে আগমন করছেন, তাঁকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। তাদের কয়েকজন নিষেধ করল। কিন্তু কয়েকজন ইহুদি প্রশ্ন করেই বসল। প্রশ্ন শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নিশ্চুপ রইলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম যে, হয়তো ওহী নাযিল হবে। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

يَسْـئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْـرِ رَبِّىْ وَمَـا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً ـ

(সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম)।

এছাড়া উল্লেখিত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

(ক) তিনি বলেছেন ঃ কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সঙ্গত অসঙ্গত নানা ধরনের প্রশ্ন করত, একবার তারা ধারণা করল যে, ইহুদিরা বিদ্বান লোক, অধিক জানে। তারা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের জ্ঞানও রাখে। তাই, তাদের নিকট হতে কিছু প্রশ্ন জেনে নেয়া দরকার। যেগুলো দ্বারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পরীক্ষা করা যেতে পারে। তদনুসারে কুরাইশরা কয়েকজন লোক ইহুদিদের নিকট প্রেরণ করে। ইহুদিরা শিখিয়ে দিল যে তোমরা তাঁকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। তারা শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্নই করল। (মুসনাদে আহমাদ)।

(খ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য এক আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যে প্রশ্ন করেছিল, তাতে একথাও ছিল যে, রূহকে কীভাবে শাস্তি দেয়া হয়? তখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কোনো আয়াত নাযিল হয়নি বিধায় তিনি তাৎক্ষণিক উত্তর দানে বিরত রইলেন। এরপর হযরত জিব্রাঈল (আঃ) রূহ সম্বলিত এই আয়াত নিয়ে অবতরণ করেন। قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ। (ইবনে কাসির)।

উল্লিখিত বর্ণনার আলোকে জানা যায় যে, প্রশ্নকারীরা ইহুদি ছিল অথবা মক্কার কাফের ছিল। তবে, সকল ক্ষেত্রেই এই প্রশ্নের সাথে ইহুদিদের যোগসাজশ অবিচ্ছিন্ন ছিল, তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। আসহাবে কাহফ, জুলকারনাইন এবং 'রূহ' সম্পর্কে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে সংক্ষিপ্ত বিবরণ বা ইঙ্গিত ছিল বলেই ইহুদি ও কাফের কুরাইশরা পরস্পর পরামর্শক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করেছিল।

২। এই আয়াতটি কোথায় নাযিল হয়েছিল

সূরা বানী ইসরাঈলের ৮৫নং আয়াতটি কোথায় নাযিল হয়েছিল এ সম্পর্কে দুটি অভিমত লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন তাফসীরকারগণ এ ব্যাপারে দুটি মন্তব্য করেছেন। বস্তুতঃ আল-কুরআনের সূরা ও আয়াতগুলো নুযূলের স্থান হিসেবে দু'ভাগে বিভক্ত। মাক্কী এবং মাদানী। হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ আয়াত ও সূরাগুলো হচ্ছে মাক্কী এবং হিজরতের পরে অবতীর্ণ আয়াত ও সূরাসমূহ হচ্ছে মাদানী। সূরা বনী ইসরাঈল ও এর ৮৫নং আয়াতের শানে নুযূলের স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে তাফসীরে মাজহারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সূরার ৮৫নং আয়াতটি মদীনায় নাযিল হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, ঘটনাটি ঘটেছিল মদীনায় এবং এই ঘটনার সময় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন। তিনি ছিলেন এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী; সুতরাং প্রশ্নটি মদীনার ইহুদিরা করেছিল, তা অনায়াসে বুঝা যায়। তাছাড়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সংকলিত হয়েছে এবং এর সনদ সূত্রও খুবই মজবুত ও প্রবল। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের সনদের তুলনায় হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সনদ অনেক প্রবল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রত্যক্ষদর্শী নন; বরং তিনি কারো নিকট হতে শ্রবণ করে উপরোল্লিখিত হাদীস সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং সূরা বনী ইসরাঈলের অধিকাংশ আয়াত মক্কী হলেও ৮৫নং আয়াতটি মাদানী এবং রূহ সংক্রান্ত প্রশ্নটি মদীনার ইহুদিরাই করেছিল। (সহীহ বুখারী ঃ তাফসীরে মাজহারী)।

পক্ষান্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে, প্রশ্ন করেছিল মক্কার কাফের কুরাইশরা। প্রশ্ন করার বিষয়টি তারা জেনে নিয়েছিল ইহুদি পণ্ডিতের নিকট থেকে। সূরা বনী ইসরাঈলের অধিকাংশ আয়াতই মাক্কী এবং এই সূরাটিও মাক্কী সূরার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং প্রশ্নটি মক্কার কাফের কুরাইশরা করেছিল। হযরত

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে নানাভাবে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করত। তারা একবার মনে করল যে, ইহুদিরা পণ্ডিত লোক। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সম্পর্কে তাদের জ্ঞান আছে। কাজেই তাদের নিকট হতে কিছু প্রশ্ন জেনে নেয়া দরকার। সেগুলোর দ্বারা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পরীক্ষা করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে কুরাইশরা কয়েকজন লোক ইহুদীদের নিকট প্রেরণ করল। তারা তাদেরকে শিখিয়ে দিল যে তোমরা 'রূহ' সম্পর্কে প্রশ্ন কর। (মুসনাদে আহমাদ ঃ তফসীরে ইবনে কাসীর)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে অপর একটি আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যে প্রশ্ন করেছিল তাতে এই বিষয়টিরও উল্লেখ ছিল যে, 'রূহ'কে কীভাবে আজাব দেয়া হয়? (ইবনে কাসীর)

হাফেজ ইবনে কাসীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, প্রশ্নটি মক্কায় করা হয়েছিল এবং সূরা বনী ইসরাঈলের অন্যান্য আয়াতের মতো ৮৫নং আয়াতটিও মাক্কী। তবে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণনার জবাবে বলেছেন যে, হয়তো এই আয়াতটি দু'বার নাযিল হয়েছে। একবার মক্কায় এবং দ্বিতীয়বার মদীনায়। আল-কুরআনের বহু আয়াত দু'বার নাযিল হওয়ার বিষয়টি একটি স্বীকৃত ব্যাপার।

৩। রূহ সম্পর্কে কারা প্রশ্ন করেছিল এবং প্রশ্নকারীদের উদ্দেশ্য কী ছিল

রূহ সম্পর্কে যারা প্রশ্ন করেছিল তাদের প্রকৃত পরিচয় আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় সবিস্তারে তুলে ধরেছি। প্রশ্নকারীরা হয় মক্কার কাফের কুরাইশ ছিল অথবা মদীনাবাসী ইহুদি ছিল। প্রশ্নকারী যে বা যারাই হোক না কেন, এ পর্যায়ে তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল তা বিশ্লেষণ করা জরুরি মনে করছি।

প্রশ্নকারীদের প্রশ্নে 'রূহ' শব্দটির উল্লেখ সুস্পষ্ট রয়েছে। এই 'রূহ' শব্দটি অভিধানে, বাক পদ্ধতিতে এবং আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা 'রূহ' শব্দটি আল-কুরআনে কতবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং কোন অর্থে হয়েছে, তার বিস্তৃত বর্ণনা পূর্ববর্তীতে উপস্থাপন করেছি এবং একই সাথে রূহ শব্দের প্রতিশব্দ

'নাফস' শব্দটির আল কুরআনের ব্যবহারিক দিকও উপস্থাপন করতে প্রয়াস পাব। সে যাই হোক, রূহ শব্দটির প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ হচ্ছে প্রাণ, আত্মা, যার দরুন জীবন কায়েম হয়েছে। যার অনুপস্থিতিতে মৃত্যু অবধারিত।

প্রশ্নকারীদের উদ্দেশ্য ছিল জৈব রূহ সম্পর্কে জানা এবং রূহের স্বরূপ অবগত হওয়া। মোটকথা, রূহ কী, মানবদেহে রূহ কীভাবে আগমন করে, কীভাবে এর দ্বারা মানুষ ও জীবজন্তু জীবিত হয়, তা জানার উদ্দেশ্যেই তারা প্রশ্ন করেছিল। কেননা, জৈব ও মানবীয় রূহের ব্যাপারটি এমন যে, একে জানার ও চেনার বিষয়ে প্রশ্ন সকলের মনেই উদয় হয় এজন্য তাফসীরে ইবনে কাসীর, ইবনে জারীর, বাহরে মুহীত, কুরতুবী, রূহুল মায়ানীর তাফসীরবিদগণ মানবীয় রূহের বিষয়টিই সাব্যস্ত করেছেন, এখানে জিব্রাঈল ফিরেশতা, আল-কুরআন, ওহী ইত্যাদি অর্থে রূহ শব্দটির ব্যবহার হয়নি বলাই সঙ্গত। ওহীর স্বরূপ, আল-কুরআনের স্বরূপ এবং জিব্রাইল ফিরেশতার স্বরূপ জানার আগ্রহ তখনো মক্কার কাফের ও মদীনার ইহুদিদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল না। এজন্যই জৈবিক রূহের বিষয়েই তাদের মাঝে জিজ্ঞাসার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস থেকেও জানা যায় যে, ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যে প্রশ্ন করেছিল, তাতে একথাও ছিল যে, রূহকে কীভাবে আজাব দেয়া হয়। এই আয়াতে রূহ বলতে যদি কুরআন, ফিরেশতা, জিব্রাঈল আমীন অথবা ঈসা (আঃ)-কে বুঝানো হয়, তাহলে ইহুদিদের আজাব সংক্রান্ত এই প্রশ্নকেও এদের প্রতি আরোপ করতে হবে। এটা কতখানি যুক্তিযুক্ত হবে তা একান্তই বিবেচনার বিষয়। মূলতঃ এই প্রশ্নের দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাতকে পরীক্ষা করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে রূহ সম্পর্কে তেমন কোনো বিস্তৃত বিবরণ নেই বিধায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল।

৪। এই আয়াতে রূহ বলতে কী বুঝানো হয়েছে

রূহ বলতে কী বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা যা বিশ্লেষণ করেছি, তা বুঝার জন্য যথেষ্ট বলে মনে করা হলেও

তাফসীরবিদদের বিশ্লেষণকে সামনে রেখে কিছু আলোচনা না করলে বিষয়টির সুষ্ঠু সমাধান হবে বলে মনে হয় না। আসুন, এবার এদিকে লক্ষ্য করা যাক।

(ক) তাফসীরকারগণ কোনো আয়াতের তাফসীর করার ক্ষেত্রে পূর্বাপর আয়াতসমূহের অর্থ ও মর্মকে সামনে রেখে এর বিশ্লেষণ করে থাকেন। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, 'রূহ' সম্পর্কেও প্রশ্ন সম্বলিত আয়াতটি সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৫নং আয়াত। এর পূর্ববর্তী ৮৪নং আয়াতে মানুষের রীতি অনুযায়ী কাজ করার কথা বলা হয়েছে। এর পূর্ববর্তী ৮৩নং আয়াতে মানুষকে নেয়ামত দান এবং মানুষের অহংকারের কথা বলা হয়েছে। তৎপূর্ববর্তী ৮২নং আয়াতে কুরআন নাযিলের কথা এসেছে। এই ৮২নং আয়াতে উল্লিখিত কুরআন প্রসঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করে কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন যে, ৮৫নং আয়াতে 'রূহ' শব্দ দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা ৮৫ নং আয়াতের পরবর্তী ৮৬নং আয়াতে ওহীর কথা বলা হয়েছে এবং ৮৮ ও ৮৯ নং আয়াতেও কুরআন প্রসঙ্গটি স্থান লাভ করেছে। তাই ৮৫নং আয়াতে 'রূহ' বলতে ওহী বা কুরআনকেই বুঝা সহজ ব্যাপার।

কিন্তু এই আয়াতের শানে নুযূল সম্বলিত সহীহ্ হাদীস হতে সুস্পষ্ট জানা যায় যে, এখানে প্রশ্নকারীরা 'জৈব রূহ' সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। ওহী বা কুরআন সম্পর্কে নয়। তবে, ওহী ও কুরআনকে 'রূহ' বলা আল-কুরআনের একটি নির্দিষ্ট পরিভাষা। সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৫ নং আয়াতে 'রূহ' শব্দটি পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি; বরং এর অর্থ জৈব 'রূহ'।

আবার কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন যে, এখানে রূহ্ বলতে জিব্রাঈল ফেরেশতা বা হযরত ঈসা (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। এই অভিমতও গ্রহণযোগ্য নয়। মূলতঃ প্রশ্নকারীরা জৈব 'রূহ' সম্পর্কেই প্রশ্ন করেছিল। তারা জানতে চেয়েছিল 'রূহ' কী? মানুষের শরীরে কীভাবে রূহের আগমন ঘটে। কীভাবে এর দ্বারা মানুষ ও জীবজন্তু জীবন লাভ করে।

৫। প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কিত বিশ্লেষণ

পরম কৌশলী ও বিজ্ঞানময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাবতীয় হেকমত ও প্রজ্ঞার মালিক। তিনি সৃষ্টজগতের সকল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের এমন সব নিখুঁত উদাহরণ স্থাপন করেছেন, যা মানবজ্ঞান বহির্ভূত ব্যাপার। চেষ্টা, সাধনা ও কসরত করে মানুষের পক্ষে আল্লাহ পাকের জ্ঞানসমূহের কূল কিনারায় পৌছা কিছুতেই সম্ভব নয়। এর অগণিত ও অজস্র নজীরের মাঝে একটি হচ্ছে সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৫নং আয়াতে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি ছিল ঃ

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

অর্থাৎ তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আর এর উত্তরে বলা হয়েছে,

قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّى وَمَا اُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا -

অর্থাৎ বলুন, রূহ আমার পালনকর্তার নির্দেশ ঘটিত এবং এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে।

ইহুদি বা কাফের কুরাইশদের প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে দেয়ার জন্য মহান রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, সহজ, সরল ও অত্যন্ত সাদাসিধাভাবে বলে দিন যে, "রূহ আমার প্রতিপালকের নির্দেশ ঘটিত।" কারণ যারা প্রশ্ন করেছে, তারা নিজেরাই জানে না, রূহ কী জিনিস এবং কেমন। এই ধরনের প্রশ্ন মূলতঃ ধৃষ্টতা, বোকামি ও মূর্খতার পরিচায়ক। এই ধরনের মূর্খদের প্রশ্নের জবাব সকল মানুষই কঠোর ও তীক্ষ্ণ ভাষায় দিয়ে থাকে। এখানে এমনটি করা হয়নি; বরং প্রশ্নকারীদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে এবং সহজভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, 'রূহ' আল্লাহ পাকের নির্দেশ ঘটিত ব্যাপার মাত্র। এই নির্দেশের গূঢ় মর্ম ও এর তাৎপর্য সম্পর্কে মহান রাব্বুল আলামীনই অবগত আছেন। আর এজন্যই আয়াতের শেষাংশে সুস্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, "তোমাদেরকে কম জ্ঞানই দান করা হয়েছে।" তাই এই কম জ্ঞান দ্বারা রূহের হাকিকত অনুধাবন করা যাবে না।

এই উত্তরের দ্বারা প্রশ্নকারীদের কিংবা অন্যান্যদের এই ভ্রান্ত ধারণারও অবসান ঘটানো হয়েছে যে, প্রশ্নকারীরা কিংবা অন্য কেউ এমন ধারণা হয়তো পোষণ করতে পারে যে, যিনি রাসূল, তিনি হয়তো মানব বহির্ভূত জ্ঞানের অধিকারী হবেন। মানুষের নাগালের বাইরে যে জ্ঞান সমুদ্র রয়েছে, রাসূল হয়তো সেই সমুদ্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারেন। এটা প্রশ্নকারীদের ভ্রান্ত ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, যে সকল প্রশ্ন ও আবদার নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়নের শর্তে করা হয়েছে, এগুলো মূলতঃ ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও ঈমান না আনার বেহুদা বাহানা ছাড়া কিছুই নয়। এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে মানুষ সাধারণতঃ রাগের বশবর্তী হয়ে কিংবা ক্রোধ প্রকাশ করে উত্তর দেয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যে উত্তর শিক্ষা দিয়েছেন তা কর্মের আদর্শ, সংস্কারকদের জন্য চিরস্মরণীয় ও প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছাড়া কিছুই নয়। তাদের প্রশ্নের উত্তরে তাদের হঠকারিতা, নির্বুদ্ধিতা ও বোকামির বিষয়টি তুলে ধরা হয়নি এবং তাদের হঠকারিতাপূর্ণ দুষ্টামিকেও প্রাধান্য দেয়া হয়নি। এমনকি তাদেরকে বিদ্রূপাত্মক বাক্যে আঘাতও করা হয়নি; বরং অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সকল ঐশী ক্ষমতার মালিক নন এবং সবকিছু করার বা ব্যক্ত করার সক্ষমতাও তাঁর নেই। সবকিছুর মালিক আল্লাহ্ পাক। রাসূলের কাজ শুধু আল্লাহ্ পাকের পয়গাম পৌঁছে দেয়া। মানুষ তাঁর রিসালাতকে মান্য করলে বা তদনুযায়ী আমল করলে ইহকালে ও পরকালে মুক্তি, নিষ্কৃতি লাভে সক্ষম হবে। অন্যথায় তার ইহকাল ও পরকাল উভয়ই বরবাদ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ পাক তাঁর রিসালাতকে সপ্রমাণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অনেক মুজিযা প্রদান করেছেন; কিন্তু সেগুলো আল্লাহ পাকের কুদরত ও ক্ষমতার দ্বারাই সাধিত হয়েছে। এক্ষেত্রে রাসূলের কোনোই হাত নেই। রাসূল কখনো আল্লাহ পাকের ক্ষমতার অধিকারী হন না। তিনি মূলতঃ মানবকুলে জন্মগ্রহণকারী একজন মানুষ। কাজেই মানবিক শক্তির বহির্ভূত কোনো কাজ বা অনুষ্ঠান যদি আল্লাহ পাক তাঁর দ্বারা সংঘটিত করেন, সেটা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা মাফিকই হয়। রাসূলের ইচ্ছায় হয় না। মুজিযা বিষয়টিকে রাসূলের অতি মানবিকরূপ হিসেবে কল্পনা করা বাতুলতা মাত্র।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, রূহ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে মহান রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই ঘোষণা জারি করার জন্য নির্দেশ করেছেন যে,

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ

অর্থাৎ বলে দিন ঃ রূহ আমার প্রতিপালকের নির্দেশ ঘটিত। এই জবাবের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ নানাবিধ উক্তি উপস্থাপন করেছেন। তন্মধ্যে কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহঃ) এর যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা খুবই স্পষ্ট, সহজবোধ্য ও অধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। তিনি বলেছেন ঃ এই জওয়াবে মহান আল্লাহ যা কিছু বলা জরুরি ছিল এবং যা কিছু সাধারণ লোকের পক্ষে অনুধাবন করা সহজসাধ্য ছিল, ঠিক ততটুকুই বলে দিয়েছেন। রূহের পরিপূর্ণ স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা সত্ত্বেও জওয়াবে সব কথা বলা হয়নি। কারণ তা অনুধাবন করা সাধারণ লোকের পক্ষে মোটেও সম্ভব ছিল না এবং এর প্রয়োজনও তাদের ছিল না। কারণ ঈমান ও আমলের পূর্ণতা রূহের হাকীকত বুঝার উপর নির্ভরশীল নয়। এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই নির্দেশ করা হয়েছে যে, সরাসরি আপনি বলে দিন যে, 'রূহ আমার প্রতিপালকের নির্দেশ ঘটিত।' কারণ রূহ অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থের মতো বস্তু বা বস্তুর নির্যাস, কিংবা কোনো উপাদানের সমন্বয়ে কিংবা জন্ম ও বংশ বিস্তারের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেনি; বরং রূহের আবির্ভাব ঘটেছে আল্লাহ পাকের আদেশ কুন (كُنْ)-এর দ্বারা। এই জওয়াবের মূল হেকমত হচ্ছে এই যে, রূহের হাকীকত সাধারণ বস্তুনিচয়ের দ্বারা অথবা এর মাপকাঠিতে পরখ করা যায় না বা বিশ্লেষণ করা যায় না। তাই, বস্তুময় এই দুনিয়ার বস্তুনির্ভর জ্ঞান দ্বারা রূহের স্বরূপ উদঘাটন করা মোটেই সম্ভব নয়। আর সম্ভব নয় বলেই, মানুষের পক্ষে বুঝার জন্য বা উপলব্ধি করার জন্য যতটুকু দরকার, ঠিক ততটুকুই উত্তরে বলে দেয়া হয়েছে, যা অতিরিক্ততার ছোঁয়াচ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। এতটুকু জ্ঞানই সাধারণ মানুষের জন্য যথেষ্ট; এর বেশি কিছুর চিন্তা বা কল্পনা করে বহু বিজ্ঞ ও দার্শনিক ব্যক্তিগণ হয়রান পেরেশান হয়েছে মাত্র। আসল লক্ষ্যে পৌঁছা তাদের পক্ষেও সম্ভব হয়নি।

৬। মানব দেহে রূহ কখন আগমণ করে এবং প্রকৃত রূহ ও জৈব রূহের সম্পর্ক

এ পর্যায়ে প্রকৃত রূহ যা আদেশ (কুন) (كُنْ)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং জৈব রূহ যা দেহ কাঠামো ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং উপাদানের সাথে

সংশ্লিষ্ট তার সম্পর্ক অনুধাবন করা একান্ত দরকার। মানুষের দেহ কাঠামো ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপাদানগুলো যখন পরিপূর্ণতা লাভ করে, তখন এর মাঝে এক প্রকার শক্তি কাজ করতে থাকে। বৃহত্তর কোনো এক শক্তির সংমিশ্রণ ছাড়া দেহ কাঠামো সঞ্জাত এই শক্তি থাকে নিষ্ক্রিয় ও অর্থহীন। এই নিষ্ক্রিয় ও অর্থহীন শক্তিকে জৈব রূহ বলা হয়।

আল-কুরআনে মহান রাব্বুল আলামীন মানব সৃষ্টির শেষ স্তর এবং রূহ ও জীবন সৃষ্টি করার বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান হতে। তারপর আমি একে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে, তারপর জমাট রক্তকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি পঞ্জরে, তারপর অস্থি পঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা, অবশেষে একে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান।"

(সূরা মুমিনুন ঃ আয়াত ১২-১৩-১৪ ঃ পারা-১৮ ঃ রুকু-১)।

এই আয়াতের "অবশেষে একে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে"

ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

কথার মাঝে আল্লাহ পাক স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, 'প্রকৃত রূহ' ফুঁৎকারের মাধ্যমে মানুষের একটা নতুন রূপ প্রদান করা হয়। কারণ মানব সৃষ্টির প্রথমোক্ত ছয়টি স্তর অর্থাৎ মাটির উপাদান, শুক্রবিন্দু, জমাট রক্ত পিণ্ড, অস্থি পঞ্জর, গোশতের আচ্ছাদন ইত্যাদি বস্তুজগতের বিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু সপ্তম স্তর হচ্ছে এক অন্য জগত। অর্থাৎ 'প্রকৃত রূহ' দেহে স্থানান্তরিত হওয়ার স্তর। এই স্তরে রূহ দেহে স্থানান্তরিত হলেই পরিপূর্ণ জীবন্ত মানুষের নতুন রূপ প্রকাশ পায়। উপরোক্ত আয়াতে 'অন্য ধরনের সৃষ্টি' (خَلْقًا آخَرَ) শব্দের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রহঃ), হযরত শা'বী (রহঃ), হযরত ইকরামা (রাঃ), হযরত দাহহাক (রাঃ), হযরত আবুল আলীয়া (রাঃ) প্রমুখ তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, এর অর্থ হলো 'রূহ সঞ্চার' করা। তাফসীরে মাজহারীতে আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহঃ) বলেছেন যে, সম্ভবতঃ এই রূহ বলতে 'জৈব রূহকে' বোঝানো হয়েছে। কেননা, এটা

বস্তুবাচক ও সূক্ষ্ম দেহবিশিষ্ট, যা জৈব দেহের সকল রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট থাকে। চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকরা একে রূহ বলেন। মানুষের দেহ কাঠামোর ছয়টি স্তরবিন্যাস ও সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টির পর এই জৈব রূহের উদ্ভব ঘটে এবং এই জৈব রূহ-ই আসল 'রূহকে ধারণ' করে পরিপূর্ণ এক নতুন সৃষ্টিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এইজন্য একে 'অতঃপর' (ثُمَّ) শব্দ সহযোগে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলমে আরওয়াহ (عَالَمُ الْأَرْوَاحِ) অর্থাৎ রূহ জগত থেকে প্রকৃত রূহকে এনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় কুদরতে কামেলার দ্বারা এই জৈব রূহের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেন। এর হেকমত ও বিশেষত্ব জানা মানুষের সাধ্যের বাইরে।

মহান রাব্বুল আলামীন এই প্রকৃত রূহকে মানব সৃষ্টির বহু পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং 'আলমে আরওয়াহ'-এর মাঝে এগুলোকে সংরক্ষণ করেছেন। অনাদিকালে মহান রাব্বুল আলামীন এ সকল প্রকৃত রূহকে সমবেত করে বলেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ)। উত্তরে সবাই সমস্বরে হাঁ (بَلٰى) বলে আল্লাহ পাকের রাবুবিয়াতকে স্বীকার করে নিয়েছিল। তবে, এই 'প্রকৃত রূহের' সম্পর্ক মানবদেহের সাথে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টির পর স্থাপিত হয়। আর এখানে রূহ সঞ্চার দ্বারা যদি 'জৈব রূহের' সাথে 'প্রকৃত রূহের' সম্পর্ক স্থাপন বোঝানো হয়, তাহলে এটাও সম্ভবপর। কেননা, মানব জীবন প্রকৃতপক্ষে এই প্রকৃত রূহের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং জৈব রূহের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপিত হলেই মানুষ জীবন্ত হয়ে উঠে এবং সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষকে মৃত বলে গণ্য করা হয়। এমনকি জৈব রূহ আর কাজ করতে পারে না।

* এ পর্যায়ে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের খেদমতে একটি বিষয় উপস্থাপন করা খুবই জরুরি মনে করছি। আর তা হলো—রূহ শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে আল্-কুরআনে 'নাফস' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ পাক রূহ শব্দকে ব্যবহার না করে কখনো কখনো নাফস শব্দ ব্যবহার করেছেন। আসুন এ সম্পর্কে জানা যাক।

পঞ্চম অধ্যায়

আল-কুরআনে 'নাফস' শব্দের ব্যবহার

আল্-কুরআনের বহু আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক 'নাফস' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তবে, অবস্থা ও পূর্বাপর সঙ্গতি অনুসারে এর অর্থ ভিন্ন ভিন্ন অনুধাবন করা যায়। যেমন রূহ, প্রাণ, ব্যক্তিসত্তা ইত্যাদি।

১। 'সূরা বাকারার ৪৮নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে 'নাফস' অর্থ ব্যক্তি বা সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "তোমরা সেই দিনের ভয় কর যেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না এবং কারো সুপারিশ স্বীকৃত হবে না এবং কারো নিকট হতে ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্যও পাবে না। (সূরা বাকারাহ্ ঃ আয়াত-৪৮ ঃ পারা-১ ঃ রুকু-৬)।

২। সূরা বাকারার ৭২ নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি একবার এসেছে। এখানেও নাফস শব্দটি ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ 'স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করছিলে, তোমরা যা গোপন রাখছিলে আল্লাহ্ তা ব্যক্ত করছিলেন।" (সূরা বাকারাহ্ ঃ আয়াত-৭২ ঃ পারা-১ ঃ রুকু-৯)।

৩। সূরা বাকারার ১২৩ নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি একবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং এখানেও নাফস শব্দটির দ্বারা ব্যক্তি বুঝানো হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ "এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না এবং কারো নিকট হতে কোনো ক্ষতিপূরণ গৃহিত হবে না এবং কোনো সুপারিশ কারো জন্য লাভজনক হবে না এবং কারো কোনো সাহায্যও পাবে না।"

(সূরা বাকারাহ্ ঃ আয়াত-১২৩ ঃ পারা-১ ঃ রুকু-১২)।

৪। 'নাফস' শব্দটি এই সূরার ১৩০নং আয়াতেও একবার এসেছে এবং এখানেও 'নাফস' শব্দটির দ্বারা ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ব্যতীত ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ

হতে আর কে বিমুখ হবে; পৃথিবীতে তাকে আমি মনোনীত করেছি, পরকালেও সে সৎকর্ম পরায়ণগণের অন্যতম।"

(সূরা বাকারাহ ঃ আয়াত-১৩০ ঃ পারা-১ ঃ রুকু-১৬)।

৫। সূরা বাকারার ২০৭ নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি একবার এসেছে। এখানে নাফস শব্দ দ্বারা আত্মা বা প্রাণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্মা বিক্রয় করে থাকে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।"

(সূরা বাকারাহ ঃ আয়াত-২০৭ ঃ পারা-২ ঃ রুকু-২৫)।

৬। সূরা বাকারার ২৩৩ নং আয়াতের মধ্যমাংশে 'নাফস' শব্দটি এসেছে। এখানে নাফস শব্দ দ্বারা ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে .... কাউকে তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেয়া হয় না .....।

(সূরা বাকারাহ ঃ আয়াত-২৩৩ ঃ পারা-২ ঃ রুকু-৩০)।

৭। সূরা বাকারার ২৮১ নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি একবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং এখানেও ব্যক্তি অর্থই প্রকাশ পেয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে, তারপর প্রত্যেককে তার কর্মের ফল পুরাপুরি প্রদান করা হবে। এবং তাদের প্রতি কোনোরূপ অন্যায় করা হবে না।"

(সূরা বাকারাহ ঃ আয়াত-২৮১ ঃ পারা-৩ ঃ রুকু-৩৮)।

৮। সূরা বাকারার ২৮৬নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি একবার ব্যবহৃত হয়েছে। এখানেও নাফস শব্দটি ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ আল্লাহ কারোও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত। সে ভালো যা উপার্জন করে তা তারই এবং সে মন্দ যা উপার্জন করে তাও তারই".....।

(সূরা বাকারাহ ঃ আয়াত- ২৮৬ ঃ পারা-৩ ঃ রুকু-৪০)।

৯। সূরা আলে ইমরানের ৩০নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি দু'বার এসেছে। এখানে প্রথম নাফস শব্দটি দ্বারা ব্যক্তি অর্থ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় নাফস শব্দটি দ্বারা আল্লাহ পাকের সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "যেদিন প্রত্যেকে সে যে ভালো কাজ করেছে এবং সে যে মন্দ কাজ করেছে তা বিদ্যমান পাবে, সেদিন সে তার ও উহার দূর

ব্যবধান কামনা করবে, আল্লাহ তাঁর নিজের সত্তা সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন, আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।"

(সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত-৩০ ঃ পারা-৩ ঃ রুকু-৩)।

১০। সূরা আলে ইমরানের ১৪৫নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি একবার এসেছে। এখানেও নাফস শব্দটির অর্থ হচ্ছে ব্যক্তি। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু এর মেয়াদ অবধারিত"........।

(সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত-১৪৫ ঃ পারা-৪ ঃ রুকু-১৫)।

১১। সূরা আলে ইমরানের ১৬১নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটির সন্ধান লাভ করা যায়। এখানে নাফস শব্দটির অর্থও ব্যক্তি। ইরশাদ হচ্ছে ঃ ..... "তারপর প্রত্যেককে, যা সে অর্জন করেছে, তা পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।"

(সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত-১৬১ ঃ পারা-৪ ঃ রুকু-১৭)।

১২। সূরা আলে ইমরানের ১৮৫নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এখানে নাফস শব্দটির অর্থ জীব, প্রাণী বা আত্মাসম্পন্ন বস্তু। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, কেয়ামতের দিন তোমাদের কর্মফল তোমাদেরকে পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে"......। (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত-১৮৫ ঃ পারা-৪ ঃ রুকু-১৯)।

১৩। সূরা নিসা-এর ১নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি লক্ষ্য করা যায়। এখানে নাফস শব্দটির অর্থ ব্যক্তি বা সত্তা। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নরনারী ছড়িয়ে দিয়েছেন"......।

(সূরা নিসা ঃ আয়াত-১ ঃ পারা-৪ ঃ রুকু-১)।

১৪। সূরা নিসা-এর ৮৪নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি একবার এসেছে। এখানে নাফস শব্দটির দ্বারা ব্যক্তি বুঝানো হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "সুতরাং আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর, তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্য দায়ী করা হবে এবং মুমিনগণকে উদ্বুদ্ধ কর" ....।

(সূরা নিসা ঃ আয়াত-৮৪ ঃ পারা-৫ ঃ রুকু-১১)।

১৫। সূরা নিসা-এর ১১০নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি একবার এসেছে। এখানে নাফস শব্দটির অর্থ ব্যক্তি বা সত্তা। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "কেউ কোনো মন্দ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করে পরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহকে সে পরম দয়ালু ক্ষমাশীল পাবে।" (সূরা নিসা ঃ আয়াত-১১০ ঃ পারা-৫ ঃ রুকু-১৬)।

১৬। সূরা নিসা-এর ১১১নং আয়াতে 'নাফস' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এখানেও এর দ্বারা ব্যক্তি বা সত্তাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "কেউ পাপ কাজ করলে তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

(সূরা নিসা ঃ আয়াত-১১১ ঃ পারা-৫ ঃ রুকু-১৬)।

১৭। সূরা মায়িদার ২৫নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি ব্যক্তি সত্তার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "সে (হযরত মূসা আঃ) বলল, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমার এবং আমার ভাই ছাড়া অপর কারো উপর আমার আধিপত্য নেই, সুতরাং আপনি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফায়সালা করে দিন।"

(সূরা মায়িদাহ ঃ আয়াত-২৫ ঃ পারা-৬ ঃ রুকু-৪)।

১৮। একই সূরার ৩০নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। এখানে নাফস শব্দের অর্থ হচ্ছে—মন, চিত্ত, কুপ্রবৃত্তি। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "তারপর তার চিত্ত ভ্রাতৃহত্যায় তাকে উত্তেজিত করল এবং সে (কাবিল) তাকে (হাবিলকে) হত্যা করল, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো।"

(সূরা মায়িদাহ ঃ আয়াত-৩০ ঃ পারা-৬ ঃ রুকু-৫)।

১৯। এই সূরার ৩২নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি দু'বার এসেছে। এখানেও নাফস শব্দের অর্থ ব্যক্তিসত্তা। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "এই কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, দুনিয়াতে নরহত্যা অথবা দুনিয়াতে ধ্বংসাত্মক কাজ করা হেতু ছাড়া কেউ কাউকেও হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল.....।"

(সূরা মায়িদাহ ঃ আয়াত-৩২ ঃ পারা-৬ ঃ রুকু-৫)।

২০। একই সূরার ৪৫নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি দু'বার এসেছে। এখানে নাফস অর্থ হচ্ছে প্রাণ। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "আমি তাদের জন্য এই বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের

বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে অনুরূপ জখম.......।" (সূরা মায়িদা ঃ আয়াত-৪৫ ঃ পারা-৬ ঃ রুকু-৭)।

২১। একই সূরার ১১৬নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি দু'বার এসেছে। এখানে নাফস শব্দের অর্থ হচ্ছে অন্তর, মন, হৃদয়, চিত্ত ইত্যাদি। ইরশাদ হচ্ছে ঃ ...."সে বলবে, তুমিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই, তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়; যদি আমি তা বলতাম, তবে তুমি তো তা জানতে, আমার অন্তরের কথা তুমি অবগত আছ। কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নই, তুমি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।" (সূরা মায়িদাহ ঃ আয়াত-১১৬ ঃ পারা-৭ ঃ রুকু-১৬)।

২২। সূরা আন'য়ামের ১২নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি একবার এসেছে। এখানে নাফস শব্দের অর্থ হচ্ছে সত্তা, জাত। ইরশাদ হচ্ছে ঃ ...."দয়া করা তিনি (আল্লাহ) তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন......।"
(সূরা আন'য়াম ঃ আয়াত-১২ এর মধ্যাংশ ঃ পারা-৭ ঃ রুকু-২)।

২৩। সূরা আন'য়ামের ৫৪নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি একবার এসেছে। এখানেও নাফস শব্দটির অর্থ ১২নং আয়াতের অর্থের অনুরূপ। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "যারা আমার আয়াতে ঈমান আনে তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাদের তুমি বল,—তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন......।"
(সূরা আন'য়াম ঃ আয়াত-৫৪ ঃ পারা-৭ ঃ রুকু-৬)।

২৪। সূরা আন'য়ামের ৭০নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি একবার এসেছে। এখানে নাফস-এর অর্থ হচ্ছে সত্তা, ব্যক্তি। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে তুমি তাদের সঙ্গ বর্জন কর এবং ইহা দ্বারা তাদের উপদেশ দাও, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের দ্বারা ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ ছাড়া তার কোনো অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না ......।"
(সূরা আন'য়াম ঃ আয়াত-৭০ ঃ পারা-৭ ঃ রুকু-৮)।

২৫। এই সূরার ৯৮নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। এখানে নাফস শব্দটি ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য

রয়েছে দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন বাসস্থান.......।" (সূরা আন'য়াম ঃ আয়াত-৯৮ ঃ পারা-৭ ঃ রুকু-১২)।

২৬। একই সূরার ১০৪ নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্যই এসেছে; সুতরাং কেউ তা দেখলে উহা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হবে। আর কেউ না দেখলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে.....।" (সূরা আন'য়াম ঃ আয়াত-১০৪ ঃ পারা-৭ ঃ রুকু-১৩)। এখানে নাফস শব্দটি ব্যক্তি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

২৭। এই সূরার ১৫১নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ...... "আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করবে না ......।" (সূরা আন'য়াম ঃ আয়াত-১৫১ ঃ পারা-৮ ঃ রুকু-১৯)। এখানে নাফস শব্দটি ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২৮। একই সূরার ১৫২নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না........।" (সূরা আন'য়াম ঃ আয়াত-১৫২ ঃ পারা-৮ ঃ রুকু-১৯)। এখানেও নাফস শব্দটি ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২৯। এই সূরার ১৫৮ নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ .... "যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন আসবে, সেদিন তাদের ঈমান কাজে আসবে না........।" (সূরা আন'য়াম ঃ আয়াত-১৫৮ ঃ পারা-৮ ঃ রুকু-২০) এখানেও নাফস শব্দটি ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩০। এই সূরার ১৬৪নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "...... প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী, এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না.......।" (সূরা আন'য়াম ঃ আয়াত-১৬৪ ঃ পারা-৮ ঃ রুকু-২০)। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এখানেও নাফস শব্দটি ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩১। সূরা আ'রাফের ৪২নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না......।" (সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত-৪২ ঃ পারা-৮ ঃ রুকু-৫) এখানে নাফস শব্দটির অর্থ হচ্ছে ব্যক্তি।

৩২। এই সূরার ১৮৮নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "বল আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভালো-মন্দের উপরও আমার কোনো অধিকার নেই......।" (সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত-১৮৮ ঃ পারা-৯ ঃ রুকু-২৩)। এখানেও নাফস শব্দটি ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৩। এই সূরার ১৮৯নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "তিনিই তোমাদেরকে ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ......।" (সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত-১৮৯ ঃ পারা-৯ ঃ রুকু-২৪)। এখানেও নাফস শব্দটির অর্থ ব্যক্তি।

৩৪। এই সূরার ২০৫ নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে।" (সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত-২০৫ ঃ পারা-৯ ঃ রুকু-২৪)। এখানেও নাফস শব্দটি মন বা অন্তর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৫। সূরা তাওবাহ-এর ১২০নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ .... "তারা নিজেদের জীবনকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) তাঁর জীবন অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করে।" (সূরা তাওবাহ ঃ আয়াত-১২০ ঃ পারা-১১ ঃ রুকু-১৫)। এখানে নাফস শব্দটির অর্থ প্রাণ বা জীবন।

৩৬। সূরা ইউনুসের ১৫ নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ...... "বল, নিজ হতে তা বদলানো আমার কাজ নয়, আমার প্রতি যা ওহী হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি.....।" (সূরা ইউনুস ঃ আয়াত-১৫ ঃ পারা-১১ ঃ রুকু-২)। এখানে নাফস অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

৩৭। এই সূরার ৩০নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "সেদিন তাদের প্রত্যেকে তার পূর্ব কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত হবে।" (সূরা ইউনুস ঃ আয়াত-৩০ ঃ পারা-১১ ঃ রুকু-৩)। এখানে নাফস শব্দের দ্বারা ব্যক্তিসত্তাকে বুঝানো হয়েছে।

৩৮। এই সূরার ৪৯নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাছাড়া আমার নিজের

ভালো-মন্দের উপর আমার কোনো অধিকার নেই ......।" (সূরা ইউনুস ঃ আয়াত-৪৯ ঃ পারা-১১ ঃ রুকু-৫)। এখানেও নাফস শব্দের অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিসত্তা।

৩৯। এই সূরার ৫৪নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারীই পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা যদি তার হতো তবে প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী ব্যক্তিই মুক্তির বিনিময়ে তা দিয়ে দিত.......।" (সূরা ইউনুস ঃ আয়াত-৫৪ ঃ পারা-১১ ঃ রুকু-৬)। এখানেও নাফস অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

৪০। এই সূরার ১০০ নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "আল্লাহর হুকুম ছাড়া ঈমান আনা কারো সাধ্য নয়।" (সূরা ইউনুস ঃ আয়াত-১০০ ঃ পারা-১১ ঃ রুকু-১০)। এখানেও নাফস শব্দের অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

৪১। এই সূরার ১০৮নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটির ব্যবহার খুবই প্রণিধানযোগ্য। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "সুতরাং যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদের মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে।" (সূরা ইউনুস ঃ আয়াত-১০৮ ঃ পারা-১১ ঃ রুকু-১১)। এখানেও নাফস অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

৪২। সূরা হুদ-এর ১০৫নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি দেখা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "যখন সেদিন আসবে, তখন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না।" (সূরা হুদ ঃ আয়াত-১০৫ ঃ পারা-১২ ঃ রুকু-৯)। এই আয়াতেও নাফস শব্দটি ব্যক্তিসত্তা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪৩। সূরা ইউসুফের ২৬নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ ইউসুফ বলল, "সে-ই আমার হতে অসৎকর্ম কামনা করেছিল।" (সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত-২৬ ঃ পারা-১২ ঃ রুকু-৩)। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এখানেও নাফস অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

৪৪। এই সূরার ৩২নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ যুলায়খা বলল, "এ-ই সেই ছেলে যার সম্বন্ধে তোমরা আমাকে নিন্দা করেছ, আমিই তার হতে অসৎকর্ম কামনা করেছি, কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে।"(সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত-৩২ ঃ পারা-১২ ঃ রুকু-৪)।

৪৫। এই সূরার ৫২নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি দু'বার এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ (ক) রাজা রমণীগণকে বলল, "যখন তোমরা ইউসুফ হতে অসৎকর্ম কামনা করেছিলে তখন তোমাদের কি হয়েছিল?"

(খ) "আযীযের স্ত্রী বলল, এক্ষণে সত্য প্রকাশ হলো, আমিই তার হতে অসৎকর্ম কামনা করেছিলাম, সে তো সত্যবাদী।" (সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত-৫১ ঃ পারা-১২ ঃ রুকু-৭)। এই আয়াতসমূহেও নাফস শব্দটি ব্যক্তিসত্তা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪৬। এই সূরার ৫৩নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি দু'বার এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "সে (ইউসুফ) বলল, আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্মপ্রবণ।" (সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত-৫৩ ঃ পারা-১৩ ঃ রুকু-৭)। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এখানে প্রথম নাফস শব্দটি ব্যক্তিসত্তা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং দ্বিতীয় নাফস শব্দটি মন, প্রাণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪৭। এই সূরার ৬৮নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "ইয়াকুব কেবল তার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করেছিল এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল, কারণ আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম।" (সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত-৬৮ ঃ পারা-১৩ ঃ রুকু-৮)। এখানে নাফস অর্থ মন বা অন্তর।

৪৮। সূরা রায়াদ-এর ৩৩নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "তবে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে, তার যিনি পর্যবেক্ষক, তিনি তাদের অক্ষম উপাস্যদের মতো?" (সূরা রায়াদ ঃ আয়াত-৩৩ ঃ পারা-১৩ ঃ রুকু-৫)। এখানে নাফস অর্থ ব্যক্তি, মানুষ।

৪৯। সূরা রায়াদ-এর ৪২নং আয়াতেও নাফস শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে, তা তিনি জানেন।" (সূরা রায়াদ ঃ আয়াত-৪২ ঃ পারা-১৩ ঃ রুকু-৬)। এখানে নাফস শব্দের অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

৫০। সূরা ইবরাহীমের ৫১নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "আল্লাহ্ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন।" (সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত-৫১ ঃ পারা-১৩ ঃ রুকু-৭)। এখানে নাফস অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

৫১। সূরা নাহল-এর ১১১নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মসমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করতে আসবে এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণফল দেয়া হবে।" (সূরা নাহল ঃ আয়াত-১১১ ঃ পারা-১৪ ঃ রুকু-১৫)। এখানে নাফস শব্দের অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

৫২। সূরা বনী ইসরাঈলের ১৪নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত-১৪ ঃ পারা-১৫ ঃ রুকু-২)। এখানে নাফস অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

৫৩। এই সূরার ১৫নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "যারা সৎপথ অবলম্বন করবে, তারা তো নিজেদের মঙ্গলের জন্যই সৎপথ অবলম্বন করবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত-১৫ ঃ পারা-১৫ ঃ রুকু-২)। এখানেও নফস দ্বারা ব্যক্তি বুঝানো হয়েছে।

৫৪। এই সূরার ৩৩নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত-৩৩ ঃ পারা-১৫ ঃ রুকু-৪)। এখানেও নাফস অর্থ ব্যক্তি।

৫৫। সূরা কাহ্ফ-এর ৬নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে সম্ভবতঃ তাদের পেছনে ঘুরে তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে।" (সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত-৬ ঃ পারা-১৫ ঃ রুকু-১)। এখানে নাফস শব্দটির অর্থ আত্মা, প্রাণ।

৫৬। এই সূরার ২৮নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "তুমি নিজেকে ধৈর্য সহকারে তাদেরই সংসর্গে রাখবে, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে।" (সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত-২৮ ঃ পারা-১৫ ঃ রুকু-৫)। এখানেও নাফস অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিসত্তা।

৫৭। এই সূরার ৩৫নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "এভাবে নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল।" (সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত-৩৫ ঃ পারা-১৫ ঃ রুকু-৫)। এখানেও নাফস অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিসত্তা।

৫৮। এই সূরার ৭৪নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি দু'বার এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "(তখন মূসা) বলল, আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন, হত্যার অপরাধ ছাড়াই?" (সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত-৭৪ ঃ পারা-১৫ ঃ রুকু-১০)। এখানেও নাফস শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রাণ।

৫৯। সূরা ত্বাহা-এর ৪০নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "এবং তুমি (মূসা) এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল, তারপর আমি তোমাকে মনঃপীড়া হতে মুক্তি দেই।" (সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত-৪০ ঃ পারা-১৬ ঃ রুকু-২)। এখানেও নাফস অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

৬০। এই সূরার ৬৭নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "মূসা তাঁর অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করল।" (সূরা ত্বাহা ঃ আয়াত-৬৭ ঃ পারা-১৬ ঃ রুকু-৩)। এখানেও নাফস শব্দের অর্থ মন বা অন্তর।

৬১। সূরা আম্বিয়া-এর ৩৫নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।" (সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত-৩৫ ঃ পারা-১৭ ঃ রুকু-৩)। এখানে নাফস অর্থ প্রাণ, জীবনী শক্তি।

৬২। এই সূরার ৪৭নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "এবং কিয়ামত দিবসে আমি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারোও প্রতি কোন অবিচার করে হবে না।" (সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত-৪৭ ঃ পারা-১৭ ঃ রুকু-৪)। এখানেও নাফস অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

৬৩। সূরা মুমিনুনের ৬২নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না।" (সূরা মুমিনুন ঃ আয়াত-৬২ ঃ পারা-১৮ ঃ রুকু-৪)। এখানে নাফস অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

৬৪। সূরা ফুরকানের ৬৮নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করবে না।" (সূরা ফুরকান ঃ আয়াত-৬৮ ঃ পারা-১৯ ঃ রুকু-৬)। এখানে নাফস অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

৬৫। সূরা নামল-এর ৪০নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা নিজের কল্যাণের জন্যই করে।" (সূরা নামল ঃ আয়াত-৪০ ঃ পারা-১৯ ঃ রুকু-৩)। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এখানেও নাফস অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

৬৬। এই সূরার ৯২নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে, সে সৎপথ অনুসরণ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য।" (সূরা নামল ঃ আয়াত-৯২ ঃ পারা-২০ ঃ

রুকু-৭)। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এখানেও নাফস অর্থ ব্যক্তি সত্তাকে বুঝানো হয়েছে।

৬৭। সূরা কাসাস-এর ১৬নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "সে (মূসা) বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন।" (সূরা কাসাস ঃ আয়াত-১৬ ঃ পারা-২০ ঃ রুকু-২)। এখানেও নাফস অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

৬৮। এই সূরার ১৯নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "সে ব্যক্তি বলে উঠল মূসা! গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাচ্ছ?" (সূরা কাসাস ঃ আয়াত-১৯ ঃ পারা-২০ ঃ রুকু-২)। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, এখানেও নাফস অর্থ ব্যক্তি সত্তা।

৬৯। এই সূরার ৩৩নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাদের একজনকে হত্যা করেছি।" (সূরা কাসাস ঃ আয়াত-৩৩ ঃ পারা-২০ ঃ রুকু-৪)। এখানেও নাফস অর্থ ব্যক্তি।

৭০। সূরা আনকাবুতের ৬নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "যে কেউ সাধনা করে, সে তো নিজের জন্যই সাধনা করে।" (সূরা আনকাবুত ঃ আয়াত-৬ ঃ পারা-২০, রুকু-১১)। এখানে নাফস অর্থ ব্যক্তি সত্তা।

৭১। এই সূরায় ৫৭নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী, তারপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা আনকাবুত ঃ আয়াত-৫৭ ঃ পারা-২১ ঃ রুকু-৬)। এখানে নাফস অর্থ প্রাণধারী জীব।

৭২। সূরা লুকমানের ২৮নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটিমাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ।" (সূরা লুকমান ঃ আয়াত-২৮ ঃ পারা-২১ ঃ রুকু-৩)। এখানে নাফস অর্থ প্রাণী।

৭৩। এই সূরার ৩৪নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি দু'বার এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং

কেউ জানে না কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে।" (সূরা লুকমান ঃ আয়াত-৩৪ ঃ পারা-২১ ঃ রুকু-৪)। এখানেও নাফস অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

৭৪। সূরা সাজদাহ-এর ১৩নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম।" (সূরা সাজদাহ ঃ আয়াত-১৩ ঃ পারা-২১ ঃ রুকু-২)। এখানেও নাফস অর্থ ব্যক্তি।

৭৫। এই সূরার ১৭নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "কেউই জানেনা তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কী লুকায়িত রাখা হয়েছে।" (সূরা সাজদাহ ঃ আয়াত-১৭ ঃ পারা-২১ ঃ রুকু-২)। এখানেও নাফস অর্থ ব্যক্তি।

৭৬। সূরা আহযাবের ৩৭নং আয়াতে 'নাফস' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছ, আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন।" (সূরা আহযাব ঃ আয়াত-৩৭ ঃ পারা-২২ ঃ রুকু-৫)। এখানে নাফস অর্থ প্রাণ, মন বা অন্তর।

৭৭। এই সূরার ৫০নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "কোনো মুমিন নারী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিবাহ্ করতে চাইলে তা-ও বৈধ।" (সূরা আহযাব ঃ আয়াত-৫০ ঃ পারা-২২ ঃ রুকু-৬)। এখানে নাফস অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

৭৮। সূরা ফাতির-এর ৮নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "অতএব তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয়।" (সূরা ফাতির ঃ আয়াত-৮ ঃ পারা-২২ ঃ রুকু-২)। এখানে নাফস অর্থ প্রাণ বা আত্মা।

৭৯। এই সূরার ১৮নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "যে কেউ নিজেকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য।" (সূরা ফাতির ঃ আয়াত-১৮ ঃ পারা-২২ ঃ রুকু-৩)। এখানেও নাফস অর্থ প্রাণ, মন, অন্তর।

৮০। সূরা ইয়াসীনের ৫৪নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "আজ কারোও প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।" (সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত-৫৪ ঃ পারা-২৩ ঃ রুকু-৪)। এখানেও নাফস অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

৮১। সূরা সাফফাত-এর ১১৩নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "তাদের বংশধরদের মাঝে কিছু লোক সৎকর্মপরায়ণ এবং কিছু লোক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।" (সূরা সাফফাত ঃ আয়াত-১১৩ ঃ পারা-২৩ ঃ রুকু-৩)। এখানেও নাফস অর্থ প্রাণ, মন, সত্তা ইত্যাদি।

৮২। সূরা যুমার-এর ৬নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "তিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন।"(সূরা যুমার ঃ আয়াত-৬ ঃ পারা-২৩ ঃ রুকু-১)। এখানে নাফস অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

৮৩। সূরা যুমার-এর ৪১নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "তারপর যে সৎপথ অবলম্বন করে, সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য।" (সূরা যুমার ঃ আয়াত-৪১ ঃ পারা-২৪ ঃ রুকু-৪)। এখানে নাফস অর্থ ব্যক্তি সত্তা।

৮৪। এই সূরার ৫৬নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "যাতে কাউকেও বলতে না হয়, হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস!" (সূরা যুমার ঃ আয়াত-৫৬ ঃ পারা-২৪ ঃ রুকু-৬)। এখানেও নাফস অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

৮৫। এই সূরার ৭০নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে।" (সূরা যুমার ঃ আয়াত—৭০ ঃ পারা—২৪ ঃ রুকু—৭।) এখানেও নাফস অর্থ ব্যক্তি।

৮৬। সূরা মু'মিনের ১৭নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের জন্য প্রতিফল দেয়া হবে।" (সূরা মু'মিন ঃ আয়াত-১৭ ঃ পারা-২৪ ঃ রুকু-২)। এখানে নাফস অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

৮৭। সূরা হা-মীম-আস সাজদাহ-এর ৪৬নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "যে সৎকর্ম করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই করে।" (সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ ঃ আয়াত-৪৬ ঃ পারা-২৪ ঃ রুকু-৬)। এখানে নাফস অর্থ ব্যক্তি।

৮৮। সূরা জাছিয়া-এর ১৫নং আয়াতে 'নাফস' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "যে সৎকর্ম করে সে তার কল্যাণের জন্যই তা

করে।" (সূরা জাছিয়া ঃ আয়াত-১৬ ঃ পারা-২৫ ঃ রুকু-২)। এখানে নাফস অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

৮৯। এই সূরার ২২নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মানুযায়ী ফল পেতে পারে।" (সূরা জাছিয়া ঃ আয়াত-২২ ঃ পারা-২৫ ঃ রুকু-৩)। এখানেও নাফস অর্থ ব্যক্তি।

৯০। সূরা মুহাম্মদ-এর ৩৮নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "যারা কার্পণ্য করে, তারা তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই প্রতি।" (সূরা মুহাম্মদ ঃ আয়াত-৩৮ ঃ পারা-২৬ ঃ রুকু-৪)। এখানে নাফস অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

৯১। সূরা ক্বাফ-এর ১৬নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি।" (সূরা ক্বাফ ঃ আয়াত-১৬ ঃ পারা-২৬ ঃ রুকু-২)। এখানে নাফস অর্থ কুপ্রবৃত্তি।

৯২। এই সূরার ২১ নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে।" (সূরা ক্বাফ ঃ আয়াত-২১ ঃ পারা-২৬ ঃ রুকু-২১)। এখানে নাফস অর্থ ব্যক্তি।

৯৩। সূরা হাশর-এর ৯নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "যারা কার্পণ্য হতে নিজেকে মুক্ত করেছে, তারাই সফলকাম।" (সূরা হাশর ঃ আয়াত-৯ ঃ পারা-২৮ ঃ রুকু-১)। এখানে নাফস অর্থ ব্যক্তি মানুষ।

৯৪। এই সূরার ১৮নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য সে কি অগ্রীম পাঠিয়েছে।" (সূরা হাশর ঃ আয়াত-১৮ ঃ পারা-২৮ ঃ রুকু-৩)। এখানেও নাফস অর্থ ব্যক্তি, মানুষ।

৯৫। সূরা মুনাফিকুন-এর ১১নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "কিন্তু নির্ধারিতকাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ পাক কখনো কাউকে অবকাশ দেবেন না।" (সূরা মুনাফিকুন ঃ আয়াত-১১ ঃ পারা-২৮ ঃ রুকু-২)। এখানেও নাফস অর্থ ব্যক্তি।

৯৬। সূরা তাগাবুনের ১৬নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত তারাই সফলকাম।" (সূরা তাগাবুন ঃ আয়াত-১৬ ঃ পারা-২৮ ঃ রুকু-২)। এখানে নাফস অর্থ প্রাণ, অন্তর, হৃদয়।

৯৭। সূরা তালাক-এর ১নং আয়াতে 'নাফস' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "যে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে।" (সূরা তালাক ঃ আয়াত-১ ঃ পারা-২৮ ঃ রুকু-১)। এখানে নাফস অর্থ মন, প্রাণ, ব্যক্তিত্ব।

৯৮। এই সূরার ৭নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না।" (সূরা তালাক ঃ আয়াত-৭ ঃ পারা-২৮ ঃ রুকু-১)। এখানে নাফস অর্থ ব্যক্তি, শ্রেণি ইত্যাদি।

৯৯। সূরা মুদ্দাসসিরের ৩৮নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ।" (সূরা মুদ্দাসসির ঃ আয়াত-৩৮ ঃ পারা-২৯ ঃ রুকু-২)। এখানে নাফস অর্থ ব্যক্তি।

১০০। সূরা কিয়ামাহ-এর ২নং আয়াতে 'নাফস' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "আরও শপথ, তিরস্কারকারী আত্মার।" (সূরা কিয়ামাহ ঃ আয়াত-২ ঃ পারা-২৯ ঃ রুকু-১)। এখানে তিরস্কারকারী আত্মা বলতে জৈব রূহের দ্বিতীয় অবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছে। যার বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের মাঝে করা আছে।

১০১। এই সূরার ১৪নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্পর্কেই সম্যক অবগত।" (সূরা কিয়ামাহ ঃ আয়াত-১৪ ঃ পারা-২৯ ঃ রুকু-১)। এখানে নাফস অর্থ মন, অন্তর, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি।

১০২। সূরা নাযিয়াত-এর ৪০নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "এবং যে প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে।" (সূরা নাযিয়াত ঃ আয়াত-৪০ ঃ পারা-৩০ ঃ রুকু-১)। এখানে নাফস অর্থ প্রবৃত্তি, কুস্বভাব।

১০৩। সূরা তাকভীর-এর ১৪নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "যখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কী নিয়ে এসেছে।" (সূরা তাকভীর ঃ আয়াত-১৪ ঃ পারা-৩০ ঃ রুকু-১)। এখানে নাফস অর্থ ব্যক্তি।

১০৪। সূরা ইনফিতার-এর ৫নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "যখন প্রত্যেকে জানবে সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে।" (সূরা ইনফিতার ঃ আয়াত-৫ ঃ পারা-৩০ ঃ রুকু-১)। এখানেও নাফস অর্থ ব্যক্তি।

১০৫। এই সূরার ১৯নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "সেদিন একের অপরের জন্য কিছু করবার সামর্থ্য থাকবে না, এবং সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।" (সূরা ইনফিতার ঃ আয়াত-১৯ ঃ পারা-৩০ ঃ রুকু-১)। এখানেও নাফস অর্থ ব্যক্তি।

১০৬। সূরা তারিক-এর ৪নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "প্রত্যেক জীবের উপরই তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে।" (সূরা তারিক ঃ আয়াত-৪ ঃ পারা-৩০ ঃ রুকু-১)। এখানে নাফস অর্থ জীব, প্রাণী ইত্যাদি।

১০৭। সূরা ফাজর-এর ২৭নং আয়াতে 'নাফস' শব্দটি বিশ্লেষণসহ ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।" (সূরা ফাজর ঃ আয়াত-২৮, পারা-৩০, রুকু-১)। এখানে প্রশান্ত চিত্ত বলতে (নাফসে মুতমাইন্না) সেই চিত্তকে বুঝানো হয়েছে, যে চিত্ত আল্লাহর স্মরণেই শান্তি লাভ করে। (সূরা ফাজর ঃ আয়াত-২৭-২৮ ঃ পারা-৩০ ঃ রুকু-১)। এখানে আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন চিত্তকেই নাফসে মুতমায়িন্নাহ বলা হয়েছে।

১০৮। সূরা শামস-এর ৭নং আয়াতেও 'নাফস' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "শপথ মানুষের এবং তাঁর যিনি একে সুঠাম করেছেন।" (সূরা শামস ঃ আয়াত-৭ ঃ পারা-৩০ ঃ রুকু-১)। এখানে নাফস অর্থ ব্যক্তিসত্তা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এ পর্যন্ত আমরা রূহ ও নাফস সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি এর পরিপূরক হিসেবে ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর প্রশ্নোত্তর আকারে দেয়া হাকীকাতুর রূহ লেখনীর অনুবাদ সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাদেরকে উপহার দিতে প্রয়াস পাব। ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর বক্তব্যের মুফতী শাহ দ্বীন কর্তৃক উর্দু অনুবাদের বাংলা ভাষায় অনূদিত অংশই আমাদের বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এ পর্যায়ে সুধী মহল রূহ সম্পর্কে ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

উর্দূ অনুবাদকের ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মানবাত্মার স্বরূপ

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। যিনি জ্ঞান (১) দান করেছেন। এবং ধারণা ও অনুভবকারী ইন্দ্রিয়সমূহের অতীত যেসব বিষয় রয়েছে এবং যা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়, তা অনুধাবন করার নিমিত্ত আমাদের জন্য পথ করে দিয়েছেন। আর এ অন্তর দ্বারা যা ইন্দ্রিয় বহির্ভূত জগতে (আলমে মালাকুতে) বিচরণ করে, কঠিন এবং অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম বিষয় আবিষ্কার করার পন্থা শিখিয়েছেন। আমরা তার নিকট জ্ঞান ও অন্তরের আলো বর্ধিত করে দেয়ার জন্য এবং নাফসে আম্মারাকে মন্দ কাজে নির্দেশদাতা প্রবৃত্তিকে (২) নির্মূল করার জন্য মদদ চাচ্ছি। তাঁর নিকট আমরা আরও বাঞ্ছা করি তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর একনিষ্ঠ, তাওহীদবাদী মুখলেস লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আর তাঁর হাবীব মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুগামী হওয়ার

এবং তাঁর প্রতি মহব্বতের বরকতে পার্থিব বিষয়াদিতে ঝুঁকে পড়া থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। কেননা তিনিই রক্ষাকারী এবং সাহায্যকারী।

অতঃপর অধম মুফতী শাহ দ্বীন পিতা হযরত শায়খ মুহ্কামুদ্দীন, চক মুগলানবী, পরগনা মুকু, জেলা জলন্ধর—আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁর প্রতি এবং তাঁর আপনজনদের প্রতি প্রসন্ন থাকেন এবং সকল মুসলমানদের প্রতি রাজি থাকেন। এ অধমের তরীকতপন্থী সম্মানিত ব্যক্তি মহোদয়গণের নিকট বিনয় নিবেদন এই যে, অযাচিতভাবে একটি পুস্তিকা যা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রশ্নাবলির সমাধানে রচিত এবং যার প্রণেতা হলেন আলিম সমাজের শিরোমণি, হুজ্জাতুল ইসলাম মুহাম্মদ আবু হামীদ ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর রূহ এবং অন্যান্য যাবতীয় সৃষ্টির কঠিন প্রশ্নাবলির বর্ণনা সম্বলিত এ অধম-এর হাতে আসে। যখন তাতে দৃষ্টি দেয়া হলো, তখন এমন সব প্রশ্নাবলি তাতে দৃষ্টিগোচর হলো, যা অন্য কোনো আলিম বর্ণনা করেননি। এবং কোনো বিজ্ঞ লেখকের লেখনিতে প্রকাশিত হয়নি। যেহেতু পুস্তিকাটি আরবি ভাষায় লিখিত ছিল, আর সাধারণ মানুষের বুঝার বাইরে ছিল, এজন্য সকলের ফায়দাকে দৃষ্টিতে রেখে এ অধম পুস্তিকাটিকে উর্দু ভাষায় তরজমা করি। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে নবতর টীকা সংযোজন করে পুস্তিকাটির বক্তব্যাদি ব্যাখ্যা করেছি। আর হাদীসসমূহের কিতাবাদি অন্বেষণ করে হাদীসের সূত্রের বরাতগুলো পাদটীকায় লিখে দিয়েছি। আর আমি পুস্তিকাটির নামকরণ করেছি "হাকীকতে রূহে ইনসানী" অর্থাৎ 'মানবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ'। এখন যাঁরা বইটি পাঠ করবেন তাঁদের নিকট আশা রাখি যে, তাঁরা বইটি দ্বারা উপকৃত হলে এ অধমকে কল্যাণময় দোয়ায় স্মরণ করবেন। আর সকল বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গের সেবায় পরিপূর্ণ নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন আমাকে উত্তম দোয়া দ্বারা ধন্য করেন। একমাত্র আল্লাহরই নিকট কর্মসম্পাদনের তাওফীক দানের ব্যবস্থা রয়েছে। আর একমাত্র তাঁর উপরই একান্তভাবে ভরসা করছি।

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ۔

বশ্লেষণাত্মক পাদটীকা

১. আকল প্রসঙ্গ ঃ আকল (عَقْلٌ) জ্ঞান শব্দটি একাধিক অর্থবোধক। বিষয়গত বাস্তবতা জ্ঞাত হওয়ার সময় যে বিদ্যাগত গুণ বা বিশেষ বিশেষণ (صِفَتْ) প্রয়োগ করা হয়, যার অবস্থান অন্তরে (قَلْبٌ) তাকে জ্ঞান বা আকল (عَقْلٌ) বলে। আর অন্য অর্থে, আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহে, স্থূল সত্তা বহির্ভূত নিপুণ সূত্রের অনুভূতিকেও আকল (জ্ঞান) বলা হয়। যাকে 'লতীফায়ে রাব্বানী' (لَطِيفَةٌ رَبَّانِيٌّ) অর্থাৎ ঐশী শক্তি বলে। অর্থাৎ মানবাত্মার (رُوحٌ اِنْسَانِيْ) উপরও এই জ্ঞানের প্রয়োগ হয়। অনুরূপভাবে অন্তর (قَلْبٌ)-ও একাধিক অর্থবোধক শব্দ। মানুষের অন্তরকেও (قَلْبٌ اِنْسَانِيْ) অন্তর তথা 'ক্বালব' (قَلْبٌ) বলা হয়। যা হলো একটি মাংসপিণ্ড। যা ত্রিভুজ গোলাকার বস্তু। যা বক্ষদেশের বামপার্শ্বে অবস্থিত। যা দৈহিক শক্তির উৎস। অর্থাৎ যা জীব আত্মার (رُوحٌ حَيْوَانِيْ)-এর স্থূল। পক্ষান্তরে উল্লিখিত 'লতিফায়ে রাব্বানী' অর্থাৎ অনুভর্ব মানসিকতা বা (نَفْسِ نَاطِقَةٌ) বাকশক্তির উপরও 'অন্তর' তথা কালব (قَلْبٌ)-এর প্রয়োগ হয়। যার সম্পর্ক রয়েছে মানুষের অন্তরের (قَلْبٌ جِسْمَانِيْ) সাথে।

২. মন্দ কাজে নির্দেশকারী প্রবৃত্তিকে 'নাফসে আম্মারা' (نَفْسٌ اَمَّارَةٌ) বলে। মূলতঃ প্রবৃত্তি নাফস (نَفْسٌ) এবং রূহ (رُوحٌ) অনুভব মানসিকতা বা নাফসে নাতিকাকে (نَفْس نَاطِقَه) বলে—যখন তা এমন বিশেষ অবস্থায় উপনীত হয়, যখন উহা মন্দ চরিত্রের (اَخْلَاق ذَمِيْمَه) দ্বারা কলুষিত হয়, আর মন্দ খায়েশের অনুবর্তী হয়ে যায়। আর অনুভব মানসিকতা (نَفْس نَاطِقَه) মনের খাহেশের সাথে মোকাবিলা করার ফলে যখন উহার অস্থিরতার অবসান হয়, আর আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার প্রতি প্রশান্তি এসে যায়, তখন উহাকে প্রশান্ত প্রবৃত্তি বা

'নাফসে মুতমায়িন্না' (نَفْس مُطْمَئِنَّة) বলে। কিন্তু যদি উহার অস্থিরতা পূর্ণভাবে কেটে না যায়, কিন্তু উহা মন্দকাজে নির্দেশদাতা প্রবৃত্তির (نَفْس اَمَّارَة)-এর চাহিদা হটিয়ে দেয়ার অবস্থায় পড়ে তখন উহাকে ভর্ৎসনাকারী প্রবৃত্তি বা "নাফসে লাউয়্যামা" (نَفْس لَوَّامَة) বলে। মোটকথা আত্মাকেই উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয় নাফসে মুতমাইন্না, নফসে লাউয়্যামা, নফসে আম্মারা।

হাকীকতে রূহ গ্রন্থের সূচনা

আল্লাহর নামে শুরু এবং তাঁর হামদ আদায় করার পর মুহাম্মদ গাযযালীর পুত্র আবু হামিদ মুহাম্মদ ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন ঃ আমার নিকট প্রশ্নকারীরা কয়েকটি প্রশ্ন করে। যে সব প্রশ্ন উপযুক্ত পাত্রের জন্য শোভনীয়। আর অযোগ্যদের জন্য তা প্রকাশ না করাই বাঞ্ছনীয় ছিল। আমি যখন প্রশ্নকারীদের মাঝে পথপ্রাপ্তির লক্ষণ এবং অনুধাবন করার নিদর্শন দেখতে পেলাম, তখন তাদের আবদার গ্রহণ করলাম। আর আল্লাহ তায়ালার নিকট কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা দানের জন্য যাঞ্ছা করলাম। কেননা, তিনিই বান্দাদেরকে একত্রিত করে থাকেন এবং পুণ্যের পথ দেখান। আর বান্দাদের প্রতি করুণা করেন। অতএব প্রশ্নকারীগণ নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করলেন।

পরিপাটি রূপে সৃষ্টি করা এবং রূহ ফুঁকে দেয়ার প্রশ্ন

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ

অর্থ ঃ আমি যখন তাকে (আদমকে) পরিপাটি রূপে সুন্দর কাঠামো দান করব এবং তার মধ্যে আমার (সৃষ্ট) কোনো রূহ ফুঁকে দেব, তখনই তোমরা তার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে যাবে—(১৫ ঃ ২৯)। এ আয়াতে বর্ণিত 'সাওয়াইতুহু' (سَوَّيْتُهٗ) বাক্যের 'তাসবিয়া' (পরিপাটিকরণ) এর অর্থ কী? এবং রূহ ফুঁৎকারেরই বা স্বরূপ কী? .... এ প্রশ্নের উত্তরে ইমাম গাযযালী বলেন ঃ যে স্থান রূহ গ্রহণ করে তাতে প্রভাব

বিস্তার করাকে 'তাসবিয়া' (পরিপাটিকরণ) বলা হয়। আদমের জন্য তা হলো, স্বচ্ছ ও পরিপাটিত হওয়ার কারণে মাটি। আর তাঁর সন্তানদের জন্য শুক্র। এর কারণ হলো, নিছক শুষ্ক বস্তু হলেই তা আগুন গ্রহণ করে না। যেরূপ মাটি আর পাথর। আর নিছক কাঁচা, ভিজা বস্তুও আগুন গ্রহণ করে না। যেমন, পানি। বরং আগুন তো প্রজ্বলিত হয় কোনো যুগ্ম বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হলে। তাও আবার যে কোনো যুগ্ম বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হলে জ্বলে উঠে না। যেমন, কাদা। কাদায় আগুনের শিখা প্রজ্বলিত হয় না। বরং আগুন প্রজ্বলিত হওয়ার জন্য বিশেষ ধরনের সংমিশ্রণ প্রক্রিয়ায় গঠিত বস্তুর প্রয়োজন। আর বিশেষ ধরনের সে প্রক্রিয়া হলো এই ঃ .... অস্বচ্ছ স্থূল মাটিকে সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় নানা স্তরে বিবর্তিত করতে হবে। যার ফলে মাটির ওই স্থূলতা অস্বচ্ছতা, সূক্ষ্ম-নিপুণ সৃজনশীল আকার ধারণ করে। তখন উহাতে আগুন প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে। অনুরূপ, আল্লাহ তায়ালা মাটিকে পর্যায়ক্রমে একের পর একটি স্তরে বিবর্তিত করেন। তারপর উহা উৎপাদনশীল হয়ে উঠে। অতঃপর উহাকে মানুষে খায়। পরে তা রক্তে পরিণত হয়। তারপর উহা মিশ্রিত পরিবর্তনকারী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যা প্রতিটি জীবদেহে সংরক্ষিত হয়। ঐ রূপ পরিশোধিত রক্ত, যা সমন্বিত অবস্থার অতি নিকটবর্তী হয়, উহা হতে সংমিশ্রিত সঞ্চিত পরিবর্তনকারী শক্তি 'নির্যাস'কে আলগা করে ফেলে। তখন ঐ নির্ভেজাল রক্ত শুক্রে পরিণত হয়। এ শুক্র মহিলাদের বাচ্চাদানীতে (রেহেমে) স্থান পায়। তার সাথে যখন মহিলার শুক্র মিশ্রিত হয় তখন সমন্বয় প্রক্রিয়া আরও বেড়ে যায়। অতঃপর মহিলার জরায়ু তাকে স্বীয় উষ্ণতা দ্বারা পাকাতে থাকে। ফলে, তখন শুক্রে সমন্বয় সৃষ্টির সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পায়। পরিশেষে স্বচ্ছতা ও সমন্বয়তার পরস্পর সম্পর্কের মাত্রা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। অতঃপর উহা রূহ গ্রহন করার এবং রূহকে ধরে রাখার যোগ্য হয়। যেমন তেলে ভেজা সলতে আগুনের শিখা গ্রহণ করার এবং তা ধরে রাখার যোগ্যতা লাভ করে। আর শুক্র সমন্বয় ও স্বচ্ছতায় পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির পর রূহকে ধরে রাখা এবং রূহের তদারকি ও কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হয়। অতঃপর উহার প্রতি দানশীল আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে রূহের ফয়যান (আত্মিক ঐশী প্রবাহ) এর সূত্রপাত ঘটে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক উপযুক্ত প্রাপককে তার প্রাপ্য হক অনুসারে এবং প্রত্যেক যোগ্যতা লাভকারীকে তার যোগ্যতা মোতাবেক

অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না করে এবং কার্পণ্য প্রদর্শন না করে ঐশী অনুগ্রহ প্রদান করে থাকে। অতএব, 'তাসবিয়া' তথা পরিপাটিকরণ দ্বারা উক্তরূপ কর্মকাণ্ডকে বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ পাক শুক্রের মূল উপাদানকে নানা রকম বিবর্তনের দ্বারা স্বচ্ছতা ও সমন্বয়ের বিশেষ বিশেষণে উপনীত করে থাকেন।

রূহ ফুঁকার প্রশ্ন

অতঃপর প্রশ্নকারীরা রূহ ফুঁকার অর্থ জানতে চায়। ইমাম গাযযালী (রহঃ) উত্তরে বলেন ঃ 'নাফখ' (نَفْخٌ) তথা ফুঁকার অর্থ হলো, রূহের নূর (আলো) শুক্রের সলিতায় জ্বলে উঠা। ফুঁকার একটি আকৃতি আছে। আর তার একটি ফল আছে। ফুঁকার আকৃতি হলো, যে ফুঁকবে তার দিক থেকে যে বস্তুকে ফুঁক দেবে উহার দিকে হাওয়া বের হয়ে যাবে। যেমন যে কাষ্ঠ অগ্নি সংযোগের উপযোগী হলো তা জ্বলে উঠল। তাতে ফুঁক দেয়ার কারণে আগুন ধরে গেল। ফুঁক দেয়াটা আগুন ধরার কারণ হলো। এরূপ কারণের আকৃতি আল্লাহ তায়ালার সত্তায় অচিন্তনীয়। আর কারণের ফল প্রকাশ পাওয়া অচিন্তনীয় নয়। আর রূপক অর্থে কোনো সময় কারণ থেকে যে ক্রিয়া প্রকাশ পায় তা বুঝায়। যদিও ঐ ক্রিয়া যা ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয় উহার আকৃতিতে না হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন—(غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ) তিনি আরও বলেছেন ঃ তাই তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ক্রোধের আকৃতি হলো ক্রোধান্বিত ব্যক্তির মধ্যে এক প্রকার পরিবর্তন সূচিত হওয়া। যদ্দারা সে কষ্ট অনুভব করে। আর এর পরিণতিতে যার প্রতি ক্রোধান্বিত হয় তাকে কষ্ট দেয় বা মেরে ফেলে। তাই এখানে ক্রোধ দ্বারা ক্রোধের পরিণতি বুঝতে হবে। আর প্রতিশোধ দ্বারা প্রতিশোধের ফলাফল ধরে নেয়া হবে। অনুরূপ আলোচ্য বিষয়ে ফুঁকা দ্বারা ফুঁকের ফল বুঝাবে। যদিও এখানে ফুঁকার আকৃতি প্রকাশ না পায়। অতঃপর তারা প্রশ্ন করে, শুক্রের সলতেতে রূহের আলো প্রজ্বলিত হওয়ার কারণ কী? উত্তরে ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন ঃ এক বিশেষণ

(صِفَتْ) থাকে কর্তার মধ্যে। আর এক বিশেষণ (صِفَتْ) থাকে প্রভাব গ্রহণকারীর মধ্যে। তাই কর্তার মধ্যে যে গুণ বা বিশেষণ থাকে, আল্লাহর ব্যাপারে তা হলো তাঁর দানশীলতা। যিনি হচ্ছেন অস্তিত্বের মূল উৎস। এ মূল উৎস থেকে প্রতিটি গ্রহীতাকে অস্তিত্ব দান করা হয়। এ বিশেষণকে 'কুদরাত'ও বলা হয়। তার দৃষ্টান্ত হলো, যেমন সূর্যের আলো। অন্ধকার দূর করার সময় যে সব বস্তু সূর্যের আলোর সামনে থাকে তার উপর আলো পড়ে। আর তা থাকে কায়াবিশিষ্ট রঙিন বস্তু। তা বায়ু জাতীয় নয় যার কোনো কায়া রূপ নেই। আর গ্রহিতার গুণাবলির মধ্যে রয়েছে সমন্বয় সাধিত হওয়া, সুঠাম আকৃতির (وَسْتَوا - اِعْتِدَالْ) হওয়া। যা এখানে বুঝানো হচ্ছে। যা স্বচ্ছতা দ্বারা অর্জিত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ (سَوَّيْتُهُ) (যখন আমি তাকে পরিপাটি করে বানাব—)। আলো গ্রহিতার গুণের দৃষ্টান্ত হলো, মরিচা ধরা লোহা রেত ঘষামাজা করার ন্যায়। যখন কোনো আয়নায় মরিচা পড়ে যায়, তখন আয়না কোনো ছবি গ্রহণ করে না। যদিও ছবিটি আয়নার সামনেই রাখা হয়। যখন কারিগর ওটাকে ঘষামাজা করে পরিষ্কার করে দেয়, ওটা পরিষ্কার হওয়ার সাথে সাথেই ওটাতে ছবি প্রতিবিম্বিত হয়ে যায়। অনুরূপ, যখন শুক্রে স্বচ্ছতা ও সমন্বয় অর্জিত হয় তখন সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হতে উহাতে রূহ সৃষ্টি হয়ে যায়। এতে সৃষ্টিকর্তার মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন আসে না; বরং রূহ এখন পয়দা হয়েছে। পূর্বে পয়দা হয়নি। কেননা গ্রহীতা স্থানটি এখন এসে সমন্বিতাবস্থায় পৌছেছে। পূর্বে সমন্বিত হয়নি। যেরূপ আয়নাতে সম্মুখের বস্তুর ছবির প্রতিবিম্ব ধারণায় আসে। আর যার ছবি তার মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। আর আয়নাটি পরিমার্জিত করার পূর্বে যে প্রতিবিম্বিত ছবি দেখা যেত না, তার কারণ এটা নয় যে, আয়নাতে প্রতিবিম্বিত হওয়ার যোগ্যতা ছবির মধ্যে ছিল না। বস্তুতঃ আয়নাই পরিষ্কার ছিল না। যদি পরিষ্কার থাকত তাহলে ছবির প্রতিবিম্ব গ্রহণ করতে পারত।

ফয়েয কাকে বলে

অতঃপর আমাকে প্রশ্ন করা হলো, 'ফয়েয' বলতে কী বুঝায়? আমি উত্তরে বললাম ঃ ফয়েয (অর্থ প্রবাহিত হওয়া) দ্বারা এমন অর্থ বুঝায় না যেমন পানি পাত্র থেকে প্রবাহিত হয়ে হাতে পৌঁছে যায়। এরূপ বুঝা উচিত নয়। কেননা পানির ফয়যান (প্রবাহ) হলো, পানির অংশগুলো পাত্র হতে আলগ হয়ে হাতে এসে লেগে যাওয়া। বস্তুতঃ ফয়েয হলো সূর্যের কিরণের সদৃশ। যা প্রাচীর গাত্রে নিপতিত হয়। কেউ এই উপমা বুঝতে গিয়েও ভুল করেছেন। তারা বলছেন, সূর্যের কিরণ সূর্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাচীরের উপর ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুতঃ এটা তাদের ভুল। বরং সূর্যের কিরণ হতে প্রাচীর গাত্রে এমন কিছু সৃষ্টি হয় যা আলোর বিকিরণে সূর্যের কিরণের সদৃশ হয়। যদিও তা সূর্যের কিরণ অপেক্ষা দুর্বলই হয়। যেমন বস্তুর ছবির প্রতিবিম্ব যা আয়নায় প্রতিফলিত হয়, তার এরূপ অর্থ হয় না যে, বস্তুর অংশসমূহ তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আয়নায় এসে লেগে গেছে। বরং তার অর্থ দাঁড়ায়, মূল বস্তুর ছবির অনুরূপ প্রতিচ্ছবি তা থেকে এসে আয়নায় প্রকাশিত হয়েছে। মূল ছবির সাথে তা যুক্ত থাকে না। আর তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও আসে না। কেবল কার্যকারণের সম্পর্ক থাকে। অনুরূপ, যেসব বস্তুনিচয় অস্তিত্ব গ্রহণ করার যোগ্য হয় আল্লাহর কৃপা ও সবের মধ্যে অস্তিত্ব লাভের আলোকচ্ছটা সৃষ্টি হওয়ার কারণ ঘটায়। যাকে 'ফয়েয' বলা হয়।

বিশ্লেষণাত্মক পাদটীকা

৩. চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে, (عِلْم طِبّ) নির্ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ৭২ ঘন্টা পর তা থেকে শুক্র জন্ম নেয়।

৪. বিশেষ বিশেষণ (خَاصْ صِفَتْ) বলতে এখানে এমন গুণগত উৎকর্ষ সাধন করাকে বুঝানো হয়েছে, যা দ্বারা শুক্র রূহে প্রবাহিত হওয়ার যোগ্য হয়ে উঠে।

৫. 'রূহ' শব্দের প্রয়োগ একাধিক অর্থে হয়। মানব আত্মা (رُوْحٌ اِنْسَانِىٌّ)-এর উপর অর্থাৎ অনুভব মানসিকতা (نفس ناطقه)-এর অর্থে প্রয়োগ হয়। জীবাত্মা (رُوْحٌ حَيَوَانِىٌّ) প্রবৃত্তিক চেতনা (رُوْحٌ اِنْسَانِىٌّ) উদ্ভিদ প্রসূত চেতনা (رُوْح نَبَاتِىٌّ) কুরআন মজীদ, ওহী, বিরাটকায় ফিরেশতা, হযরত ঈসা, জিব্রাঈল ইত্যাদি অর্থে রূহের প্রয়োগ আসে। এখানে প্রথমোক্ত অর্থে অর্থাৎ 'নাফসে নতিকা' (نَفْسٌ نَاطِقَةٌ) অর্থে (অনুভব মানসিকতা) এসেছে। আর এ পুস্তিকায় এ অর্থেই রূহ শব্দের প্রয়োগ আলোচনার বিষয়বস্তু। অর্থাৎ 'রূহে ইনসানী' (رَوْحٌ اِنْسَانِىٌّ) মানবাত্মা বা 'নাফসে নতিকা' (نَفْسٌ نَاطِقَةٌ) অনুভব মানসিকতা সম্পন্ন রূহ আলোচনার বিষয়বস্তু। কেননা এটিই অনুভবকারী আত্মা। আর এটির পরিশুদ্ধির দ্বারা রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভের মর্যাদা অর্জিত হয়।

সপ্তম অধ্যায়

রূহ অনুচ্ছেদ

অতঃপর প্রশ্নকারীরা প্রশ্ন করল ঃ আপনি 'তাসবিয়া' (পরিপাটিকরণ) এবং 'নাফখ' রূহ ফুঁকার বিষয় উল্লেখ করেছেন। এখন 'রূহ'-এর তাত্ত্বিক দিকটিও বর্ণনা করে দিন। ৬. তা কি দেহে প্রবিষ্ট হয়ে আছে যেমন পানি পাত্রে প্রবিষ্ট হয়? অথবা তা কি স্বীয় অস্তিত্ব লাভে পরনির্ভর বস্তু? (عَرَضٌ) যা স্বনির্ভর বস্তুতে (جَوْهَرٌ) সন্নিবেশিত হয়? অথবা তা স্বঅস্তিত্বে বিরাজমান বস্তু (جَوْهَرٌ) যা নিজে থেকেই বিদ্যমান? যদি তা নিজে থেকে স্বীয় অস্তিত্বে বিদ্যমান বস্তু হয়, তাহলে তার অবস্থানের জন্য কোনো স্থান আছে কিনা? নাকি তা স্থানশূন্য বস্তু? তা যদি স্থানকে ঘিরে থাকার মতো বস্তু হয় তাহলে তার স্থান অন্তর (قَلْبٌ) মস্তিষ্ক (دِمَاغٌ) বা অন্য কোন স্থান? আর যদি স্থানশূন্য হয় এমতাবস্থায় অস্তিত্বে বিরাজমান বস্তু স্থানশূন্য কিরূপে হতে পারে?

আমি (ইমাম গাযযালী) বললাম, এটা তো রূহের রহস্য উদ্ঘাটনের সাথে সম্পৃক্ত প্রশ্ন। অপাত্রের সামনে বর্ণনা করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিষেধ করা হয়েছে। যদি তুমি (প্রশ্নকারী) উপযুক্ত পাত্র হয়ে থাক তাহলে শোন ঃ 'রূহ' পরনির্ভর কিছু নয় যা দেহে প্রবিষ্ট হয়ে থাকবে। যেমন কালো বস্তুর মধ্যে কালো রং প্রবিষ্ট হয়ে থাকে। আর বিদ্যা বিদ্বান ব্যক্তির মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে। কেননা রূহ তো স্বনির্ভর সত্তা রাখে। তা' 'জাওহার' স্বনির্ভর। রূহ তার সৃষ্টিকর্তা এবং নিজে নিজেকে চিনে। আর জ্ঞানলব্ধ বিষয়াদি অনুধাবনে সক্ষম। বস্তুতঃ 'আরয' (عَرَضٌ) তথা পরনির্ভর বস্তুর মধ্যে এরূপ গুণ থাকে না। আর রূহ অবয়ব বিশিষ্ট (Body) (جِسْمٌ) বস্তু-ও নয়। কারণ অবয়ববিশিষ্ট বস্তু (Body) বিভাজনযোগ্য হয়। আর রূহ বিভাজনযোগ্য নয়। যদি রূহ ভাগ করা যায় তাহলে যেমন ব্যক্তি রহিম জ্ঞান লাভ করবে একাংশ দ্বারা। আর অন্য অংশ দ্বারা অজ্ঞতা প্রকাশ পাবে। যাতে করে অবধারিত হয়ে যাবে যে, রূহ একই অবস্থায় কোনো কিছু জ্ঞাত হবে। আর তাতে তার

অজানা অজ্ঞাতও থেকে যাবে। আর এরূপ (বৈপরীত্য) মেনে নেয়া অবান্তর। আর অবিভাজ্য অণু যদি বাতিল করা না হয় আর কোনো বস্তু যদি অবিভাজ্য অণুনিচয়ের সমন্বয়ে একক অবিভাজ্য ধরে নেয়া হয় তখন উহার যে দিকটি আমাদের দৃষ্টিতে থাকবে উহার উল্টো দিকও থাকবে। যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে না। কেননা কোনো বস্তু একই অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হবে/হবেও না, এমন হতে পারে না। আর সূর্য যখন উহার সামনের দিকে থাকবে তখন যেদিকে সূর্য থাকবে সেদিকটাই আলোকিত হবে। বিপরীত দিকটি আলোকিত হবে না। ফলে, উহার যখন দু'টি দিক সাব্যস্ত হয়ে গেল, তখন অবিভাজ্য অণুর ধারণা বিদ্যমান থাকবে না এটাই স্বাভাবিক।

সাজুয্য অনুচ্ছেদ

তারপর আমাকে প্রশ্ন করা হয় ঃ রূহের স্বনির্ভর অস্তিত্ব বিশিষ্ট হওয়ার (جَوْهَرٌ) সারবত্তা কী? আর তার এ দেহের সাথে কী ধরনের সম্পর্ক রয়েছে? তা দেহের সাথে সম্পৃক্ত না আলাদা?

আমি উত্তরে বললাম ঃ রূহ কোনো স্থানে প্রবিষ্ট হওয়া কোনো অবয়বের (Body) সাথে একাত্ম হওয়া বা কোনো দিক নির্ণয় দ্বারা চিহ্নিত হওয়া থেকে ঊর্ধ্বে রয়েছে। কেননা, যাবতীয় এসব বিষয়ে দেহ এবং পরনির্ভর সত্তানিচয়ের (اَعْرَاضٌ) গুণাগুণ মাত্র। রূহ তো এরূপ পরনির্ভর বিষয়াদি থেকে পবিত্র। অতঃপর আমার নিকট প্রশ্ন করা হয় ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কেন রূহের রহস্য খুলে বলার অনুমতি প্রদান করা হয়নি? আমি উত্তরে বললাম ঃ সাধারণের জ্ঞান তা বুঝতে অক্ষম বিধায় এরূপ অনুমতি দেয়া হয়নি। কেননা, মানুষ দু'প্রকার ঃ সাধারণ ও বিশেষ শ্রেণি। যাদের মধ্যে সাধারণ গুণাগুণ প্রবল তারা এসব কথাকে মহান আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু-এর বেলায় ন্যায্য বলে অনুমোদন করে না। তারা মানব রূহের বেলায় তা কি আর অনুমোদন করবে? এজন্যই 'কাররামিয়া' এবং 'হাম্বলী' মতবাদের লোকেরা এসব অস্বীকার করে। অতএব যাদের মধ্যে সাধারণ মনোবৃত্তি অধিক তারা এসব কথা বুঝে না। তারা আল্লাহ তায়ালাকে দেহবিশিষ্ট সাব্যস্ত করে। কেননা কোনো বিদ্যমান বস্তুকে তো কায়াবিশিষ্ট, ইশারা করার যোগ্য না

হলে অনুধাবন করা যায় না। এসব সাধারণ লোকের মধ্যকার কোনো কোনো মানুষ কিছুটা উন্নত চিন্তার স্তরে উঠে আসে। তারা আল্লাহর দেহবিশিষ্ট হওয়াটাকে 'না' বলে দিয়েছেন। কিন্তু তারা দৈহিক বৈশিষ্ট্যাদিকে না বলতে পারেনি। তারা আল্লাহ তায়ালার জন্য দিকবিশিষ্ট হওয়াকে যা দৈহিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত সাব্যস্ত করেছে।

তাদের একাংশ আরও অগ্রসর হয়েছে। তারা আল্লাহ তায়ালাকে কোনো দিক বিশেষে নন বলেছে। আল্লাহকে স্থানশূন্য 'লা-মাকান' দিকবিহীন সত্তা 'লা-জিহত' সাব্যস্ত করেছেন। এরা হলেন আবুল হাসান আশয়ারী এবং 'মোতাজিলা' মতের অনুসারী।

প্রশ্নকারীরা আমাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করল ঃ এরূপ লোকালয়ে যারা কিছুটা উন্নত চিন্তার স্তরে উপনীত হয়েছে তাদেরকে রূহ-এর রহস্য অবগতি করা কেন জায়েয নয়?

আমি তাদেরকে বললাম ঃ তারা আল্লাহ তায়ালার এরূপ গুণাগুণকে আল্লাহ এবং অন্যদের মধ্যে (مُشْتَرِكٌ) সংযুক্ত হওয়াকে অচিন্তনীয় মনে করে। যদি তুমি তাদের সামনে এসব উল্লেখ কর, তাহলে তারা তোমাকে 'কাফির' সাব্যস্ত করবে। তারা বলবে, যে বিশেষণ আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট ছিল তাকে তুমি তোমার ব্যক্তিত্বের জন্য সাব্যস্ত করছ, তাই তুমি তোমার ব্যক্তিত্বকে 'খোদা' বলে দাবি করছ।

প্রশ্নকারী পুনরায় আমাকে প্রশ্ন করল ঃ তারা এরূপ বিশেষণকে মহান আল্লাহ এবং অন্যদের মধ্যে (مُشْتَرِكٌ) যুক্ত হওয়াকে অচিন্তনীয় কেন মনে করে?

আমি বললাম ঃ তারা দু'টি স্থানে উপবিষ্ট দু'টি বস্তুকে যেরূপ একস্থানে সন্নিহিত চিন্তা করাকে অচিন্তনীয় (مُحَالٌ) মনে করে, অনুরূপ দুটি বস্তুকে লা মোকামে (শূন্যস্থানে) একত্রিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে। কেননা, পার্থক্য না থাকার দরুন দুটি দেহের একই স্থানে সংস্থাপিত হওয়া অসম্ভব। এরূপ 'লা মাকানে' (শূন্যস্থানে) দু'টি বস্তুর অবস্থানও অসম্ভব। তেমনি যদি লা মাকানে (শূন্যস্থানে) দু'টি বস্তু একত্রিত হয়ে যায়, উভয়ের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য থাকবে না। এজন্য তাত্ত্বিকরা বলেন, দু'টি কালো রং একই স্থানে একত্রিত হতে পারে না। তারা দু'টি সদৃশ বস্তুকে পরস্পর বিপরীত বস্তু মনে করে।

প্রশ্নকারীরা পুনরায় আমাকে প্রশ্ন করল ঃ তাদের সংশয় তো শক্তিশালী মনে হয়। এর জবাব কী?

আমি বললাম ঃ এখানে তারা হোঁচট খেয়েছে। তারা ধারণা করেছে, বস্তুনিচয়ে তিনটি ব্যাপারে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। (১) দু'টি স্থান হলে। যেমন দুটি স্থানে দু'টি বস্তুর অবস্থান। (২) দুটি সময়কাল হলে। যেমন দুটি সময়ে দু'টি কালো রং একই বস্তুতে (جَوْهَر) একত্রিত হতে পারে। (৩) সারবত্তা ও তত্ত্বগত দ্বৈত থাকলে। যেমন পরনির্ভর বিষয়াদি (عَوَارِض) একই স্থানে একত্রিত হতে পারে। যেমন রং, স্বাদ, গন্ধ, ভেজা, কাঁচা ইত্যাদি একই বস্তুতে একত্রিত হতে পারে। কেননা, এসবের অবস্থান একই স্থানে হয়। আর একই সময়ে হতে পারে। অথচ সারবত্তা ও তত্ত্বগত দৃষ্টিতে বিভিন্নতা রয়েছে এসবের মধ্যে। তাই স্বাদ ও রঙের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তত্ত্বগত দিক দিয়ে। এখানে স্থান ও কাল দৃষ্টে পার্থক্য আসবে না। আর বিদ্যা (عِلْم) ও শক্তি (قُدْرَت) ও ইচ্ছা (اِرَادَة) এর তফাত হবে তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে। যদিও এসবই একই বস্তুতে থাকতে পারে। বস্তুতঃ এসবের মধ্যে স্থান ও কালের পার্থক্য হয় না। পার্থক্য হয় তত্ত্ব ও তথ্যগত। অতএব যখন বিভিন্ন তথ্যবিশিষ্ট পরনির্ভর বিষয় (عَوَارِض) এর একই স্থানে একত্রিত হওয়া সম্ভব, তাহলে তথ্য ও সারবত্তা দৃষ্টে যেসব বস্তু স্বতন্ত্র, তা 'লা-মাকানে' (শূন্যস্থানে) একত্রিত হওয়াটা তো সহজ ব্যাপার।

সংযুক্ত অনুচ্ছেদ

অতঃপর আমাকে প্রশ্ন করা হয় ঃ এখানে তো জটিলতা আরও বেড়ে গেল। আরও একটি যুক্তি বিষয়টি অসম্ভব হওয়ার পক্ষে স্পষ্ট হয়ে সামনে আসে। আর তা হলো এই, এখানে তো রূহকে আল্লাহর সদৃশকরণ করা হলো। আর রূহের জন্য আল্লাহ তায়ালার বিশিষ্টতর বিশেষণ সাব্যস্ত করা হলো।

আমি জবাব দিলাম ঃ এটা কীভাবে সম্ভব হবে? কেননা আমরা মানুষকে জীবিত বলি, বিদ্বান (عَالِم) বলি, শ্রবণকারী বলি, দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন মনে করি, শক্তিমান মনে করি, ইচ্ছাকারী মনে করি, বাকশক্তির

অধিকারী মনে করি। আর আল্লাহ তায়ালাকেও তাই মনে করি। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে কোনোরূপ গুণগত সদৃশতা নেই। কেননা, আল্লাহ তায়ালার এসব বিশিষ্ট গুণাবলি নয়। বরং আল্লাহ তায়ালার বিশিষ্ট গুণ হলো 'কায়্যুমিয়্যাত' (قَيُّومِيَّتْ) তথা নিয়ন্ত্রক। অর্থাৎ তিনি নিজ মহিমায়ই বিদ্যমান। আর তিনি ছাড়া যা কিছু আছে তা সবই অস্তিত্বমণ্ডিত তাঁরই দ্বারা। বরং বস্তুনিচয়ের তো স্বস্থানে অস্তিত্বহীন হওয়াই আসল কথা। ওগুলোর অস্তিত্ব তো অন্যের তরফ হতে ধার করা বস্তু মাত্র। পক্ষান্তরে, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব তাঁর নিজের সত্তাগত বিষয়। কোথাও থেকে ধার করা নয়। আর এক সর্বনিয়ন্তা গুণটি অন্য কিছুর মধ্যে পাওয়া যাবে না।

অতঃপর আমাকে প্রশ্ন করা হলো ঃ আপনি তো পরিপাটি করা (تَسْوِيَةٌ) এবং রূহ ফুঁকার বর্ণনা প্রদান করেছেন। রূহকে নিজের বলে আখ্যায়িত করার অর্থ তো বলেননি। আল্লাহ তায়ালা কেন আপন সত্তার প্রতি সম্বন্ধ স্থাপন করে "আমার রূহ" (مِنْ رُوْحِىْ) বলেছেন? যদি এর অর্থ করা হয় যে, 'রূহ'-এর অস্তিত্ব আল্লাহ হতে এসেছে, তাহলে তো যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্বই আল্লাহ হতে এসেছে। অথচ 'বাশর' (بَشَرٌ) তথা মানবকে মাটির বলে বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ আমি মাটি হতে মানব সৃষ্টি করতে চাই (اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ)। অতঃপর বলেছেন ঃ যখন আমি তাকে (মানুষকে) পরিপাটিরূপে সৃষ্টি করব আর তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দেব—

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ -

যদি এর অর্থ হয়, রূহ আল্লাহ তায়ালার অংশ যা তিনি মানুষের দেহে প্রবাহ করেছেন—যেমন দানশীল ব্যক্তি ভিক্ষুকের প্রতি তার সম্পদ প্রবাহিত করে দেয়ার পর বলে—(اَفَضْتُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِىْ)—আমি আমার মালের একাংশ তার প্রতি প্রবাহিত (فَيَضَانٌ) করে দিয়েছি। তাহলে তো এতে করে আল্লাহ তায়ালার জন্য বহু অংশ—অণু সাব্যস্ত হয়ে যায়। অথচ পূর্বে আপনি আল্লাহ তায়ালার জন্য একাধিক অংশ সাব্যস্ত করাকে বাতিল করে এসেছেন! বলেছেন ঃ (اَفَاضَ) 'ইফাযা'

তথা দান করার অর্থ অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নয়। অতএব, দান করা বা (اَفَاضَةٌ) তথা প্রবাহিত করার অর্থ কিরূপ হবে?

আমি উত্তরে বললাম ঃ যদি একথাটা সূর্য বলে ঃ

(اَفَضْتُ عَلَى الْاَرْضِ مِنْ نُوْرِىْ)

অর্থাৎ আমি যমিনের উপর আমার আলো থেকে প্রবাহিত করেছি—তাহলে কথাটি সত্য হবে। এখানে সম্বন্ধ করার অর্থ হবে, যে আলো মাটিতে পড়েছে তা কোনো না কোনো কারণে সূর্যের আলোর স্বগোত্রীয় হবে। যদিও সূর্যের মূল আলোর তুলনায় তা বহু দুর্বল হয়। আর তুমি জেনে নিয়েছ, রূহ দিক নির্ণয় এবং স্থান বিমুক্ত বিষয়। আর যাবতীয় বস্তুর জ্ঞান এবং খবর জানার শক্তি রূহের আছে। আর এরূপ সম্বন্ধগুলো দেহধারী বস্তুর মাঝে থাকে না। অতএব এরূপ সম্বন্ধ স্থাপনের কারণে আল্লাহ্ তায়ালা রূহকে তাঁর দিকে সম্বন্ধ স্থাপিত করেছেন। আর মিন রূহী (مِنْ رُّوحِىْ) আমার রূহ হতে—বলেছেন।

অতঃপর আমাকে প্রশ্ন করা হয় ঃ বল, আমার প্রতিপালকের নির্দেশের বস্তু (قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ) এর কী অর্থ দাঁড়াবে? আর 'আলমে আমর' নির্দেশ জগত (عَالَمُ اَمْرٌ) 'এবং আলমে খালক'—সৃষ্ট জগত—(عَالَمُ خَلْقٌ) বলতে কী বুঝায়?

উত্তরে আমি বললাম ঃ যে বস্তুর আয়তন এবং পরিমাণ করা যায় তা 'আলমে আজ্সাম্ (عَالَمُ اَجْسَامٌ) দেহজগত এবং পরনির্ভর জগত—(عَالَمُ عَوَارِضٌ)-এর বিষয়বস্তু। এটাকে 'আলমে খালক' (عَالَمُ خَلْقٌ) পরিমাপকৃত জগত বলে। আর এ বাক্যে 'খালক' (خَلْقٌ) অর্থ পরিমাপ করা, মাত্রা নির্ণয় করা (تَقْدِيْرٌ) নেয়া হয়েছে। অস্তিত্বদান এবং পয়দা করার অর্থে প্রয়োগ করা হয়নি। যেমন বলা হয় ঃ (خَلْقُ الشَّيْئِى اَىْ قَدَرَهٗ।)—বস্তুটি তিনি সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ বস্তুটির মাত্রা নির্ণয় করেছেন বা উহার অনুমান করেছেন। কবি বলেছেন ঃ

وَلَانْتَ تَفْرِىْ مَا خَلَقْتَ وَبَعْضُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ يَفْرِىْ

অর্থাৎ আর তুমি যা পুরাতন করনি তা ফেড়ে ফেল। আর কিছু লোক পুরাতন করবার পর তা ফাড়ে—। এখানে খালক শব্দকে ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। আর যে বস্তুর পরিমাপ ও পরিমাণ করা না যায় তাকে 'আমরী রাব্বি' (আল্লাহ তায়ালার বিষয়) বলা হয়। আর এরূপ বিষয়কে আমরী রাব্বানী (أَمْرٌ رَبَّانِيٌّ) খোদায়ী কর্তৃত্বের বিষয়বস্তু ও বর্ণিত সম্বন্ধাদির নিরিখে বলা হয়। আর যা কিছু এ জাতীয় হয়, চাই তা মানবাত্মা হোক বা ফিরিশতাদের আত্মা থেকে হোক, ওগুলোকে 'আলমি আমর' (عَالَمُ أَمْرٍ)-এর সম্পৃক্ত বিষয়াদি বলা হয়। অতএব আলমে আমর তথা নির্দেশ জগতের অন্তর্ভুক্ত ঐসব অস্তিত্ববান বস্তু বুঝাবে, যা বাহ্য ইন্দ্রিয় এবং ধারণা ও ষষ্ঠ দিগন্তের এবং স্থান ও আয়তনের আওতার বাইরে রয়েছে। আর তার কোনো পরিমাণ না থাকার দরুন তা আয়তন ও মাত্রা নির্ণয়ে অনুমানের আওতায় আসে না।

অতঃপর আমাকে প্রশ্ন করা হয় ঃ এ ব্যাখ্যা হতে তো রূহ অবিনশ্বর (قَدِيْمٌ) হওয়ার ভ্রমাত্মক ধারণা সৃষ্টি হয়। আমি উত্তর দিলাম ঃ এরূপ ধারণা একদল লোকের হয়েছে। এটা ওদের অজ্ঞতা। বস্তুতঃ রূহকে 'সৃষ্ট নয়' (غَيْرُ مَخْلُوقٍ) এজন্যে বলব যে, রূহের কোনো পরিমাপগত অবকাঠামো নেই। কেননা রূহ অবিভাজ্য। রূহ একাধিক অংশে গঠিত নয়। রূহ আয়তনে অবস্থান করে না। পক্ষান্তরে, সৃষ্ট হওয়ার (مَخْلُوقٍ) অর্থ যদি করা হয় নব সৃষ্টি (حَادِثٌ) যা পূর্বে ছিল না, পরে অস্তিত্ব লাভ করেছে, অন্তে থাকবে না, তাহলে রূহ সৃষ্টবস্তু মাখলুক। অবিনশ্বর (قَدِيْمٌ) (কাদিম) নয়। এ অর্থে রূহ অবিনশ্বর না হওয়ার প্রমাণ নাতিদীর্ঘ। আর তার ভিত্তিমূল (مُقَدِّمَاتٌ) অনেক। সঠিক কথা হলো, যখন শুক্রের ভেতর রূহকে গ্রহণ করার যোগ্যতা এসে যায়, তখন রূহ জন্ম নেয়। যেমন আয়নায় ঘষামাজা করার পর ছবি দেখা যায়। সংক্ষিপ্ত প্রমাণ হলো এই; মানবাত্মা যদি দেহের পূর্বেই বিদ্যমান থাকত, তখন তা একাধিক হতো বা অভিন্ন একটি রূহ হতো। দেহ সৃষ্টির পূর্বে বহু রূহের বা একক রূহের ধারণা তো অবান্তর। দেহের পূর্বে রূহসমূহের বিদ্যমান থাকাও অবান্তর। দেহের পূর্বে একক রূহের অবস্থান এজন্য অবান্তর যে, দেহসমূহের সাথে আত্মা সম্পৃক্ত হওয়ার পর হয়তো রূহের একক অস্তিত্ব

বজায় থাকবে, অথবা তা একাধিক হয়ে যাবে। একক অস্তিত্ব বজায় থাকা তো অসম্ভব ব্যাপার। কেননা, আমরা সুস্পষ্টভাবে জানি যে, করিম একটি বিষয় জানে। কিন্তু রহিম তা জানে না। যদি স্থিতিবান স্বয়ংসম্পন্ন বস্তু (جَوْهَرٌ) তাদের মধ্যে অভিন্ন থাকত অর্থাৎ উভয়ের রূহ যদি ওদের মধ্যে এক ও অভিন্ন থাকত, তখন পরস্পর বিরোধী দু'টি দিক তাদের মধ্যে একত্রিত হওয়া অসম্ভব হতো। তা যেমন করিমের বেলায় অসম্ভব হতো, অনুরূপ রহিমের বেলায়ও অসম্ভব হতো। অনুরূপ দেহের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পর রূহ অধিক হয়ে যাওয়াও অবাস্তব। কেননা, যা অবিভাজ্য, যার কোনো পরিমাপ নেই, তা দু'ভাগে বিভক্ত হওয়া বা বিভাজন গ্রহণ করা অবাস্তব। অবশ্য যার পরিমাপ রয়েছে তার দু'ভাগে বিভক্ত হওয়া অবাস্তব হবে না। আর বিভাজনও সম্ভব হবে না। যেমন, দেহ। একটি দেহ তার অবয়ববিশিষ্ট হওয়ার কারণে বিভক্ত হতে পারে। আর তার বহু অংশ বের হয়ে আসে। বস্তুতঃ যে বস্তুর বহুবিধ অংশ নেই যার পরিমাণ নেই, তা কী করে বিভাজন গ্রহণ করবে?

আর বহুবিধ দেহ সৃষ্টির পূর্বে রূহসমূহের আধিক্য এজন্য অবাস্তব যে, তারা হয়তো সদৃশ হবে, অথবা বিভিন্ন প্রকারের হবে। সদৃশ আর বিভিন্ন হওয়াটা অসম্ভব। আর একাধিক হওয়াও অসম্ভব। সদৃশ হওয়া এজন্যে অসম্ভব যে, মূলতঃ একাধিক সদৃশ বিদ্যমান থাকা সম্ভব নয়। এজন্যেই এক দেহে দুটি কালো রং এবং এক স্থানে দু'টি দেহের অবস্থান করা সম্ভবপর হয় না। কেননা, দু'টি হওয়াই পৃথক সত্তার দাবি রাখে। আর আলোচ্য বিষয়ে বিভিন্নতাই নেই। অবশ্য দু'টি কালো রং দু'টি দেহে সন্নিবেশিত হতে পারে। কেননা, এখানে বিভিন্নতার সৃষ্টি হবে দেহের বিভিন্নতার কারণে। কারণ একটি কালো রং একটি দেহের সাথে নির্দিষ্ট থাকবে। আর অন্য কালো রংটি অন্য দেহের সাথে লাগানো থাকবে। অনুরূপ দু'টি কালে দু'টি কালো রং একই দেহে জড়িত হতে পারবে। কেননা বিশেষ কালের সাথে একটি রং লাগা থাকবে। আর অন্য কালো রংটি পৃথক যমানায় ওই দেহেরই সাথে লাগা থাকায় বিশেষণ যুক্ত হবে, যা অন্যটির সাথে থাকবে না। অতএব দু'টি সদৃশের বিদ্যমান থাকাই অবাস্তব। যদি তার অস্তিত্ব দেখা যায়, তা কোনো কিছুর সাথে জড়িত হওয়ার সুবাদে দৃষ্টিগোচর হবে। যেমন বলা যাবে, করিম আর রহিম

উভয়ই মানুষ হওয়া এবং দেহবিশিষ্ট হওয়ার দিক দিয়ে সদৃশ। দোয়াত এবং কাকের কালো রং উভয়টি কালো হওয়ায় দৃষ্টিতে সদৃশ। আর দেহের অস্তিত্ব লাভের পূর্বে রূহগুলোর পৃথক পৃথক সত্তাধারী হওয়া এজন্যে অসম্ভব যে, স্বতন্ত্র হওয়াটি দু'প্রকার।

জাত ও সত্তাগত (مَاهِيَتْ) দিক দিয়ে স্বাতন্ত্র্যতা। যেমন, আগুন পানি, সাদা কালো, বিদ্যা ও মূর্খতার স্বাতন্ত্র্যতা। দ্বিতীয় প্রকার স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। অস্তিত্ব বিকাশে পরনির্ভর বিষয়াদির (عَوَارِضْ) ব্যাপারে। যা সত্তাগত নয়। যেমন, গরম ও ঠাণ্ডা পানির বিভিন্নতা। অতএব, মানবাত্মাসমূহে সত্তাগত বিভিন্নতা আসতে পারে না। কেননা মানবাত্মা একজাতীয় জিনিস। সত্তাগত উপাদানে (مَاهِيَتْ) অভিন্ন। আর পরনির্ভর বাহ্যিক বিষয়াদি দ্বারা মানব রূহে স্বাতন্ত্র্যতা সৃষ্টি হওয়াও সম্ভব নয়। কেননা মানবাত্মা একজাতীয় জিনিস। সত্তাগত উপাদানে (مَاهِيَتْ) অভিন্ন। আর পরিবর্তন বাহ্যিক বিষয়াদি দ্বারা মানব রূহে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হওয়াও সম্ভব নয়। যেমন কোলো সত্তাগত উপাদান (ماهيت) যখন দেহসমূহের সাথে সম্পর্কিত হয়। আর ওগুলোর দিকে কোলোরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে, তখনই বাহ্যিক বিষয়াদি দ্বারা عَوَارِضْ বিচিত্র আকার নেয়। কারণ দেহাবয়বের অংশসমূহে বিচিত্রতা অনিবার্য। যদিও আকাশের তুলনায় বৈচিত্র্যতা নিকট বা দূরবর্তী হয়। কিন্তু যখন কোলো সত্তাগত উপাদান (مَاهِيَتْ) দেহসমূহের সাথে এখনো সম্পৃক্তই হয়নি (যেহেতু ধরে নেয়া হয়েছে যে রূহের জন্য দেহের পূর্বে) তাতে বৈচিত্র্য আসা সম্ভবপর নয়। প্রশ্নটির চুলচেরা বিশ্লেষণ অধিক আলোচনার মুখাপেক্ষী। তবে যতটুকু বয়ান করা হলো, তা বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখার জন্য করা হলো।

অতঃপর আমাকে প্রশ্ন করা হয় ঃ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর রূহের অবস্থা কিরূপ ধারণ করবে? অথচ (তখন) দেহগুলোর সাথে রূহগুলোর সম্পর্ক থাকবে না। তাহলে কিরূপে রূহসমূহে আধিক্য ও বৈচিত্র্য এল?

আমি উত্তরে বললাম ঃ রূহগুলো দেহসমূহের সাথে (পূর্বে) সম্পৃক্তি থাকার কারণে বৈচিত্র্যময় গুণগুলো লাভ করেছে। যেমন বিদ্যা (علم)

এবং অজ্ঞতা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং আবিলতা। চারিত্রিক মাধুর্যতা এবং রুক্ষতা, রূঢ়তা। এরূপ বৈচিত্র্যের নানা দিকের সাথে সম্পৃক্ততার ফলে রূহগুলো স্বতন্ত্র থাকে। যদ্বারা রূহগুলোর আধিক্য প্রতিভাত হয়। দেহসমূহের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে রূহগুলোর এরূপ অবস্থা ছিল না। কেননা, ওসবের নানারূপ ধারণ করার কোনো কারণ ছিল না।

আল্লাহর সুরতে আদম কথার অর্থ

অতঃপর প্রশ্ন করা হল ঃ রাসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্তি ঃ আদমকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর আকারে পয়দা করেছেন—৮. (خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে ঃ দয়াময়ের আকারে (عَلٰى صُوْرَةِ الرَّحْمٰنِ) আদমকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। এরূপ উক্তির কী অর্থ দাঁড়ায়?

উত্তরে আমি বললাম ঃ সুরত (صُوْرَتٌ) অর্থাৎ 'আকার' বিশেষ্য পদটি একাধিক অর্থে আসে। কখনো বস্তুকুলের ক্রমানুসারে পরপর উহাদেরকে স্থাপন করার অর্থ বুঝায়। আর কোন বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে সন্নিবেশিত করা বা সংযুক্ত করার আকার বুঝায়। এটা তো চর্মচোখে অনুভব করা যায়। কখনো বিন্যস্ত বোধগম্য বিষয়াদির (مَعَانِىْ) জন্য শব্দটির প্রয়োগ আসে। আর বোধগম্য অর্থের মধ্যেও সম্পৃক্ত হওয়ার এবং পরস্পরে গ্রথিত হওয়ার সম্বন্ধ থাকে। যেমন বলা হয় ঃ মাসয়ালাটির ধরন হলো এই (مسئله كى صورت ايسى هى) আর ঘটনাটির স্বরূপ এই—। আর দেহবিদ্যার (عِلْمٌ جِسْمَانِى) প্রকার এই—। জ্ঞানলব্ধ বিদ্যার নমুনা এই। অতএব, আলোচনাধীন হাদীসটিতে বর্ণিত 'সুরত' (আকার) দ্বারা বোধগম্য নিরাকার অর্থ বুঝায়। এরূপ অর্থের মধ্যে রূহের উপরে বর্ণিত সম্বন্ধ সমূহের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। যাদের আল্লাহর সত্তা, তাঁর গুণাবলি এবং ক্রিয়াকলাপের প্রতি ফিরে যাওয়া এবং তা শেষ গন্তব্য হওয়ার বিশ্বাস আছে তাদের প্রতি ইশারা রয়েছে। কেননা, রূহের বাস্তব স্বরূপ হলো রূহ সত্তাগতভাবে পরনির্ভর বিষয় নয়। স্বনির্ভর এবং কোনো স্থানে অবস্থানকারী (مُتَحَيِّزٌ) নয়। দেহও নয়। রূহ কোনো দিকে আর স্থানে প্রবিষ্ট নয়। রূহ দেহের সাথে লাগাও নয়। দেহ

হতে আলগাও নয়। রূহ জগতস্থিত দেহরাজিতে, অবয়বে প্রবিষ্টও নয়, তা থেকে আলগাও নয়। অতএব এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য আল্লাহর সত্তার গুণাবলি। আর রূহের গুণাবলি হলো তা জীবিত (حَيٌّ) জ্ঞান সম্পন্ন (عَالِمٌ) শক্তিমান (قَادِرٌ) ইচ্ছা প্রয়োগকারী (مُرِيدٌ) উত্তম শ্রবণকারী (سَمِيعٌ) অবলোকনকারী (بَصِيرٌ) বাকশক্তির অধিকারী (مُتَكَلِّمٌ)। বস্তুত আল্লাহ্ তায়ালার মাঝেও অনুরূপ গুণাবলি রয়েছে। আর রূহের কার্যকলাপ (اَفْعَالٌ) হলো এই ঃ

কর্মের শুরুতে মানুষের মধ্যে ইচ্ছার (اِرَادَةٌ) উৎপত্তি হয়। যার প্রভাব প্রথমে অন্তরে বিকশিত হয়। অতঃপর জীবাত্মার সাহায্যে—যা হচ্ছে এক নিপুণ সূক্ষ্ম বায়ু বাষ্প—(بُخَارٌ) অন্তক্রমে প্রবিষ্ট হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়। ওখান থেকে শরীরের স্নায়ুতন্ত্রিতে বিস্তার লাভ করে। যা মস্তিষ্ক থেকে বহির্গত।

অতঃপর স্নায়ুতন্ত্র থেকে ধমনিতে এবং দেহের সংযোগসূত্রনালি শিরা উপশিরাসমূহে চলে যায়। যা মাংসপেশির সাথে যুক্ত। অতঃপর ওখান থেকে (মাংস কোষ থেকে) রগসূত্রে তা টেনে আনা হয়। তখন উহা থেকে আঙ্গুলসমূহ নড়াচড়া করে। আর যেমন আঙ্গুল দ্বারা কলম নড়াচড়া করে। কলম থেকে কালি এবং কালি হতে কাগজের পৃষ্ঠে যে আকৃতি অঙ্কিত করতে মনস্থ ছিল, তার আকৃতি হুবহু লিখার আকার ধারণ করে, যা ধারণার ভাণ্ডারে কল্পিত ছিল। কারণ যা লিখা হবে তার আকার যদি প্রথমে ধারণায় না আসে কাগজে তা লিখা সম্ভবপর হবে না।

যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার কার্যক্রম এবং সৃষ্টি করার প্রকৃতি চিন্তা করে দেখেছে, সে দেখতে পেয়েছে, উদ্ভিদ এবং জীবকুলকে আকাশ এবং গ্রহাদির নড়াচড়া দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আর আসমান এবং গ্রহাদিকে ফিরিশতাদের দ্বারা গতিমান রেখেছেন। তখন জানতে পারবে, ছোট ভুবনে (عَالَمٌ اَصْغَرَ) মানুষের ক্রিয়াকর্ম (تَصَرُّفٌ) অর্থাৎ দেহ, রূপ। সেরূপ বিশাল জগতে (عَالَمٌ اَكْبَرَ) সৃষ্টিকর্তার ক্রিয়াকর্ম। আর জানতে পারবে, মানুষের অন্তর ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের ক্ষেত্রে, আরশের স্থানে রয়েছে। আর মস্তিষ্ক 'কুর্সীর' স্থানে রয়েছে। আর ইন্দ্রিয়গুলো

ফিরিশতাদের পর্যায়ে রয়েছে। যারা স্বভাবতই আল্লাহ তায়ালার অনুগত। অর্থাৎ যারা সৃষ্টিগতই আনুগত্য করার অভ্যাস পেয়েছে। আর নির্দেশের খেলাফ চলার ক্ষমতা রাখে না। আর মানুষের স্নায়ু এবং অঙ্গাদি আসমানের পর্যায়ে রয়েছে। আর তাদের আঙ্গুলগুলোর শক্তি স্বভাবের পর্যায়ে আছে। যা দেহসমূহে প্রোথিত এবং স্থির হয়ে আছে। আর কলমের কালি উপকরণাদির পর্যায়ে আছে। যা একত্রিত করা এবং যুক্ত করা আর বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করার জন্য মূল বস্তু। আর মানুষের ধ্যান-ভাণ্ডার 'লাউহ-ই-মাহফুয' সম। এখন যে এসব সমস্যাদির রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারবে, সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস ঃ খালাকা আদামার—অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে।

অতঃপর প্রশ্ন করল ঃ যে নিজেকে চিনল সে স্বীয় প্রতিপালককে চিনল—৯. (مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ) এর অর্থ কী?

আমি বললাম ঃ বস্তুনিচয়ের দৃশ্যমান হওয়া বস্তু দ্বারাই চিনা যায়। যদি উপরে বর্ণিত দৃশ্যমান সম্পর্কাদি না থাকত, মানুষ নিজের সত্তাগত হওয়া দ্বারা স্বীয় সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভের দিকে অগ্রসর হতে পারত না। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এ বিশাল জগতের (عَالَمِ اَكْبَرُ এর) সংক্ষিপ্ত লিপিকারক বানিয়েছেন, যার ফলে মানুষ তাদের উপকরণাদি ব্যবহারে আল্লাহর পর্যায়ে অধিকার প্রয়োগ করে। যদি আল্লাহ মানুষকে এরূপ করে সৃষ্টি না করতেন তাহলে যেখানে অন্যান্য খোদায়ী গুণাবলি যেমন অধিকার প্রয়োগ করা (تَعَرُّفُ) প্রতিপালন করা (رُبُوبِيَّتُ) কর্ম (فِعْلُ) বিদ্যা জ্ঞান (عِلْمُ) 'কুদরত' (ক্ষমতাবান হওয়া) ইত্যাদি বিষয়াদি অবগত হতো না। এখন 'নাফস' (মানব মানস) এসবের সংস্পর্শে এসে নিঃসন্দেহভাবে স্বীয় সৃষ্টিকর্তাকে চেনার আয়না হয়েছে। রূহের সম্পর্কে কৃত প্রশ্নে যা প্রথমে বয়ান করা হয়েছে, তা অবগত হলেও এ প্রশ্নের অত্যন্ত পরিষ্কার জ্ঞান এসে যাবে।

অতঃপর আমাকে প্রশ্ন করা হয় ঃ যদি রূহগুলো দেহাদির সঙ্গেই পয়দা হয়, তাহলে এসব হাদীসের অর্থ কী হবে? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ রূহসমূহকে দেহরাজি সৃষ্টি করার দু'হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন ১১.। আর আমি সকল নবীদের

প্রথম ব্যক্তি সৃষ্টির দৃষ্টিতে। আর আমি তাঁদের সবার পরে প্রেরিত হয়ে আসার দিক দিয়ে। আর আমি নবী ছিলাম আদম তখন পানি ও কাদামাটি ছিলেন ১২.

خَلَقَ اللّٰهُ الْاَرْوَاحَ قَبْلَ الْاَجْسَادِ بِاَلْفَىْ عَامٍ وَاَنَا اَوَّلُ الْاَنْبِيَاءِ خَلْقًا وَاٰخِرُهُمْ بَعْثًا - وَكُنْتُ نَبِيًّا وَّ اٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ -

উত্তরে আমি বললাম ঃ বর্ণিত হাদীসগুলোর কোনোটিই রূহ চিরন্তন বা অবিনশ্বর ১৩. (اَزَلِىٌّ) বলে বুঝায় না। বরং রূহ সৃষ্ট (مَخْلُوْقٌ) পূর্বে ছিল না, পরে থাকবে না (حَادِثٌ) বুঝায়। অবশ্য বাহ্যতঃ হাদীসগুলো বুঝায় যে, দেহ সৃষ্টির পূর্বে রূহ সৃষ্টি হয়েছে। আর যা বাহ্যতঃ তার ব্যাপার সমাধা করা সহজ। কেননা বাহ্যতঃ বিষয় বিকল্প অর্থ গ্রহণের অবকাশ রাখে। আর অকাট্য প্রমাণ বাহ্যিক বিষয়টি এর কারণে পরিত্যক্ত হতে পারে না। বরং বাহ্যিক বিষয়ের বিকল্প অর্থ গ্রহণ করতে হবে, 'তা'বিল (تَاوِيْلٌ) করতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যে আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহর সদৃশ বুঝায়, তার বিকল্প অর্থ করতে হবে। অতএব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি ঃ

خَلَقَ اللّٰهُ الْاَرْوَاحَ قَبْلَ الْاَجْسَامِ بِاَلْفَىْ عَامٍ -

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা দেহ সৃষ্টি করার দু'হাজার বছর পূর্বে রূহগুলো সৃষ্টি করেছেন। বিকল্প অর্থ হবে এরূপ ঃ হাদীসে বর্ণিত রূহসমূহ দ্বারা ফিরেশতাদের "রূহগুলোকে" বুঝানো হয়েছে। আর দেহগুলো দ্বারা জাগতিক দেহরাজি বুঝানো হয়েছে। (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা জগতে বিদ্যমান দেহরাজি সৃষ্টির দুহাজার বছর পূর্বে ফিরেশতাদের রূহ সৃষ্টি করেছেন—অর্থ নিতে হবে। এখানে জাগতিক দেহের রূহের কথা বলা হয়নি। (অনুবাদক) যেমন, আরশ, কুর্সি, আসমান, গ্রহ, নক্ষত্র, আগুন, পানি, হাওয়া, মাটি। আর যেখানে মানুষের সকল দেহ যমিনের দেহ হতে ছোট। আর যমিনের দেহ, সূর্যের দেহের তুলনায় অনেক ছোট। আর সূর্য তো এত ছোট যে, বিশাল আকাশের দেহের সাথে তার তুলনাই হতে

পারে না। অনুরূপ এ আকাশের তুলনা তার উপরের আকাশের সাথে হতে পারে না। পরপর স্থাপিত আকাশসমূহের এই একই অবস্থা। অতঃপর এসবের উপর রয়েছে কুর্সি। যার ভেতরে অবস্থান করছে সকল আকাশ এবং যমিন। বস্তুতঃ 'কুর্সি' আরশের তুলনায় ছোট। যদি তুমি এসবের বিশালকায় দেহের ব্যাপারে চিন্তা কর, তাহলে মানুষদের দেহসমূহ অত্যন্ত নগণ্য মনে করে হাদীসে যে বিশালকায় অর্থে দেহগুলোর উল্লেখ এসেছে, তদ্বারা মানুষদের দেহরাজি তোমার বোধগম্য হবে না। অনুরূপ অবস্থা হলো, ফিরিশতাদের রূহের তুলনায় মানবাত্মার অবস্থা। যদি তোমার জন্য ফিরেশতাদের রূহ অনুধাবন করার কপাট খুলে যায়, তখন দেখবে, মানব আত্মাসমূহ একটি প্রদীপসদৃশ। যা বিরাট আগ্নেয়াধার থেকে অনুগ্রহপ্রাপ্ত। আর আগ্নেয়াধার (نَارٌ عَظِيْمٌ) ফিরেশতাদের রূহসমূহে—সর্বশেষ পর্যায়ের রূহ। আর ফিরেশতাদের রূহসমূহে শ্রেণিমত ক্রমানুপাতে বিন্যস্ত। আর প্রত্যেকটিই নিজ নিজ মর্যাদায় স্বতন্ত্র স্থানে অদ্বিতীয়। একই মর্যাদায় দুটি ফিরেশতার রূহ একত্রিত অবস্থানে থাকে না। ব্যতিক্রম মানবাত্মা। যা সংখ্যায় অধিক কিন্তু প্রকারান্তরে ফিরেশতারা নিজ নিজ শ্রেণিবিন্যাসে স্বতন্ত্র ১৪।

এদিকে ইশারা রয়েছে আল্লাহ তায়ালার কালামে ঃ

وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ -

"আর আমাদের মধ্যকার সকলের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট অবস্থান। আর নিশ্চয় আমরা শ্রেণিভুক্ত। আর নিশ্চয় আমরাই আল্লাহর তাসবীহ পাঠকারী—।" (৩৭ ঃ ১৬৫-৬৬)

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلرَّاكِعُ مِنْهُمْ لَا يَسْجُدُ وَالْقَائِمُ لَا يَرْكَعُ وَاِنَّهُ مَا مِنْ اَحَدٍ اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ -

অর্থাৎ ঃ "তাদের মধ্যেকার রুকুকারী সিজদা করে না। যে দাঁড়িয়ে সে রুকু করে না। বস্তুতঃ প্রত্যেকের জন্যই সুনির্দিষ্ট স্থান রয়েছে।"

অতএব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসে সাধারণভাবে যে রূহ এবং দেহরাজির উল্লেখ এসেছে, তাদ্বারা ফিরিশতাদের আত্মা বা রূহ এবং জগতের দেহরাজি বুঝতে হবে।

আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসে এসেছে ঃ

أَنَا أَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ خَلْقًا وَآخِرُهُمْ بَعْثًا.

অর্থাৎ সৃষ্টিগতভাবে আমি আম্বিয়াদের প্রথম। আর আমি তাঁদের সকলের শেষ নবীরূপে (আমার দৃষ্টিতে)—১১।" হাদীসটির বিকল্প অর্থ হবে এইরূপ ঃ

এখানে সৃষ্টিকর্তার (خَالِقٌ) অর্থ হলো পরিকল্পনা করা। অস্তিত্ব দান করা (اِيْجَادٌ) নয়। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মায়ের গর্ভ হতে পয়দা হওয়ার পূর্বে উপস্থিত ছিলেন না, সৃষ্টি হননি। কিন্তু পরিকল্পনার পূর্ণতা, উৎকর্ষ এবং কল্যাণের নিরিখে তিনি সর্বপ্রথম ছিলেন। আর অস্তিত্ব লাভে পরবর্তী ছিলেন। এটাকে—

(أَوَّلُ الْفِكْرِ وَآخِرُ الْعَمَلِ)

অর্থাৎ "চিন্তায় প্রথম, কার্যতঃ সর্বশেষ" বলা হয়। এটাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের "আউয়ালুল আম্বিয়াই খালকান ওয়া আখিরুহুম বাসান উক্তির অর্থ। বিষয়টি এরূপে খুলে বলা যায় ঃ

প্রকৌশলী বা মিস্ত্রী নির্মিতব্য গৃহের ধারণা করে। সর্বপ্রথম স্বীয় মনে গৃহটির পূর্ণ ছবি ধারণায় আনে। তাই ধারণায় আনার ফলে প্রকৌশলীর মানসে আনুমানিক পর্যায় দৃষ্টে, সর্বপ্রথম তা অঙ্কিত হয়। আর বাস্তব ক্ষেত্রে সর্বশেষে অস্তিত্ব লাভ করে। কেননা প্রথমে ইট বানানোর কাজ, প্রাচীর নির্মাণ এবং তা যথাযথভাবে বিনির্মাণ করা, পরিপূর্ণ গৃহ নির্মাণের প্রাথমিক অবলম্বন। তা হলো গৃহ। যার জন্য নির্মাণ সামগ্রী আগেই সংগ্রহ করতে হয়। যখন তুমি কথাটি জেনে নিলে, তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহ তায়ালার মাখলুক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হলো যাতে মাখলুক আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করে। তবে এ লাভ নবীদের শিক্ষাদান ব্যতীত হতে পারে না। এজন্য সৃষ্টির মাকসুদ হলো নবুয়ত প্রবর্তন করা।

কিন্তু নবুয়তের ব্যবস্থা করা প্রধান উদ্দেশ্য নয়; বরং তার সমাপ্তি ও উৎকর্ষ হলো মাকসুদ। নবুওয়াতের উৎকর্ষ ও পূর্ণতা আল্লাহ তায়ালার নিয়ম অনুসারে, পর্যায়ক্রমে সম্পাদিত হয়। যেমন গৃহ নির্মাণের জন্য দালান কোঠা পর্যায়ক্রমে পূর্ণতা পায়। নবুওয়্যাতের সূচনা হয় প্রথমে আদম আলাইহিস সালাম দ্বারা। অতঃপর তা উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। অবশেষে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বারা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অতএব এটাই ছিল নবুওয়্যাতের শেষ এবং পরিপূর্ণতা, সমাপ্তি। যা উদ্দেশ্য ছিল। আর প্রথম দিকের নবুওয়া নবুওয়াতের পরিপূর্ণতা লাভের উপায় অবলম্বন ছিল, মহানবী রাসূলে মকবুলের 'খাতামুন্নাবিয়্যিন' হওয়ার এটাই রহস্য। কারণ পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর বর্ধিত হওয়াটা এক প্রকার ত্রুটি। যেমন হাতের পাঞ্জায় পরিপূর্ণতার রূপ হলো, এক পাঞ্জার পাঁচটি করে আঙ্গুল থাকবে। এখন যদি চারটি আঙ্গুল থাকে তাহলে ত্রুটি থাকবে, অপূর্ণ থাকবে। অনুরূপ ছ'টি আঙ্গুল হলেও ত্রুটিপূর্ণ হবে। কারণ ষষ্ঠ আঙ্গুলটি প্রয়োজনাধিক। যদিও দৃশ্যতঃ অধিক। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটা ত্রুটি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

مَثَلُ نُبُوَّةٍ مَثَلُ دَارٍ مَّعْمُوْرَةٍ لَمْ يَبْقَ فِيْهَا اِلَّا مَوْضِعُ لَبِنَةٍ فَكُنْتُ اَنَا تِلْكَ الاَبِنَةِ - (او كما قال)

অর্থ ঃ নবুওয়াতের দৃষ্টান্ত হলো, একটি নির্মিত ঘরের ন্যায়। যার একটি ইটের স্থান ব্যতীত আর সবই পরিপূর্ণ হলো। অতএব আমি হলাম ওই ইট।" তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ শব্দরাজি উচ্চারণ করেছেন বা এর অনুরূপ অর্থবোধক শব্দ বলেছেন।

যখন তুমি জানতে পারলে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 'খাতামুন নাবিয়্যিন' (সর্বশেষ নবী) হওয়াটা অবধারিত, যাতে অন্যথা হওয়ার অবকাশ নেই, কেননা নবুওয়্যাত হুযুরের দ্বারাই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। আর পরিপূর্ণ হয়েছে। আর যে কোনো বস্তুর সর্বশেষ রূপ

পরিকল্পনায় প্রথমে থাকে, আর বাস্তবে শেষে আত্মপ্রকাশ করে। তাই রাসূল মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বলেছেন ঃ

كُنْتُ نَبِيًّا وَّادَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ -

অর্থাৎ "আমি নবী ছিলাম এবং আদম তখন পানি ও মাটির মাঝে ছিলেন। এও এটার প্রতি ইঙ্গিত। যা আমি বর্ণনা করে এসেছি। কেননা হযরত আদমের সৃষ্টি সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই পরিকল্পনায় তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী ছিলেন। কেননা, আল্লাহ্ তায়ালা আদমকে এজন্যই সৃষ্টি করেছিলেন যে, তাঁর বংশধরের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিকে চয়ন করবেন। আর পর্যায়ক্রমে এমন ব্যক্তিকে চয়ন করবেন, যিনি স্বচ্ছতায় উত্তীর্ণ হয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাক পবিত্র রূহ গ্রহণ করতে পারেন। আর এ বাস্তব তথ্য বুঝে আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত বুঝে না আসবে যে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ গৃহের দুটি অস্তিত্ব থাকে। এক অস্তিত্ব প্রকৌশলীর বা মিস্ত্রীর মানসপটে, মস্তিষ্কে থাকে। যাকে কল্পনা প্রসূত অস্তিত্ব (وُجُوْدُ ذِهْنِىٌّ) বলে। প্রকৌশলী যেন তা দেখতে থাকে। আর এক অস্তিত্ব বাস্তবে প্রকাশ্যে থাকে। যাকে বাস্তব অস্তিত্ব (وُجُوْدُ خَارِجِىٌّ) বলে। বস্তুতঃ কল্পনা প্রসূত অস্তিত্ব (وُجُوْدُ ذِهْنِىٌّ) বাস্তব অস্তিত্বের বিনির্মাণের কারণ হয়। তা অবশ্যই প্রথমে প্রকৌশলীর মনে বিদ্যমান থাকে।

অনুরূপ জেনে রাখ, আল্লাহ তায়ালা প্রথমে বস্তুনিচয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অতঃপর বস্তুনিচয়কে তিনি পরিকল্পনা মোতাবেক সৃষ্টি করেন। আর তাঁর পরিকল্পনা 'সংরক্ষিত ফলকে'—লাউহে মাহফুযে—অঙ্কিত থাকে। যেমন প্রকৌশলী বা মিস্ত্রীর পরিকল্পনা ফলকে বা কাগজে অঙ্কিত থাকে। তাই গৃহটি উদ্ভাসিত পরিপূর্ণ আকারের ছবিসহ কাগজে বিদ্যমান থাকে। তা গৃহটির বাস্তব অস্তিত্ব গড়ে তোলার কারণ হয়। এখন লক্ষ্যণীয়, গৃহের এ ছবি প্রকৌশলীর ফলকে প্রথমে কলম দ্বারা অঙ্কিত হয়। আর কলম প্রকৌশলীর বিদ্যার অনুগামী হয়ে কলম চলে বরং বিদ্যাই কলমকে পরিচালনা করে। অনুরূপ আল্লাহর কর্মকাণ্ডের পরিকল্পিত স্বরূপ 'লওহে মাহফুযে' সর্বপ্রথম অঙ্কিত হয়। আর কলম দ্বারা তা অঙ্কিত হয়। আর কলম আল্লাহ তায়ালার ইলম মোতাবিক চলে।

অষ্টম অধ্যায়

বিশ্লেষণাত্মক পাদটীকা

রূহ সম্পর্কে আলোচনা

৬. 'রূহ' সম্পর্কে নানাজনের নানা মত প্রদত্ত হয়েছে। কোনো কোনো মাশায়েখ, যেমন হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) এবং তাঁর অনুসারীগণ এ বিষয়ে কোনো কথাই বলেননি, তাঁরা বলেছেন ঃ আমরা 'রূহ বিদ্যমান'-এর অধিক কিছু ভাষায় প্রকাশ করছি না। কেননা রূহ নিয়ে কথা বলার হুকুম নেই। এজন্য যে নবী আলাইহিস সাল্লাম এ ব্যাপারে মুখ খুলেননি। তবে প্রতিবাদকারী বলতে পারেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—

اَلرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ -

"রূহ হলো আমার প্রতিপালকের নির্দেশ নিঃসৃত" বলা ব্যতীত অন্য কিছু বর্ণনা না করাতে এটা অবধারিত হয়ে যায়নি যে, রূহ সম্পর্কে কথা বলাই নিষেধ। বা রূহের বাস্তব পরিচয় সম্মানিত আউলিয়াগণের নিকট খুলেনি। অথবা যোগ্য ব্যক্তিবর্গের এবং জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিকট উহার সঠিক স্বরূপ বয়ান করা যাবে না। বস্তুতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাম যে "রূহ আমার প্রভুর হুকুম নিঃসৃত" ছাড়া অন্য কিছু খুলে বলেননি তাঁর ধারণা ছিল, মুশরিকদের রূহের হাকীকত (তত্ত্ব) বুঝার মতো যোগ্যতা ছিল না। এজন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট রূহের তাত্ত্বিক উপাদান (مَاهِيَّتُ) বয়ান করেননি।

এছাড়া 'রূহ' শব্দটি একাধিক অর্থে প্রয়োগ করা হয়। যেরূপ প্রথম টীকায় বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য সম্ভাবনা ছিল, মক্কার বড় বড় কোরায়েশ নেতাদের মধ্য থেকে নযর ইবনে হারিস ইহুদিদের কথা মতো রূহ সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জবাবদানে অপারগ সাব্যস্ত করা। তা এরূপে করা হতো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রূহের

কোনো অর্থ বলতেন, যেমন মানবাত্মার তাত্ত্বিক দিক তুলে ধরতেন তখন সে বলত, এটা তো আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য নয়। পরে যদি তিনি অন্য অর্থ বলতেন, তখনো বলত যে আমার উদ্দেশ্য তাও নয়। এজন্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সহজ, সরল জবাব দান করার জন্য এবং "বলে দাও রূহ আমার প্রভুর নির্দেশ নিঃসৃত" (قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ) বলার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। যাতে প্রশ্নকারী সামনে বেড়ে আর প্রশ্ন করতে না পারে।

কেউ কেউ লিখেছেন যে, তিনটি প্রশ্নের মধ্য থেকে দু'টি প্রশ্নের উত্তর দান করা অর্থাৎ 'যুলকারনাইন' এবং 'আসহাবে কাহফ'-এর বর্ণনা দেয়া এবং একটির জবাব অর্থাৎ রূহের হাকীকত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ না করাই যে আখেরী যমানার নবীর নবুয়াতের সত্যতার প্রমাণ—একথা ইহুদিরা বুঝেছিল। কারণ ওদের কিতাবে 'আসহাবে কাহফ' এবং 'যুলকারনাইনের' কাহিনী ছাড়া 'হাকীকতে রূহের' বর্ণনা ছিল না। এ জন্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নযর ইবনে হারিসের প্রশ্নের জবাবে রূহের তাত্ত্বিক আলোচনা করেননি। যেমন প্রসঙ্গত বলা হয়ে থাকে।

যা হোক, নজর ইবনে হারিসের উত্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এর শুধু এতটুকু বলা ঃ

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ

—"বলে দাও, রূহ আমার প্রভুর নির্দেশ নিঃসৃত"—অবধারিত করে না যে, রূহের হাকীকত তাত্ত্বিক পরিচয়-যোগ্যতা সম্পন্নদের নিকট বয়ান করা নিষিদ্ধ হবে। অথবা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রূহের হাকীকত জানা ছিল না। অথবা সকল আউলিয়ায়ে কেরামের নিকট রূহের তাত্ত্বিক পরিচয় ঘটেনি।

আর দেহ বিশ্লেষকগণ (اَطِبَّاء) মানবাত্মাকেই (رُوْحِ اِنْسَانِىْ) জীবাত্মা (رُوْحِ حَيْوَانِىْ) বলে থাকেন।

আর দার্শনিক ফরফুরিকুস (فَرْفُوْرِيْقُوْسْ) বলেছেন ঃ মানবাত্মা (رُوْحِ اِنْسَانِىْ) মানবদেহে প্রবিষ্ট হয়ে আছে। প্রবিষ্ট হয়ে যাওয়ার পর দেহের সাথে একাকার হয়ে গেছে। যেমন লবণ পানিতে মিশে একাকার হয়ে যায়।

আর 'ফাল্ তারখস' (فَلُوتَرْخَسْ) দার্শনিকের বিশ্বাস ঃ "রূহ এক প্রকার বায়ু। যা শরীরে প্রবিষ্ট আছে। পক্ষান্তরে, দেহ বিশ্লেষকগণ (اَطِبَّاء) যে বলেন ঃ শরীর তদারককারী (مُدَبِّرْ) হলো দেহে প্রতিস্থাপিত উষ্ণতা (حَرَارَتْ عَرِيْزِنِىْ) তাঁদের কথার মর্মও তাই মনে হয়।

দার্শনিক 'তালীস মাতলীর (طَالِسْ مَطْلِىْ) অভিমত ঃ 'রূহ' পানির নাম। কেননা পানি প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদনের কারণ হয়।

"ইবকারুল্ আফ্কার" (اَبْكَارُ الاَفْكَارِ) "দর্শনের নব উন্মেষ" গ্রন্থে দার্শনিক 'উবনা কয়স'-এর (اَبْنَاءُ قَيْسِ) মন্তব্য রয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ রূহ, চতুষ্টয় উপাদানে গঠিত দেহ বিশেষ। আর দেহে তা অনুপ্রবেশ করে আছে। তিনি তার বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ হাজির করে বলেন ঃ অনুধাবনের জন্য সাযুজ্যতার প্রয়োজন রয়েছে। অতএব, আবিষ্কারাদি অনুধাবন করার জন্য সংযুক্ত উপাদানের প্রয়োজন।

আর 'শিফা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'রূহ' ষষ্ঠ বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। অর্থাৎ (عَنَاصِرُ اَرْبَعَهْ) উপাদান চতুষ্টয় এবং শক্তি ও প্রেম দ্বারা গঠিত।

কেউ বলেছেন ঃ রূহ হলো রক্ত। কারণ অবশিষ্ট মিশ্রবস্তু (اَخْلَاطٌ) সমূহের মধ্যে রক্তই হলো শ্রেষ্ঠ। আর মৃত্যুকালে রক্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কেউ বিশ্বাস করেন ঃ রূহ মিশ্রবস্তু চতুষ্টয় (اَخْلَاطٌ اَرْبَعَهْ) কে বুঝায়। যা একত্রিত, সংমিশ্রিত, পরিমাণে ও গুণগত দিক দিয়ে (QUANTITY-QUALITY) সমন্বিত।

কেউ বলেছেন ঃ 'রূহ' হলো মেজাজ।

যা উপাদান চতুষ্টয়ের গুণাবলির মিশ্রণের প্রভাবে সৃষ্টি হয়।

কেউ 'প্রবৃত্তি আত্মাকে' (رُوْحِ نَفْسَانِىْ) অর্থাৎ মস্তিষ্ক শক্তিকে 'মানবাত্মা' (رُوْحِ اِنْسَانِىْ) বলেন।

কেউ 'জীবাত্মা'কে (رُوْحِ حَيْوَانِىْ) অর্থাৎ দৈহিক অন্তর (قَلْبِ جِسْمَانِىْ)-এর শক্তিকে 'মানবাত্মা' (رُوْحِ اِنْسَانِىْ) বলেন।

কেউ উদ্ভিদনির্ভর আত্মাকে (رُوْح نَبَاتِى) অর্থাৎ দৈহিক হৃদপিণ্ডের শক্তিকেই মানবাত্মা (رُوْح اِنْسَانِى) মনে করেন।

কেউ কেউ উল্লিখিত শক্তিত্রয়ের সমষ্টির নামকরণ করেন মানবাত্মা (رُوْح اِنْسَانِى)।

ইসলামি ভাবধারার দার্শনিকদের সিংহভাগের (جَمْهُوْر مُتَكَلِّمِيْنَ) অভিমত হল ঃ মানবাত্মা সূক্ষ্মতম দেহ। যা দেহে প্রবিষ্ট। যেমন গোলাপ জলে গোলাপ প্রবিষ্ট। আর তারা রূহের দেহবিশিষ্ট হওয়ার পক্ষে অনেক প্রমাণ উথাপন করেন। যেমন ঃ আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন ঃ

اَللّٰه يَتَوَفَّى الاَنفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِى لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِى قَضٰى عَلَيْهِ الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى -

অর্থাৎ, আল্লাহ জীবনসমূহকে মৃত্যুকালে এবং নিদ্রাকালে যা মরে না, পূর্ণ আয়ত্বে নিয়ে নেন। অতঃপর তিনি মৃত্যুর ফয়সালা করে ফেলেন, ওটাকে ধরে রাখেন, আর অন্যটিকে তিনি মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন—(৩৯-৪২)।

আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলেন ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظَّالِمُوْنَ فِىْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ -

অর্থাৎ ঃ যদি তুমি জালিমদেরকে মৃত্যু যন্ত্রণায় দেখতে এমতাবস্থায় যে, ফিরিশতাগণ নিজেদের হাত প্রসারিত করে দিয়ে রাখবে, বের করে দাও তোমরা তোমাদের প্রাণ, আজ তোমাদেরকে প্রাপ্য স্বরূপ দেয়া হবে অপমানজনক আযাব....। (৬ ঃ ৯৩)।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন ঃ

يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً -

অর্থাৎ "ওহে! প্রশান্ত আত্মা! ফিরে যাও তোমার প্রতিপালকের নিকট সন্তুষ্ট অবস্থায়, তোমার প্রতি তিনি প্রসন্ন—(৮৯ ঃ ২৭ ঃ ২৮)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আত্মার মৃত্যুবরণ, আত্মাকে আটকে রাখা, আত্মাকে বের করে হস্তান্তর করা, আত্মার ফিরে যাওয়ার খবর দেয়া হয়েছে। যা হচ্ছে দেহের বৈশিষ্ট্য। এতে জানা গেল রূহ দেহবিশিষ্ট। অথবা বলা যায় রূহ উল্লিখিত বিশেষণে বিশেষিত। আর যা উল্লিখিত বিশেষণে বিশেষিত হয় তা দেহবিশিষ্ট হয়। যার অর্থ হলো রূহ ও দেহ।

আর কাযী বাকিল্লানী এবং নাযযাম মুতাযিলীর বিশ্বাস, রূহ সূক্ষ্মতম দেহবিশিষ্ট। যা দেহে প্রবিষ্ট হয়ে আছে। তা পরিবর্তন ও বিনাশন গ্রহণ করে না। আর দেহের কোনো অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও রূহের অঙ্গহানি ঘটে না। বরং যে অংশ অবিচ্ছিন্ন থাকবে সে দিকে রূহ আকৃষ্ট হয়ে দূষিত হবে এবং সংকুচিত হয়ে যাবে।

আর মুতাকাল্লিমিনদের বৃহৎ গোষ্ঠী আশায়েরা ফের্কা। তাঁদের কথা হলো, দেহ গঠিত অনুচ্ছেদ্য অণুকণা সমূহের সমন্বয়ে। যাদেরকে অবিভাজ্য অংশ (جُزْءٌ لَا يَتَجَزَّىٰ) বলা হয়। আর রূহ বলতে বুঝায় এসব অবিভাজ্য অণু সমষ্টির বিদ্যমান থাকাকে। এসব অনুচ্ছেদ্য অণুগুলোকে মূল অংশ বা আসল 'অণু' বলা হয়।

আর দার্শনিক 'ইবনে রাউন্দি' বলেন ঃ রূহ অনুচ্ছেদ্য অণু যা অন্তর পিণ্ডে 'কালবে' (قَلْبٌ) অবস্থান করে।

আর কোনো কোনো ইসলামি দার্শনিক বলেছেন ঃ 'রূহ' দেহহীন পরনির্ভর বস্তু (عَرَضٌ)। অর্থাৎ জীবনের নাম যাকে 'হায়াত' বলা হয়। যদ্বারা দেহ জীবিত থাকে। আর ইমাম রাযীও এ মতের অনুসারী। তিনি বলেন ঃ রূহ দেহের উপর নির্ভরশীল দেহহীন পরনির্ভর বস্তু।

আর কেউ বলেছেন ঃ রূহ আল্লাহ তায়ালার অংশবিশেষ।

আর কোনো কোনো 'সূফী' বলেছেন ঃ রূহ দেহের কোনো 'সিফাত' (গুণ) নয়। বরং রূহ আল্লাহ তায়ালার সত্তার গুণ (صِفَتْ)। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ—قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ—বল, রূহ আমার 'আমর' (اَمْرٌ)। আর 'আমর' (নির্দেশ) হলো আল্লাহর 'কালাম' অর্থাৎ জীবনদান (اَحْيَاءٌ) করার নাম। ('কুন ফায়াকুন' নির্দেশ হয়তো বলতে চাইছেন এই সূফী বর– অনুবাদক)।

কারো কারো উক্তি হলো ঃ 'রূহ' মনোরম 'সমীরণ' যা জীবন সঞ্চারের কারণ ঘটায়। যেমন স্বয়ং উষ্ণ বায়ু নড়াচড়া করা এবং প্রবৃত্তিগত কামনার উন্মেষ ঘটায়।

কিন্তু উল্লিখিত মতামতের দুর্বলতা এবং অসারতা—একথা ধরে নিলে যে প্রবক্তাদের উদ্দেশ্য হল 'বোধশক্তি সম্পন্ন মানসিকতা' (نَفْس نَاطِقَة) অর্থাৎ 'মানব মানস' (رُوْحٌ اِنْسَانِىْ)-কে তারা রূহ বলতে চেয়েছেন—যা বিচক্ষণ বুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন সূক্ষ্মদর্শীজনের নিকট গোপন থাকার বিষয় নয়। কেননা, রূহ কারো মতে জীবাত্মাকে (رُوْح حَيْوَانِىْ) বলে অথবা কারো কারো মতে, দেহ, (جِسْمٌ) কারো মতে দৈহিক শক্তি (جِسْمَانِىْ قُوَّتْ)—যা পরিশোধিত হলে পর শুধু শারীরিক সুস্থতা অর্জিত হয়—তাকে মানবাত্মা (رُوْح اِنْسَانِىْ) বলা হয়, কিংবা কারো উক্তি যে, রূহ দেহে মিশে আছে, যেমন পানিতে একাকার হয়ে আছে লবণ, যা দেহের বৈশিষ্ট্য, অথবা বায়ু বা পানিকে 'রূহ' বলা যা হচ্ছে অনুভূতিহীন বস্তু অথবা উপাদান চতুষ্টয়ে গঠিত দেহ বলা, বা ছয়টি বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত বলা, অথবা রক্তকে মানবাত্মা বলা যা অনুভূতিহীন বস্তু, বা বস্তু চতুষ্টয় সংমিশ্রণ সৃষ্ট (اَخْلَاطِ اَرْبَعَه) বা মেজাজকে রূহ বলা যা বস্তুনিচয় সমন্বয়ে গঠিত, অথবা উদ্ভিদ উপাদানে সৃষ্ট আত্মা প্রবৃত্তিকে (رُوْح نَفْسَانِىْ نَبَاتِىْ কে) মানবাত্মা (رُوْح اِنْسَانِىْ) বলা, বা মানবাত্মাকে (رُوْح اِنْسَانِىْ) সূক্ষ্মতম দেহ বলা যা কোনোরূপ বিনাশন পরিবর্তন ছাড়াই শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে আছে, অথবা অনুচ্ছেদ্য অণু (اَجْزَاءُ لَا يَتَجَزَّءُ) দ্বারা গঠিত বলা, অথবা জীবনের নাম (حَيَاتٌ) রূহে ইনসানী বলা, অর্থাৎ পরনির্ভর বস্তুকে (عَرَضٌ) রূহ নামকরণ করা, বা অন্তরপিণ্ডে অবস্থিত অননুচ্ছেদ্য অণুর নাম রূহ

রাখা, অথবা এমন কথা বলা যে, রূহ হলো সূক্ষ্ম মনোরম বায়ু—মানবাত্মা তথা রূহে ইনসানীর তাত্ত্বিক ও বাস্তবভিত্তিক হাকীকত না বুঝার কারণে সকল মত প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, রূহে ইনসানী (মানবাত্মা) অনুধাবনকারী। আর 'অনুধাবন' করা সত্তাবিশিষ্ট বস্তুর (جَوْهَرٌ) বৈশিষ্ট্য। এমতাবস্থায় 'রূহ' পরনির্ভর (عَرَضٌ) কী করে হতে পারে? আর 'রূহ' বিভিন্ন উপাদানে গঠিত হয়ে থাকলে, একই অবস্থায়, উহা কোন কিছু জানবে আর তা অজ্ঞাতও থাকবে এটা অবধারিত হবে, যা অসম্ভব। তাহলে 'রূহ' দেহ কী করে হতে পারে? অথবা রূহের জন্য দেহের উপর নির্ভরশীল সত্তাহীন পরনির্ভরতা কী করে সাব্যস্ত করা যাবে?

(আর মুসলিম দার্শনিক মহোদয়গণ (مُتَكَلِّمِيْنَ) রূহ দেহধারী হওয়ার ব্যাপারে যে প্রমাণাদি পেশ করেছেন, অর্থাৎ মৃত্যুবরণ, তা ধরে রাখা, ছেড়ে দেয়া, প্রত্যাবর্তন করা ইত্যাদি—। আমি বলতে চাই, এর কোনোটাই রূহ দেহবিশিষ্ট হওয়া প্রমাণ করে না। কেননা, 'ওফাত' বা মৃত্যু হলো শরীরের সাথে রূহের সম্পর্ক উঠিয়ে নেয়া। রূহ বা আত্মাকে বিলুপ্ত করে ফেলার নাম মৃত্যু নয়। কেননা মানবাত্মা (رُوْحٌ اِنْسَانِىْ) অর্থাৎ অনুধাবন সম্পন্ন মানসিকতা (نَفْس نَاطِقَة) বিলুপ্ত হওয়াই অবান্তর কথা। কিছুক্ষণ পরই এর সপক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা হবে।

অনুরূপ, ধরে রাখার (اِمْسَاكٌ) অর্থ হল, আত্মার সম্পর্ক দেহের সাথে স্থাপিত হতে না দেয়া। আর ছেড়ে দেয়ার (اِرْسَالٌ) অর্থ হলো, ধরে রাখার পর উহার সম্পর্ক দেহে স্থাপিত করে দেয়া। আর আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন (রুজু) করার অর্থ হলো, শরীরের সাথে রূহের অধিকার প্রয়োগে (تَصَرُّفٌ) বিরত থেকে আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হওয়া।

আর আত্মা বের করে দেয়ার (اِخْرَاجٌ) অর্থ অনুধাবন মানসিকতার (نَفْسِ نَاطِقَه) সম্পর্ক শরীরের সাথে 'মউকুফ' করে ফেলা।

অতএব, কুরআন মজীদে, রূহের জন্য উল্লিখিত বিশেষণ বিবৃত হওয়ার দরুন 'রূহ' দেহবিশিষ্ট বলে প্রমাণ করা গ্রহণযোগ্য নয়।

এছাড়া আমরা এরূপ ব্যাখ্যাও প্রদান করতে পারি। মৃত্যুকালে শরীর থেকে জীবাত্মা (رُوْح حَيْوَانِىْ) বের করে দেয়া হয়। যা বহিষ্কৃত হওয়ার ফলে অনুধাবন মানসির্কিতা বা জীবাত্মার শরীরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। কেননা, অনুধাবন মানসিকতার (نَفْس نَاطِقَه) শরীরের উপর কর্তৃত্ব চলে জীবাত্মার (رُوْح حَيْوَانِىْ) মাধ্যমে। যা হচ্ছে সূক্ষ্মতম বাষ্প। দেহস্থিত অন্তরের উষ্ণতা (حَرَارَتِ قَلْبِ) দ্বারা রক্তিত হয়ে দেহতন্ত্র দ্বারা যাবতীয় শরীরের অঙ্গাদিতে বিস্তার লাভ করে। আর যাবতীয় অঙ্গাদিকে জীবন দান করে। এ সূক্ষ্মতম বাষ্প অর্থাৎ জীবাত্মার দেহাভ্যন্তরে বিচরণ করা আর শরীরের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হওয়া এমন যে, একটি প্রদীপ, (দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিন) ঘরের আনাচে-কানাচে যদি ফেরানো হয়, আর তা থেকে ঘরের চারদিকে আলোক বিকিরিত হয়ে পড়ে। বলা যাবে, আলোচ্য সূক্ষ্মতম বাষ্প প্রদীপের স্থানে আছে। আর জীবন প্রদীপের আলো সমতুল্য। এ সূক্ষ্মতম বাষ্পের দ্বারা অনুধাবন মানসিকতার (نَفْس نَاطِقَه) সম্পর্ক তদারক করা এবং কর্তৃত্ব স্থাপনের ক্ষেত্রে শরীরের সাথে যে স্থাপিত ছিল, তা মৃত্যুকালে নিঃশেষিত হয়ে যায়। আর এর (বাষ্পের) বহিষ্কার, ছাড় দান, ধরে রাখা দ্বারা মানবাত্মার সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া বা না হওয়া অস্তিত্ব লাভ করে। অতএব রূপক অর্থে উল্লিখিত বিশেষণাদিকে যা বস্তুতঃ জীবাত্মার বিশেষণ তা মানবাত্মার বিশেষণ বলে ধরে নেয়া হয়।

যেমন কোনো বাদশাহর কোনো দেশে কর্তৃত্ব থাকে। আর ওই বাদশাহের সভাসদবৃন্দ, সেনাদল ওই দেশে অবস্থান করে। কোনো বিদ্রোহী নায়ক এসে ওই বাদশাহর কর্মচারীবৃন্দ এবং সেনাদেরকে হত্যা করে ফেলে বা তাদেরকে বহিষ্কার করে দেয়। তখন আমরা বলব, অমুক বাদশাহ নিহত হয়েছেন বা অমুককে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে। অথবা অমুক দেশ তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। যা বলার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য থাকে ওই দেশে ওই বাদশাহর কর্তৃত্ব বিলুপ্ত মানে তা তদারক করা বা সেখানে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

আর আশাইরা মুসলিম দার্শনিকগণের এবং দার্শনিক ইবনে রাউয়ান্দির মতের অসারতা উপরে উল্লিখিত নিবেদিত তথ্যাদির আলোকে

বাতিল হয়ে যায়। কেননা আত্মা কোনো অননুচ্ছেদ্য আলোচনা দ্বারা (اَجْزَاء لَا يَتَجَزّى) গঠিত নয়। অথবা স্বয়ং অবিচ্ছেদ্য অণু নয় দেহবিশিষ্ট মানব অন্তরের। বরং মানবাত্মা কোনো স্থানে প্রবিষ্ট হওয়া বা কোনো অঙ্গের অংশ হওয়া বা স্বয়ং দেহ হওয়া থেকে মুক্ত।

এছাড়া অবিচ্ছেদ্য অণুকণা বা (جُزْء لَا يَتَجَزّى) বাতিল সাব্যস্ত হওয়ার প্রমাণাদি গণিত শাস্ত্রে ও জ্যামিতিতে প্রতিপন্ন হয়েছে। যেমন, ত্রিভুজের বাহুর কোনার অন্তঃরেখার (وَتْر) ক্ষেত্রফল উহার বাহুদ্বয়ের ক্ষেত্রের সমান হয়। অতএব, যখন আমরা সমবাহু বিশিষ্ট ত্রিভুজের দু'টি বাহু যা সমান মাপের হয় যেমন প্রতিটি বাহুকে ধরে নেয়া যায় দশ দশটি অংশে বিভক্ত—তখন বর্ণিত কাঠামো রেখার উহাদের প্রান্তরেখা (وَتْر) ২ শত বর্গক্ষেত্র হওয়া উচিত। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দুই শত বর্গের হিসাব অভ্রান্ত হতে পারে না। ধরা যাক, যদি ১৪ কে অন্তরেখা (وَتْر) বলা হয় তাও ঠিক হবে না। কারণ এটা তো হচ্ছে ১৯৬ বর্গক্ষেত্র। যদি বলা হয় যে, ১৫ (وَتْر) অন্তঃরেখার বর্গক্ষেত্র, তাও হতে পারে না। কারণ, এর বর্গক্ষেত্র হয় ২২৫। অতএব, ১৪ ভগ্নাংশ মিলিয়ে ২০০ বর্গফল বের হবে। যাদ্বারা আলোচনাধীন ধারণকৃত অবিচ্ছেদ্য অণুর বিভক্তি ও বিভাজন সাব্যস্ত হয়ে যায়।

যদি বলা হয় মুসলিম দার্শনিকগণ (مُتَكَلِّمِيْن) অবিচ্ছেদ্য অণুর বিপক্ষের প্রমাণাদিকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। আর তারা অবিচ্ছেদ্য অণুর পক্ষের শক্তিশালী দলিলাদি দ্বারা তা সাব্যস্ত করেছেন। যাতে করে মূল বাস্তবতা (هَيُولى) এবং আর আকার (صُوْرَت) হতে রক্ষা পাওয়া যায়। কারণ তা মেনে নেয়া হলে সৃষ্টি জগতের অবিনশ্বরতা এবং সশরীরে হাশর হওয়াকে অস্বীকার করার পথ খুলে যায়। আমি বলব, অবিচ্ছেদ্য অণুর পক্ষের দলিলগুলোও তেমন শক্তিশালী নয়। এজন্য ইমাম রাযী এ বিষয়ে মৌনতাবলম্বন করেছেন।

এছাড়া কথা হলো, মূল বস্তুসত্তা (هَيُولى) আকারবিহীন পদার্থ এবং বস্তুর আকার (صُوْرَت) মেনে নেয়া হলেও তাদ্বারা জগতের অবিনশ্বরতা এবং সশরীরে হাশর হওয়া অস্বীকার করার পথ খুলে না।

কারণ দার্শনিকরাও আকারবিহীন পদার্থের বস্তুসত্তার (হায়ূলার) সরাসরি সত্তাগত অবিনশ্বর (وَقَدِيْمُ الذَّاتِ) হওয়াকে তো সমর্থনই করেন না। অবশ্য এরা এসবের কালগত অবিনশ্বরতা (قَدِيْمٌ بِالزَّمَانِ)-এর অর্থ করেন। আর তাঁরা যাবতীয় কালগত সব সৃষ্টিকে (حَادِثٌ زَمَانِيٌّ কে) মূল সত্তাগতভাবে পূর্ব থেকেই ছিল (مسبوق بالمادہ) বলে থাকেন। কিন্তু তারা এর পক্ষে কোনো শক্তিশালী প্রমাণ বর্ণনা করেননি। বিষয়টি জ্ঞানলব্ধ বিষয়ের পণ্ডিত মহোদয়গণের নিকট অনুহ্য নয়।

অতএব, যখন ওসবের অবিনশ্বর হওয়াটাই সাব্যস্ত নয়, তাহলে ওসব প্রমাণ করা দ্বারা জগত অবিনশ্বর হওয়া এবং সশরীরে হাশর হওয়াকে অস্বীকার করার পথ কিরূপে খুলে যাবে?

আর যদি কথার কথা ধরে নেয়া হয় যে, আকার বিমুক্ত পদার্থ এবং আকার, যাতে জগতের অবিনশ্বর হওয়া এবং সশরীরে হাশর হওয়ার ধারণা বিলুপ্ত হয়ে যায়, এজন্য দেহ একক সত্তা সর্বস্ব (جَوَاهِرُ وَاحِدَه) যা বেদ ব্যাস পূর্ণ অংশাদি দ্বারা (اَجْزَاءُ مِقْدَارِيَه) গঠিত, তবু আমরা বলব, এমনকি প্রয়োজন হলো যে, মানবাত্মাকে অযথাই অবিচ্ছেদ্য অণু দ্বারা গঠিত মানতে হবে? অথচ মানবাত্মা সংমিশ্রণে গঠিত হওয়াটা দ্বিধাহীনভাবে বাতিল ধারণা।

আর যারা বলে যে, রূহ আল্লাহর বহুধা অংশের মধ্যের একটি অংশ। তাদের উক্তির বাতুলতা প্রকাশ্যেই বুঝা যায়। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন অংশ দ্বারা গঠিত হননি। যে এক অংশ অর্থাৎ 'রূহ' তা থেকে পৃথক হয়ে মানবদেহে সম্পৃক্ত হয়েছে। তিনি এরূপ ধারণার বহু উর্ধ্বে রয়েছেন।

আর কোনো কোনো সুফিবরের এ বিশ্বাস যে রূহ দেহের বিশেষণ না। বরং তা আল্লাহর সত্তার গুণ বিশেষ, এর বাতুলতা যে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট প্রতিভাত। কেননা, এটা তো সম্ভবপর যে, করিম একটি বিষয় জানবে। আর রহিম তা জানবে না। অতএব, রূহ যদি আল্লাহ তায়ালার সত্তার বিশেষণ হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালার সত্তায় না জানার গুণগত ত্রুটি আসা অবধারিত হয়ে যাবে। এবং আরও অনেক অনর্থের সৃষ্টি হবে। এছাড়া আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ-

"বল, রূহ আমার মালিকের নির্দেশ নিঃসৃত—।" এখানে "مِنْ" (হতে) শব্দের প্রয়োগ বুঝাচ্ছে যে, রূহ নির্দেশ জগতের (عالم امر) বিষয়। অর্থাৎ এমন জগতের, যার কোনো পরিমাপ ও 'বেদ-ব্যাস' (مِقْدَارْ) নেই। মোটকথা, মানবাত্মা (رُوْحِ اِنْسَانِىْ) যা পরকালের বিষয়াদি এবং জ্ঞানলব্ধ বাস্তব ব্যাপারসমূহ অনুধাবন করা এবং পরিশুদ্ধি দ্বারা সমস্ত জগতের প্রতিপালকের নৈকট্য হাসিল হয়। আর যাকে সম্বোধন ও ভর্ৎসনা করা যায়। যাকে জ্ঞান ও অন্তর (عَقْلُ وَ قَلْبُ) অর্থাৎ যাকে ঐশ্বরিক সূক্ষ্ম সূত্র' (لَطِيْفَةٌ رَبَّانِىْ) অনুধাবক মানস (نَفْسِ نَاطِقَة) মানবীয় বাস্তবতা (حَقِيْقَتِ اِنْسَانِى)-ও বলা হয়। যার পরিশুদ্ধি কল্যাণ সাধন করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰاهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا - قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا -

অর্থাৎ এবং শপথ প্রাণের! আর যে ধারায় তা গঠিত। তারপর উহাকে উহার পাপ এবং তাকওয়া বোধ দিয়েছেন আল্লাহ। যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ করেছে সে কৃতকার্য হয়েছে। আর যে উহাকে কলুষিত করবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৯১ ঃ ৭-১০)

আর মানবাত্মা এবং জীবাত্মাও এক নয়। কেননা, জীবাত্মার মাঝে (رُوْحِ حَيْوَانِى) পরকালের বিষয়াদি সম্পর্কে এবং জ্ঞানলব্ধ বাস্তব বিষয়ের অনুভূতি থাকে না। যদি তাই হতো সকল জীবই পরকালের বিষয়াদি এবং জ্ঞানগত বিষয়াদি সম্পর্কে অবধারিতভাবে জ্ঞাত হতো। যা পরিষ্কার অবাস্তব।

আর তা উদ্ভিদ উৎপাদিত শক্তি বা স্বভাব সৃষ্ট শক্তি (قُوَّتِ اِنْسَانِىْ يَا نَبَاتِى) নয়। তা অন্য কোনো পরনির্ভর বস্তুর নামও নয়। কেননা, পরনির্ভর বস্তুর (عَرَضْ) অনুধাবন শক্তি থাকে না। আর মানবাত্মা (رُوْحِ اِنْسَانِىْ) অনুধাবনকারী হয়। আর তা অবিচ্ছেদ্য অণুও নয়। একাধিক অংশের সমন্বয়ে গঠিত (مُرَكَّبْ) বস্তুও নয়। বরং রূহ হলো স্বনির্ভর অবিচ্ছেদ্য যা জীবাত্মার মাধ্যমে দেহকে তদারক করে।

শরীরের আঙ্গিক বন্ধন (تَرْكِيْبٌ) রক্ষা করে। রূহ স্থান এবং দিক হতে মুক্ত। রূহ শরীরের ভেতরে ঢুকেও নেই। না শরীর থেকে বাইরে। না শরীরের সাথে যুক্ত। না শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন। মাশ্‌শাইন এবং ইশরাকিয়্যীন দার্শনিকদের এটাই অভিমত। আর তত্ত্ব-অভিজ্ঞ বিজ্ঞজনের যেমন, আবু যায়েদ, বুসী, ইমাম রাগিব, ইমাম গাজ্জালী প্রমুখ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের লোকজনের এটাই বক্তব্য। আর মোতাজিলা সম্প্রদায়ের 'মাআমার' এবং ইমামিয়া মতবাদের একাংশের এটাই অভিমত। আর সূফীবাদের তথ্য বিজ্ঞজনের এটাই আকিদা। আর সূফীবাদের মধ্যকার কামিলে বুযুর্গদের 'মুশাহাদাত' (দিব্য-দর্শন) সেদিকেই যায়। (মুফতী শাহ দ্বীন)

মানবাত্মা এক জাতীয় জিনিস

৭. মানবাত্মার (اَرْوَاحِ بَشَرِى) অভিন্ন সত্তা যা এক জাতীয় হওয়ার কারণ এই ঃ অনুধাবনকারী মানসিকতা (نَفْس نَاطِقَة) অর্থাৎ পদার্থহীন সত্তাধারী (جَوْهَر مُجَرَّدَة)। যা জীবাত্মার মাধ্যমে দেহকে তদারককারী। তা' মানবজাতির বৈশিষ্ট্য। যেমন পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আর মানুষ বলতে বুঝায় একজাতীয় স্বত্বাধিকারী জীব। অর্থাৎ যাবতীয় ব্যাপক অর্থবোধক তথ্যের মধ্যে সর্বনিম্ন ব্যাপকতা বোধক তথ্য। যাকে শ্রেণি (نَوْع) বলা হয়। আর মানুষ হলো যাবতীয় ব্যাপক অর্থবোধক তথ্যাদির সর্বনিম্ন ব্যাপকতা সম্পন্ন তথ্য। আর যা কিছু সুনির্দিষ্টভাবে সর্বনিম্ন ব্যাপকতাবোধক তথ্যের সাথে জড়িত হয়, তা ব্যাপক অর্থবোধক তথ্য হতে পারে না। অন্যথায় (نَوْع سَافِل) তথা সর্বনিম্ন ব্যাপকতাবোধক তথ্যের সাথে সুনির্দিষ্ট তথ্য তারই সাথে সুনির্দিষ্ট নয় বলে প্রতিপন্ন হবে। এজন্যই মানুষের সংজ্ঞা উপলব্ধি সম্পন্ন জীব 'তথা' 'হায়ওয়ান-ই-নাতিক'-ই-এর মধ্যকার 'নাতিক' তথা 'উপলুব্ধক' শব্দকে মানব তথ্য বুঝাবার জন্য "নিকটতম বিভক্তিকারী" (فَصْلِ قَرِيْب) এবং অন্য সব বস্তু হতে মনুষ্যকে পৃথককারী বলা হয়। কেননা, উপলুব্ধক (نَاطِقٌ) শব্দের উৎপত্তিই হলো "নুতক" (نُطْقٌ) তথা

উপলব্ধি থেকে। অর্থাৎ যা হচ্ছে অনুধাবনকারী মানসিকতা বা "নাফসি নাতিক" (نَفْس نَاطِقَة)। যা ইনসান তথা মানুষের সত্তাগত বৈশিষ্ট্য। অতএব, ফাসলে করীব (فَصْل قَرِيْب) তথা নিকটতম বিভক্তকারী এ তথ্য অন্যান্য যাবতীয় তথ্যাদি থেকে আলগ করে মনুষ্য অর্থ বুঝায়। আর তা এই স্বত্বাধিকারী হওয়াটা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। দার্শনিক এরিস্টটল এবং আবু আলী সিনাও এ মত গ্রহণ করেছিল। অবশ্য জ্ঞানীরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। আর আবুল বারাকাত এবং ইমাম রাযী ছিলেন ইসলামি দর্শনবিদ। তারা মানবাত্মাকে ব্যাপক অর্থে (جِنْس) তথ্যাদিবোধক বলে মত পোষণ করতেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্তি মুসলিম শরীফে এসেছে যে, তিনি বলেছেন ঃ

اَلنَّاسُ مَعَادِنٌ لِمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوا - وَالْاَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا عَارَفَ مِنْهَا اِئْتَلَفَ وَمَا نَاكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ -

অর্থাৎ "মানুষের বিভিন্ন খনি রয়েছে যেমন স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনিসমূহ রয়েছে। তাদের যারা ইসলামপূর্ব জাহিলী যুগে উত্তম ছিল ইসলামেও তারা উত্তম যদি ইসলামি জ্ঞানের অধিকারী হয়ে যায়।"

অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ আর রূহগুলো সৈনিকদের ন্যায় একত্রে ছিল। তাই এ সবের মধ্যে যারা পরিচিত ছিল, তাদের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে উঠে। আর যারা অপরিচিত ছিল, তাদের মধ্যে মতের গড়মিল হয়।

উল্লিখিত মুসলিম দার্শনিক মহোদয়গণ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষোক্ত হাদীসটিতে "রূহগুলো" (اَرْوَاحُ) বলেছেন। অর্থাৎ রূহের 'বহুবচন' ব্যবহার করেছেন। অনুরূপ শুরুর হাদীসটিতে রূহগুলোকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনির সাথে—যা সত্তাগত ভাবের বিভিন্ন প্রকার উপমা প্রদান করেছেন। যদ্বারা রূহ তথা আত্মাসমূহ সত্তার দিক থেকে ব্যাপক অর্থবোধক তথ্য (مَاهِيَّت جِنْسِى) বুঝায়।

এসব যুক্তির উত্তরে আমি বলব ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক রূহকে বহুবচনরূপে ব্যবহার করা দ্বারা 'রূহ'-এর তথ্যগতভাবে ব্যাপক অর্থবোধক হওয়া প্রমাণিত হয় না। কেননা, 'বহুবচন' ব্যবহৃত হওয়ার জন্য একক সমূহে (اَفْرَادٌ)-এর সত্তা নির্ণয়ে এবং প্রকারে বিভিন্নতাই যথেষ্ট হয়। এজন্যে আবশ্যক হয় না যে, বহুবচন শব্দ উহার অধীনে ব্যাপক তথ্যবোধক (جِنْسٌ) এবং পৃথককারী সীমিত তথ্যবোধক (فَصْلٌ) বিভিন্ন রূপ তথ্যাদিই হতে হবে যদ্দারা শর্তহীনভাবে 'রূহ'কে 'ব্যাপক অর্থবোধক তথ্য' সাব্যস্ত করা যাবে।

অনুরূপ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনির সাথে তুলনা করা হয়েছে এজন্যে যে, খনি স্বর্ণ ও চান্দির আধার হয়। আর মানুষ জ্ঞানবিদ্যার আকর। শুধু এজন্যে উপমা দেয়া হয়েছে যে, স্বর্ণ রূপার খনিগুলোতে যোগ্যতার নানা প্রকার মান থাকে। যেমন, স্বর্ণের খনি উন্নতমানের হয়। রূপার খনির মান তার সমতুল্য হয় না। অনুরূপ, মানুষও বিভিন্ন মানের। কেউ খনির মর্যাদানুপাতে আল্লাহ্ তায়ালার রূহানী ফরমান (প্লাবন) ধরে রাখার যোগ্য হন। কেউ তেমন হয় না। তাছাড়া হাদীসটিতে মানুষের স্বর্ণ ও চান্দির সাথে তুলনা করা হয়নি। বরং স্বর্ণ ও চান্দির খনির সাথেই তুলনায় আনা হয়েছে। যা তথ্যগত দিকে অভিন্ন এবং মানগতদিকে বৈচিত্র্যময়। মোট কথা এ উপমা দ্বারা এ তথ্য নিঃসন্দেহভাবে সাব্যস্ত হয় যে, মানুষের মাঝে মানগত বৈচিত্র্য আছে। কেউ তাদের মধ্যে আল্লাহর অনুগ্রহের অবদান (فَيَضَانٌ) ধরে রাখেন। কেউ তেমন মানের হয় না। আর কেউ ভদ্র সুন্দর হন। কেউ তেমন নয়। তবে ইসলামপূর্ব মূর্খতার যুগে যারা সুভদ্র শরীফ ছিলেন, তারা ইসলামি যুগে সুভদ্র শরীফ হবেন দ্বীনের বোধ অর্জন করলে পর। যেমন—তাদের মধ্যে যারা জাহিলী যুগে তাদের উত্তম ব্যক্তি ছিলেন ইসলামেও উত্তম হবেন—দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করার পর (خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا) বাক্যটি এ অর্থ বুঝায়। কাজেই, এ উপমা দ্বারা মানবাত্মা অর্থাৎ অনুধাবন মানসিকতা (نفس ناطقة) যা স্বনির্ভর সত্তাবিশিষ্ট, বিভাজনহীন, (بَسِيْطٌ) যা জীবাত্মার মাধ্যমে দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরকালীন তথ্যাদি এবং জ্ঞানলব্ধ বস্তুর তথ্যসমূহ অনুধাবনকারী শব্দ দ্বারা ব্যাপক

অর্থবোধক তথ্য সাব্যস্ত করার প্রমাণ উপস্থিত করা বা সাধারণ অর্থে 'রূহ' শব্দ দ্বারা মানবাত্মা এবং অন্যান্য তথ্যাদির মাঝে শাব্দিক শরীক শব্দার্থে না নিয়ে (اِشْتِرَاكِ لَفْظِيْ) ব্যাপক অর্থে অংশীদার করা মোটেই সাব্যস্ত হয় না। এরূপ উপমা অনুসরণ করে রূহের জন্য ব্যাপক অর্থবোধক তথ্য (جِنْسِيَّتِ) হওয়ার সমর্থক হওয়া নির্ভেজাল ভ্রান্তি, আর তা না বুঝার ব্যাপার নয়।

আর 'রূহ' সমূহ একত্রিত অবস্থানকারী ছিল—(اَلْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُّجَنَّدَةٌ) দ্বারা 'লুমুয়াত' প্রণেতার রূহের পর দেহের অস্তিত্ব ছিল বলে প্রমাণ পেশ করা দুর্বলতা বিমুক্ত নয়। কেননা (اَلْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُّجَنَّدَةٌ) বাক্যের সাথে (قَبْلَ الْاَجْسَامِ) শর্তের উল্লেখ নেই। অনুরূপ রূহসমূহের পরস্পর পরিচিতি (قَبْلَ الْاَجْسَامِ) দ্বারা শর্তারোপিত করা হয়নি। আর শরীর সৃষ্টির পূর্বে (قَبْلَ الْاَجْسَامِ) এর শর্তারোপ ব্যতীতই হাদীসের অর্থ বোধগম্য হয়। যা পরিষ্কার বুঝা যায়। অতএব, বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অযথা এরূপ শর্তারোপ করে রূহের পূর্বে দেহ ছিল বলে সাব্যস্ত করা অযৌক্তিক। অথচ বাস্তবভিত্তিক দলীল প্রমাণ এর বিরুদ্ধে রয়েছে যেমন বর্ণিত হয়েছে 'দুর্বলতা মুক্ত নয়' কথার দ্বারা।

'আল্লাহর সুরতে আদম' কথার বিশ্লেষণ

৮. হাদীসটি মুসলিম ও বুখারী বর্ণনা করেছেন। মূল বর্ণনাকারী হলেন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)। হাদীসে বর্ণিত 'সুরাত' দ্বারা গুণ বিশেষ (صِفَتْ) বুঝানো হয়েছে। তাই হাদীসটির অর্থ দাঁড়াবে এরূপ ঃ "সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তায়ালা আদমকে স্বীয় গুণের ধারায়।"

অর্থাৎ বিদ্যাগত (عَالِمٌ) বাকশক্তি সম্পন্ন (مُتَكَلِّمٌ) দৃষ্টি শক্তি বিমণ্ডিত (بَصِيْرٌ) করে। এ ছাড়া এখানে সম্মান দানের নিমিত্ত ও 'সম্বন্ধ' আল্লাহর প্রতি দেখানো হতে পারে। যেমন, "বায়তুল্লাহ" (আল্লাহর ঘর)। "না'কাতুল্লাহ" (আল্লাহর উটনি) বাক্যে কাবাঘরকে সম্মানদানের নিমিত্ত এবং (হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায়) মুজিযার উটনিকে না'কাতুল্লাহ বা আল্লাহর নাকাহ (উটনি) বলা

হয়েছে। বস্তুতঃ 'মাজমাউল বিহার' গ্রন্থ প্রণেতার ব্যাখ্যা (عَلٰى صُوْرَاتِهٖ) এর সর্বনাম (ه) আদমের জন্য এসেছে।

অর্থাৎ (عَلٰى صُوْرَتِ اٰدَمَ) আদমকে আদমের নিজ সুরাতে সৃষ্টি করেন—" অর্থ হবে। এরূপ ব্যাখ্যা (عَلٰى صُوْرَتِ الرَّحْمٰنِ) শব্দে বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থি হবে। তবে কেউ বলেছেন ঃ (عَلٰى صُوْرَتِ الرَّحْمٰنِ) শব্দে বর্ণিত রেওয়ায়েত সহীহ্ নয়। (মুফতী শাহ দীন)

৯. مَنْ عَرَفَ نَفْسَهٗ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهٗ —হাদীসটিকে ইবনে তায়মিয়া 'মাউয্' তথা বানোয়াট হাদীস বলেছেন। হাদীসটির সূত্র মারফূ—(مَرْفُوْعٌ) তথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছায় বলে মনে হয় না। আল্লামা ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায রাব্বি বলেছেন ঃ আল্লামা নাওয়াবী লিখেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসটি প্রমাণিত নয়। তবে হাদীসটির ভাবার্থের বাস্তবতা রয়েছে। অর্থাৎ—

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهٗ بِالْجَهْلِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهٗ بِالْعِلْمِ -

"যে নিজেকে অজ্ঞ বলে জানল, সে তার রবকে জ্ঞাত জানল।"

وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهٗ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهٗ بِالْبَقَاءِ -

—যে নিজেকে নশ্বর বলে জানল সে তার রবকে চিরস্থায়ী জানল।"

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهٗ بِالْعَجْزِ وَالضَّعْفِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهٗ بِالْقُدْرَةِ - وَالْقُوَّةِ -

—যে ব্যক্তি নিজেকে দুর্বল ও অক্ষম জানবে, সে স্বীয় রবকে সবল ও শক্তিমান জানবে।"

আর বলেছেন ঃ এরূপ অর্থ আল্লাহ্ তায়ালার বাণী হতে আবিষ্কৃত হয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ -

—অর্থাৎ "ইবরাহীমের ধর্মনীতি হতে বিমুখ কে হবে? তবে যে নিজেকে জ্ঞানহীন ভাববে সে—"

আর ইমাম গাযযালীর গৃহীত ভাবার্থ পুস্তিকাটির পাঠকের নিকট স্পষ্টই জানা আছে। (মুফতি শাহ দীন)

১০. 'নাফস' (نَفْسٌ) শব্দটি আরবি ভাষায় একাধিক অর্থে সমানভাবে প্রয়োগ করা হয়। যেমন চোখ, সত্তা, রক্ত, অস্তিত্ব 'নাফস' বলা হয়। যার জন্য (إِصَابَةُ نَفْسٍ) বাক্য ব্যবহৃত হয়। আর আল্লাহ তায়ালার উক্তি ঃ

حَتّٰى تُسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ -

—(যতক্ষণ তোমরা তোমাদের নিজের প্রতি সালাম না করবে—) যেমন ফিকাহবিদগণ বলে থাকেন ঃ

مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ مَعْفُوٌّ -

(যার রক্ত প্রবাহিত নয় তা ধর্তব্য নয়—)। যেমন বলা হয় ঃ

نَفْسُ الشَّيْءِ فِى اللُّغَةِ وُجُوْدُهُ -

(কোনো কিছুর অস্তিত্বকে ওই বস্তুর দ্বারা (نَفْسٌ) সত্তা বুঝায়) প্রয়োগ দ্বারা প্রমাণ মিলে। রং, খানা পরিশোধনকরণ (دَبَاغَتْ جَرْمِ) ইত্যাদিকেও 'নাফস' বলে। অনুরূপ, নাফসে নাতিকা (نَفْسِ نَاطِقَةْ) অনুভবকারী মানসিকতাকেও 'নাফস' বলা হয়। যা অনুধাবনকারী, সম্বোধনোপযোগী, ভর্ৎসনার যোগ্য হয়। এসব অর্থেও نَفْسٌ নাফস-এর অর্থ প্রযোজ্য। আলোচনাধীন স্থানে বাহ্যতঃ এ অর্থই নেয়া হয়। যেমন ইমাম গাযযালী সাহেব বর্ণনা করে গেছেন। এখানে 'নাফস' বলতে চোখ, রক্ত ইত্যাদি বুঝায় না। (মুফতী শাহ দীন)

১১. আবু নায়ীম আবু হোরায়রাহ থেকে দালায়েল গ্রন্থে আর ইবনে আবু হাতিম, স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে আলোচনাধীন হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে শব্দরাজি এরূপ ঃ

اِنِّىْ كُنْتُ اَوَّلَ النَّبِيِّيْنَ فِى الْخَلْقِ وَاٰخِرَهُمْ فِى الْبَعْثِ -

—আমি সকল নবীদের প্রথম সৃষ্টিগতভাবে। আর তাদের সবার শেষ প্রেরিত হওয়ার ক্ষেত্রে। (মুফতী শাহ দীন)

১২. "আমি নবী ছিলাম, আদম যখন মাটি ও পানির মাঝে অবস্থান করতেন—" হাদীসটিকে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী মজবুত হাদীস বলেছেন। আর এর বর্ধিত অংশ ঃ

كُنْتُ نَبِيًّا فَلَا آدَمَ وَلَا مَاءٌ وَلَا طِيْنَ۔

(আমি যখন নবী ছিলাম তখন আদম ছিলেন না। পানি ছিল না। আর আল্লামা যারকানী লিখেছেন ঃ এ হাদীসটি এসব শব্দে হওয়ার ভিত্তি নেই। তবে তিরমিযি শরীফে আছে ঃ

مَتٰى كُنْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ : وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ ۔

প্রশ্ন করা হয় ঃ কখন থেকে আপনি নবী? তিনি বলেন, আদম যখন রূহ এবং দেহের মাঝখানে ছিলেন।

১৩. রূহ চিরন্তন (اَزَلِيٌّ) হওয়া সম্পর্কে মতামত

প্লেটো (اَفْلَاطُوْنَ) এবং কতিপয় সূফীরা রূহ (আত্মা) চিরন্তন (اَزَلِيٌّ) বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু তাঁদের এরূপ বলা বাতিল। কারণ, দেহসমূহের পূর্বে অধিক পরিমাণে রূহসমূহের বিদ্যমান থাকা অবান্তর। কারণ তখন তা বিভিন্ন আকারে হওয়ার জন্য কোনো কারণ নেই। অথচ, আধিক্য বিভিন্নতা এবং বৈচিত্র্যময় হওয়ার দাবি রাখে। আর তা একক সত্তারূপে থাকাও অবান্তর। কেননা, অধিক দেহের অস্তিত্ব থাকলে, সকল মানুষের আত্মা এক হওয়া বা প্রকৃত একক বস্তুর অধিক হওয়াও নিঃসন্দেহভাবে অবান্তর। কাজেই দেহের পূর্বে যখন রূহের অস্তিত্ব থাকা অবান্তর সাব্যস্ত হলো, তখন তা চিরন্তন (اَزَلِيٌّ) হলো না। বরং তা নব আবিষ্কৃত (حَادِثٌ) হলো। এ মত পোষণ করেন অধিকাংশ সূফী, মুসলিম দার্শনিক মহোদয় (مُتَكَلِّمِيْنَ) ফকীহগণ, ইশরাক ও মাশশাইন দার্শনিকগণ। তাঁরা বলেন ঃ রূহসমূহ (حَادِثٌ) তথা নব সৃষ্ট বস্তু এবং চিরন্তন। যা সদা সর্বদা (اَبَدِيٌّ) থাকবে। রূহ সদা সর্বদা

থাকবে বলে এর সহজ প্রমাণ হলো এই ঃ মানবাত্মা দেহের সম্পর্ক স্থাপন উঠিয়ে নিলেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। কেননা রূহ অস্তিত্ব অর্জনের পর অস্তিত্বহারা হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। আর যে বস্তু অস্তিত্বহারা হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না তার জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া অসম্ভব। আর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এজন্য রাখে না যে, যদি রূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে, তাহলে রূহ বর্তমান থাকার (بِالْفِعْلِ) কালেও নিশ্চিহ্ন হওয়ার জন্য সম্ভবতঃ (بِالْقُوَّة) যোগ্যতাসম্পন্ন পাত্র থাকবে। ফলে, কার্যত যা বর্তমান, স্বভাবগত দিক দিয়ে তা (بِالْقوة) নিশ্চিহ্ন অবর্তমান (مَعْدُوْمٌ) বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় কার্যতঃ (بِالْفِعْلِ) বর্তমান হওয়ার—প্রক্রিয়ার উৎস মূল (مَبْدَاءُ وُجُوْد) ভিন্ন হবে। আর স্বভাবগতভাবে (بالقوة) অবর্তমান হওয়ার উৎস মূল (مَبْدَاءُ عَدَمٌ) ভিন্ন হবে। অন্যথায় বাকি সবটাই বিনাশ সম্ভাবনাময় (كُلُّ بَاقِىٌ مُمْكِنُ كُلُّ مُمْكِنُ الْفَسَادِ) এবং সবটাই সম্ভাবনাময় বিনাশমুখী (الْفَسَاد بَاقِىٌ) সাব্যস্ত হবে। যা প্রকাশ্যেই নিশ্চিত বাতিল বলে প্রতিভাত। তাই যখন উভয় উৎসমূলই পরস্পর স্বতন্ত্র সাব্যস্ত হলো, তখন রূহ বিভিন্ন অণু দ্বারা গঠিত (مُرَكَّبٌ) হওয়া অবধারিত হয়ে যায়। আর রূহ বিভিন্ন উপাদানে গঠিত (مُرَكَّبٌ) হওয়া অবান্তর। তা, না হলে রূহ একই অবস্থায় জ্ঞাত (عَالِمٌ) এবং সে অবস্থায়ই অজ্ঞাত (جَاهِلٌ) হওয়া সাব্যস্ত হবে। বিষয়টি পূর্বে আলোচনায় এসেছে। কাজেই রূহ নিশ্চিহ্ন (ملزوم) হওয়াই অবান্তর হবে। কেননা অবধারিত (لَازِمٌ) বিষয় বাতিল হলে, যার জন্য অবধারিত হয় (مَلْزُوْمٌ) তাও বাতিল হয়ে যায়। (بُطْلَانُ لَازِمٍ مُسْتَلْزِمٌ بُطْلَانُ مَلْزُوْمٌ) অতএব, সাব্যস্ত হলো, মানবাত্মা সর্বদা (ابدى) থাকবে। বস্তুতঃ 'তাফসীর আযিযী' প্রণেতা স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ

اِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِاَبَدٍ وَّ اِنَّكُمْ لَتَنْتَقِلُوْنَ مِنْ دَارٍ اِلٰى دَارٍ -

অর্থাৎ তোমাদেরকে চিরকালের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা এক নিবাস থেকে অন্য নিবাসে স্থান বদলাতে থাকবে। এ তাফসীরও বর্ণিত তথ্যের সমর্থন করে। (মুফতী শাহ দীন)

১৪. ফিরিশতাদের শ্রেণিভেদ

সকল ফেরেশতার আলগ আলগ শ্রেণি রয়েছে। আর ফিরিশতাদের রূহ জীবাত্মার মাধ্যম ব্যতীত নিজ নিজ দেহে প্রভাব বিস্তার করে। এর ব্যতিক্রম হলো মানবাত্মা (رُوْحُ اِنْسَانِىْ) মানবাত্মা, জীবাত্মার মাধ্যমে দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যা ফিরিশতাদের রূহ থেকে মানুষের রূহ স্বতন্ত্র অবস্থানে পৃথক শ্রেণি (نَوْعٌ) হিসেবে গণ্য। অনুরূপ, উদ্ভিদ খনিজ সম্পদ এবং অন্যান্য জীবাত্মা থেকে মানবাত্মা সত্তাগত দিক দিয়ে (مَاهِيَّتٌ) স্বতন্ত্র। কেননা, মানবাত্মা, অর্থাৎ অনুধাবনকারী সত্তার (نَفْسٌ نَاطِقٌ) জ্ঞানগত বাস্তব তথ্যাদি অনুধাবন করার শক্তি আছে। আর মানবাত্মার পরিশুদ্ধি ও আবিলতার উপর নির্ভর করে মানুষের পুরস্কৃত (ثَوَابٌ) বা তিরস্কৃত (عِقَابٌ) হওয়ার যোগ্য হওয়া। আর এরই সম্পর্ক গড়ে উঠে দেহের সাথে জীবাত্মার মাধ্যমে। যেরূপ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এসব বৈশিষ্ট্য অন্যান্য আত্মার মাঝে পাওয়া যায় না। আর বলার অপেক্ষা রাখে না, অবধারিত বিষয়াদির স্বাতন্ত্র্য যার জন্য অবধারিত হয় তা তার স্বাতন্ত্র্যতার সৃষ্টি।

اِخْتِلَافُ لَوَازِمٍ مُسْتَلْزِمٌ اِخْتِلَافَ مَلْزُوْمَاتٍ كَوْهَوْ تَاهِىْ

অতএব, মানবাত্মার অবধারিত বিষয়াদির (لَوَازِمٌ-এর) স্বাতন্ত্র্যতা দ্বারা তার অন্য সব বস্তুনিচয়ের রূহ হতে সত্তাগতভাবে (مَاهِيَّتٌ গত) পৃথক হওয়া দিবালোকের চেয়েও পরিষ্কার।

যদি বলা হয় যে, উদ্ভিদসমূহে তো উদ্ভিদাত্মা তথা উদ্ভিদ শক্তি ব্যতীত অন্য কোনো অনুধাবনকারী আত্মা থাকে না। অনুরূপ পাথর ইত্যাদি মোটেই আত্মাসম্পন্ন নয়। অতএব, অনুরূপ, খনিজ ইত্যাদি দ্রব্যাদির কোনো আত্মা কি আছে? যা অবলম্বনে মানবাত্মার অবধারিত (لَوَازِمٌ) বিষয়াদির স্বাতন্ত্র্যতা এবং স্বাতন্ত্র্য সত্তাগত বৈপরীত্য সাব্যস্ত করা যাবে? এর প্রয়োজনই বা কী?

অতএব, এর উত্তর হলো, শরীয়তের সূত্রসমূহে ব্যাপকভিত্তিক কপি দ্বারা (حَدَّ تَوَاتُرْ) বৃক্ষাদি এবং পাথর ইত্যাদির নবীদের সাথে কথা বলা, নবীদের নির্দেশের অনুগামী হওয়া জানা যায়। যা দ্বারা জানা যায় যে, এসব পদার্থসমূহও রূহ তথা আত্মাবিশিষ্ট, অনুভূতিসম্পন্ন দ্রব্য। যেমন খেজুর বৃক্ষের (উস্তুয়ানাই হান্নানার) শব্দ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরহে কেঁদে ফেলেন। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাকে আদর করার পর চুপ করে যাওয়া। অনুরূপ হেরা পর্বতের উপর যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবুবকর, হযরত উমর, হযরত উসমান ও হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যোবায়েরসহ (আল্লাহ তাঁদের সবার প্রতি রাযী থাকুন—) অবস্থান করছিলেন তখন হেরা পর্বত খানিকটা নড়ে উঠে। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমে থেমে যায়। তিনি হুকুম দিয়ে বলেছিলেন ঃ থামো হেরা! কারা তোমার উপর অবস্থান করছেন পয়গাম্বর, সিদ্দীক, আর ক'জন শহীদ। এ নির্দেশে হেরা পর্বত থেমে গিয়েছিল। এ ঘটনা পাহাড়টির আত্মা সম্পন্ন এবং চেতনা সম্পন্ন হওয়াটা পরিষ্কার প্রমাণ করে। এছাড়া আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ -

অর্থাৎ সকলেই অবশ্যই জেনেছে তার নামাজ এবং তার তাসবীহকে—আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ -

যাবতীয় বস্তুই আল্লাহ তায়ালার প্রশংসায় তাঁর তাসবীহ পাঠ করে। অবশ্য তোমরা তাদের তাসবীহ পাঠ করাকে বোঝ না—।

এসব আয়াত দ্বারাও পরিষ্কার বোধগম্য হয় যে, প্রতিটি বস্তুর মাঝেই রূহ আছে। এখন যেহেতু উদ্ভিদ এবং খনিজ দ্রব্যাদিতে প্রাণ-আত্মা আছে বলে প্রমাণিত হলো, আর ফিরিশতাদের আত্মা আছে বলে শরীয়তে উল্লেখ আছে। আর ফিরিশতাদের ইবাদত করার নমুনা কী তারও বর্ণনা রয়েছে হাদীসসমূহে। যেমন তাবরানী হযরত জাবিরের রেওয়ায়াত উল্লেখ

করেছেন ঃ ফিরিশতাদের কেউ রুকুতে নিরত থাকেন। কেউ সিজদারত থাকেন। কেউ দাঁড়িয়ে ইবাদত করেন। কেউ বসে ইবাদত করেন। অনুরূপ, কোনো ফিরিশতাকে বিশেষ কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত রাখা হয়েছে বলে হাদীসগুলোতে বলা হয়েছে। তাই মানবাত্মার অর্থাৎ অনুধাবন মানসিকতার (نَفْس نَاطِقَة) অবধারিতব্য ব্যাপারাদির স্বতন্ত্রতার কারণে সত্তাগত স্বাতন্ত্র্যতা সাব্যস্ত হয় অন্যান্য আত্মাসমূহ থেকে। কেননা বৃক্ষাদি এবং পাথর জাতীয় বস্তুর সাথে যেসব রূহ থাকে ও সব ফিরিশতাদের রূহের মতো জীবাত্মার মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি নিজ নিজ দেহ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু পার্থিব জীবনে ওদের সার্বক্ষণিক সম্পর্ক বজায় থাকে না। পবিত্র আত্মার (نَفْس قُدْسِيَّة) শক্তিতে নিজ নিজ দেহের সাথে যখনই ওসবের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখন ওসব দেহাবয়ব দ্বারা অনুভূতিসম্পন্ন কার্যকলাপ এবং ইচ্ছাশক্তির উন্মেষ ঘটে। নফস-ই-কুদসিয়া (نَفْس قُدْسِيَّه) তথা পবিত্রাত্মা কর্তৃক শক্তি প্রদত্ত না হলে, কিছুই প্রকাশ পায় না। এজন্যই ওসবকে আত্মাহীন (غَيْر ذِى رُوْح) পদার্থ বলা হয়। কেননা সর্বদা ওসবের দ্বারা অনুভূতিশীল কার্যকলাপ প্রকাশিত হয় না। তবে পরকালে ওসবের নিজ নিজ দেহের সাথে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যাবে। এজন্যই পরকালে দেহগুলো সাক্ষ্য দিবে। যেমন, বৃক্ষের শাখাসমূহ এবং বেহেশতের ফল-ফলাদি বেহেশতীদের ডাকে সাড়া দিবে। বেহেশতীদের নির্দেশ মান্য করবে। ব্যতিক্রমী হলো মানবাত্মা, অর্থাৎ অনুধাবনকারী মানবীয় মানসিকতা (نَفْس نَاطِقَه)। পার্থিব জীবনে পবিত্রাত্মার (نُفُوس قُدْسِيَّة) শক্তির সাথে যোগদান ছাড়াই দেহের সাথে মানবাত্মার সম্পর্ক সর্বদা থাকছে। আর জীবাত্মা ইত্যাদির সাহায্যে দেহের সাথে সম্পর্ক রাখা উহারই অবধারিত বৈশিষ্ট্য (لَوَازِمَاتٌ)। আর অবধারিত বিষয়াদির স্বতন্ত্রতা সুস্পষ্ট প্রমাণ, যার জন্য তা অবধারিত হয় তার স্বাতন্ত্র্যতার।

মোটকথা হলো, ফিরিশতাদের রূহসমূহ ইত্যাদি যা জীবাত্মার মাধ্যম ব্যতীত নিজ নিজ দেহাবয়বের নিয়ন্ত্রক এবং প্রভাব বিস্তারকারী ওসব ভিন্ন সত্তাধারী বা শ্রেণিভুক্ত। আর মানবাত্মা অর্থাৎ স্বনির্ভর বোধসম্পন্ন জড়

পদার্থবিহীন। (مُجَرَّدْ) সত্তা, যা জীবাত্মা ইত্যাদির মাধ্যমে দেহ নিয়ন্ত্রক, তা ভিন্ন প্রকার সত্তা। আর স্বীয় সত্তার মৌলিক উপাদানগুলো (مَاهِيَّتْ) ওসব থেকে পৃথক এবং গুণাবলিতে ওসব থেকে স্বতন্ত্র। অনুরূপ, জ্বিন জাতির রূহগুলো। যা ওদের আগুন ও ধোঁয়ার উপাদানে গঠিত দেহের নিয়ন্ত্রক ও কর্তৃত্বকারী। তারা অবধারিত বিষয়াদির (لَوَازِمْ) বিভিন্নতার কারণে অনুধাবনকারী মানব মানস হতে (نَفْسِ نَاطِقْ) স্বতন্ত্র। আর অনুরূপভাবে অন্যান্য জীবকুলের রূহসমূহ হতেও স্বতন্ত্র, যা পরকালীন বিষয়াদি এবং জ্ঞানলব্ধ বাস্তব তথ্যাদি অনুধাবন করতে পারেন। এদের থেকে মানবাত্মার পৃথক হওয়াটা প্রকাশ্যভাবে অনুমেয়। (মুফতী শাহ দীন)।

১৫. দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক স্থাপনের পঞ্চ পর্ব

দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক পাঁচ প্রকার ঃ (১) ভ্রূণ অবস্থায় মায়ের উদরে চারমাস অতিবাহিত হলে শুক্রে যখন সমন্বয় আসে এবং পূর্ণ পরিচ্ছন্নতা এসে যায় তখন আল্লাহ্ তায়ালা উহার সাথে রূহের সম্পর্ক স্থাপন করে দেন।

(২) দ্বিতীয় পর্বে সম্পর্ক স্থাপিত হয় মায়ের উদর হতে বের হয়ে আসার পর। তখন প্রথম পর্ব অপেক্ষা দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক অধিক প্রকাশ পায়।

(৩) তৃতীয় প্রকার সম্পর্ক স্থাপিত হয় স্বপ্নে। তখন দেহের সাথে রূহের একদিকে বিচ্ছিন্নতা থাকে, অপরদিক দিয়ে থাকে সম্পর্ক।

(৪) চতুর্থ রূপ সম্পর্ক হয় বরযখ জগতে (عَالَمِ بَرْزَخْ)। (যা মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত) এ অবস্থায় যদিও বিচ্ছিন্নতা থাকে কিন্তু পরিপূর্ণভাবে বিচ্ছিন্নতা থাকে না। যার ফলে দেহের প্রতি রূহের সার্বক্ষণিক (اِلْتِفَاتْ) দৃষ্টি থাকবে না।

(৫) পঞ্চম প্রকার সম্পর্ক রোজ কিয়ামতে স্থাপিত হবে। তা হবে পরিপূর্ণ সম্পর্ক। (মুফতী শাহ দীন)

নবম অধ্যায়

লাওহ্-কলম বলতে কী বুঝায়?

'লাউহ্' (ফলক) বলতে এমন বস্তু বুঝায় যা ছবির রূপরেখা গ্রহণ করে। আর কলম এমন বস্তু বুঝায় যদ্বারা লাউহের উপর ছবিসমূহ আকার আকৃতি পরিগ্রহ করে। তাই কলমের সংজ্ঞা হবে, যা লাউহের মধ্যে জ্ঞাতব্য বিষয়াদির ছবি অঙ্কন করে। আর লাউহের বাস্তব রূপ সাব্যস্ত হবে, যা কলম কর্তৃক অঙ্কিত ছবি গ্রহণ করবে। অতএব কলম এবং লাউহের জন্য তা কাঠের বা বাঁশের হওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। বরং দেহবিশিষ্ট হওয়াও উভয়ের জন্য শর্ত নয়। তাই কলম এবং লাউহের উপাদানে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্তি নেই। বরং কলম এবং লাউহের হাকীকত তাই যা আমি উল্লেখ করে এসেছি। আর ঊর্ধ্বে যা আছে তা বাহ্যিক বিষয়, সার বিষয় নয়। আর এরূপ হওয়াও অসম্ভব নয়, আল্লাহ্ তায়ালার লাউহ্ কলম তাঁর হাত ও আঙ্গুলসমূহের উপযোগী হবে। হাত আর আঙ্গুলগুলো তাঁর সত্তা এবং উপাস্য হওয়ার অনুযায়ী হবে। দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মৌলিক উপাদান হতে বিমুক্ত হবে। বরং এসবই রূহানী স্বয়ংসম্পন্ন সত্তাধারী হবে। এর কোনোটি বাকসর্বস্ব (مُتَكَلِّمٌ)। যেমন লাউহ্। কোনোটি শিক্ষকের স্বরূপ। যেমন কলম। তাই আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন ঃ

اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ। -যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষাদান করেছেন।

এখন যেহেতু তুমি উভয় প্রকার অস্তিত্ব অবগত হয়েছ। জেনে নাও যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম প্রকার অস্তিত্বের দৃষ্টিতে আদম আলাইহিস সালাম-এর আগের ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় প্রকার অস্তিত্বের মাধ্যমে আদম আলাইহিস সালাম-এর আগের ছিলেন না। যা প্রকৃষ্ট এবং চাক্ষুষ অস্তিত্ব ছিল।

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ

মৃত্যুর সাথে কিয়ামত কায়েম হওয়ার অর্থ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ -

অর্থাৎ "যে মরল তার কিয়ামত শুরু হয়ে গেল—।"

হাদীসটি ইবনে আবিদ দুনইয়া হযরত আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য সূত্রটি দুর্বল। হাদীসটিতে বর্ণিত 'কিয়ামত' শব্দটি সীমিত অর্থে এসছে। তা দিয়ে ব্যাপক প্রলয় বুঝায় না। বিষয়টি আমি "এহইয়াউ উলূমিদ্দীন" কিতাবে সবিস্তারে 'সবর' অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণনা করেছি। বস্তুতঃ ব্যাপক প্রলয় তাই—যা সব কিছুকে ধ্বংস করে দেবে। আর তা আসার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট সুনির্দিষ্ট সময় আছে। যা বিশেষ রহস্যের কারণে মানুষের জন্য গোপন রাখা হয়েছে। রহস্যটা কী তা আল্লাহ তায়ালাই উত্তম জানেন। যদিও সকল সময়ই সমান কিন্তু কোনো কিছু কোনো নির্দিষ্ট সময়ের সাথে অস্তিত্ব লাভে যুক্ত থাকাটা জ্ঞানতঃ সম্ভব। মুসলিম দার্শনিকদের মতে (مُتَكَلِّمِيْنَ) তা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছানির্ভর। যেমন কোনো এক সময় জগত সৃষ্টি করাটা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছানির্ভর ব্যাপার। অথচ আল্লাহর ক্ষমতা এবং সত্তার সম্পর্ক দৃষ্টে সকল সময়ই সমান।

আর দার্শনিকদের মত দৃষ্টেও ব্যাপকভিত্তিক প্রলয় অসম্ভব বলে প্রতিপন্ন হয় না, কেননা দার্শনিকরা একমত যে, নব সৃষ্টির (حَادِثْ) উৎস মূল আকাশসমূহের বিচরণের এবং উহাদের বিভিন্নরূপ অবস্থানের মাঝে নিহিত। এজন্যেই সৌরজগতের এবং মর্ত-মণ্ডলের বস্তুনিচয়ের হুকুম এবং হাল অবস্থা বিচিত্র নয়। আর এরূপ কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে, প্রত্যেকটি সৌর অবস্থান এবং উহার বিবর্তনের সাথে উহার পূর্বাপর অবস্থান একই ধরনের হবে। বস্তুতঃ আকাশসমূহের অবস্থান একইরূপ হওয়াও দার্শনিকদের মতে নিশ্চিত নয়, দুর্বল ধারণা। বরং হতে পারে, এমন এক অবস্থান আত্মপ্রকাশ করবে যার দৃষ্টান্ত উহার পূর্বেও ছিল না, পরেও ছিল না। এজন্য কখনো কোনো কোনো অবস্থানের কারণে আজব

ধরনের পশুর আকৃতি পয়দা হয়, অনুরূপ যা কখনো হয়নি। আর এটাও অসম্ভব নয় যে, আকাশের অবস্থান তো পরস্পর সংগতিপূর্ণ হবে। আর তাদ্বারা যে আকৃতিগুলো প্রকাশ পাবে তা বিভিন্ন হবে। যেমন আমরা যদি পানিতে ঢিল ছুঁড়ে দেই তখন সেই পানিতে গোলাকার আকৃতি প্রকাশ পাবে।

আমরা যদি প্রথমে প্রকাশিত আকৃতি মুছে যাওয়ার পূর্বে আর একটি পাথর নিক্ষেপ করি তাহলে তা থেকে সৃষ্ট পানির আকার প্রথমে নাড়া পড়ার কারণে যে আকৃতি সৃষ্টি হয়েছিল তার অবিকল হওয়াটা অবধারিত হবে না। কেননা, প্রথম ঢিলটি শান্ত পানিতে পড়েছিল। আর দ্বিতীয় ঢিলটি পড়েছে নাড়া-পড়া পানির মধ্যে। অতএব, দ্বিতীয় ঢিল পতিত হওয়ার কারণে নাড়া-পড়া পানিতে যে আকৃতি প্রকাশ পাবে তা পূর্বে সৃষ্ট অনড় পানির আকার থেকে পৃথক হবে। এখানে কারণ একই প্রকার থাকা সত্ত্বেও আকারে বিভিন্নতা রয়েছে। কেননা, প্রথমটির কিছুটা প্রভাব দ্বিতীয়টির সাথে মিলে গেছে। এজন্যে অসম্ভব নয় যে, একটি নির্দিষ্ট অবস্থান একটি এমন সদৃশ বস্তুর বিকাশ ঘটাবে যা প্রথমটির থেকে পৃথক হবে। আর এরূপ হওয়াটাও অসম্ভব কিছু নয় যে, উহার অস্তিত্ব একেবারে নিত্য নতুন হবে যা উহার সদৃশ বিষয়টির মধ্যে ছিল না। আর এরূপ হওয়াও অসম্ভব নয় যে, বিগতটির প্রতিপত্তি অবশিষ্ট থেকে যাবে। আর পূর্বের যে অবস্থান বিলুপ্ত হয়ে পড়েছিল, উহার সদৃশ পরবর্তীতে উহার সাথে এসে যুক্ত হবে না। এমতাবস্থায় এরূপ অস্তিত্ব যা অপূর্ব দৃষ্টান্ত হবে, স্বীয় স্বতন্ত্র অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। যদিও উহার বিশেষ ধরনের অবস্থাদি পরিবর্তিত হতে থাকবে। অতএব, কিয়ামতের সময়টা তেমন আকারেই যা পূর্বের আকার প্রকার দৃষ্টে আশ্চর্যজনকভাবে নিত্যাকারের হবে। এর সকল রূহের একত্রিত অবস্থানের এটাই সার্বিক কারণ। যার প্রভাব যাবতীয় রূহের উপর ব্যাপক পড়বে। তাই কিয়ামতের আগমন এমন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট হলো যা জানা মানবীয় শক্তির বিষয় হতে পারে না। আর তা আম্বিয়াদের জানার ব্যাপারও নয়। কারণ আম্বিয়াদের 'কাশফ' (ঐশী-বোধ)ও তাঁদের যোগ্যানুপাতে হয়।

যখন কিয়ামত আসাটা অসম্ভব ব্যাপার বলে দার্শনিক ও তার্কিক শাস্ত্র মতে কোনোই প্রমাণ নেই। পক্ষান্তরে শরীয়তে স্পষ্টতঃ উহার প্রমাণ রয়েছে। এমতাবস্থায় উহার প্রতি বিশ্বাস রাখাটা অপরিহার্য হয়। এ ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করার হেতু নেই।

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ

দেহশূন্যাবস্থায় আত্মার অবস্থান

যে ব্যক্তি বলে যে, দেহ ব্যতীত রূহের অস্তিত্ব থাকতে পারে না, সে যদি কবরে দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক, অতঃপর, দেহ ও আত্মার বিচ্ছিন্নতা, পরে রোজ কিয়ামতে পুনরায় তা স্থাপিত হওয়াকে অস্বীকার করে তার ধারণা বাতিল হবে। কেননা, রূহের দেহশূন্য অবস্থান কঠিন নয়। বরং দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াই কঠিন। প্রশ্ন উঠে, দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক কীভাবে হলো? অথচ দেহের মাঝে রূহ প্রবিষ্ট হয়নি। যেমন পরিণতির বিষয়াদি (عَوَارِضْ) স্বনির্ভর বস্তুর جَوْهَرْ এর উপর নির্ভরশীল হয়ে প্রবিষ্ট হয়ে থাকে। কারণ, রূহ পরনির্ভরশীল নয়। বরং রূহ স্বনির্ভর সত্তা (جَوْهَرْ بِزَاتِ خُودِ)। অর্থাৎ তা অন্য কিছুর অস্তিত্ব নির্ভর না হয়ে, সরাসরি অস্তিত্ববান । আর স্বীয় সত্তা এবং বিশেষণাদি দ্বারা স্বীয় সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর গুণাবলি চিনে। আর রূহ এরূপ পরিচয় লাভের ক্ষেত্রে কোনো ইন্দ্রিয়াদির মুখাপেক্ষীও নয়। কারণ, রূহ যেসব ব্যাপারে জ্ঞাত তা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করার বিষয়বস্তু নয়।

মানুষ দেহের সাথে সম্পৃক্ত থাকা অবস্থায় নিজেকে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ানুভূতিভুক্ত বস্তুনিচয় থেকে অন্যমনস্ক করে রাখার সামর্থ্য রাখে। এমনকি আসমান যমিন হতেও নিজেকে অন্যমনস্ক করে রাখতে পারে। তাই এমন অবস্থায় নিজ সত্তা, তার অস্তিত্ব লাভে এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি স্বীয় মুখাপেক্ষী হওয়াকে জানে। অথচ কোনো ইন্দ্রিয়ভুক্ত বস্তুর প্রতি তখনকার চেতনা থাকে না। তবু ইন্দ্রিয়ভুক্ত বিষয়াদির অনুভূতিহীন অবস্থায় সে নিজেকে চিনে। বস্তুতঃ 'তাসাউফ' তথা সূফী সাধনার প্রারম্ভের স্তরে সাধনাকারী সূফীকে সর্বদা আল্লাহ তায়ালার যিকির করতে থাকা তাকে এমন অবস্থায় পৌছে দেয়, তার মন-প্রাণ থেকে এক আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় বস্তু গায়েব হয়ে যায়। বরং সে নিজেকেও ভুলে যায়। তার এমন মন মানসিকতায় এক আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞানগত বিষয়ের চেতনা থাকে না। আর এরূপ চেতনার অনুভূতিও থাকে না। বরং একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হয়ে যায়। কেননা

চেতনানুভূতিতেও আল্লাহর প্রতি অন্যমনস্কতা এসে যায়। বস্তুতঃ যে হক তথা চিরন্তন সত্যের পরিচয় লাভের জন্য নিজেকে সবকিছু থেকে নিমুক্ত (مُجَرَّدٌ) করে ফেলে, সে দেহ এবং দেহ কাঠামোর মুখাপেক্ষী কেন হতে যাবে? আর সে সরাসরি কখনো আত্ম-বিমিশ্রিত-বিমুখ হবে না। অথচ দেহ হলো ইন্দ্রিয়াদির বাহক এবং ইন্দ্রিয় গোচরীভূত বিষয়াদিকে-ই প্রত্যক্ষ করে থাকে। যে ব্যক্তি রূহের প্রকৃত স্বরূপ সত্তা এবং উহার স্বীয় জাতগত ভিত্তি জেনে নিয়েছে, তার জন্য দেহ হতে রূহের বিচ্ছিন্ন অবস্থান কঠিন মনে হবে না। বরং দেহের সাথে আত্মার লেগে থাকা কঠিন মনে হবে।

যার ফলে সে জানতে পারবে যে, দেহের সাথে আত্মার সংযোগের অর্থ হলো এটাই যে, দেহের উপর উহার প্রভাব বিস্তার এবং কর্তৃত্ব করা এবং দেহের নড়াচড়া করা আল্লাহর দ্বারা ঘটে থাকে। যেমন আঙ্গুলের নড়াচড়া করা ইচ্ছার নাড়া দেয়ার দ্বারা বুঝে আসে। অথচ সে নিশ্চিত জানে যে, ইচ্ছা আঙ্গুলের নেই। কিন্তু দেহ ইচ্ছার করায়ত্তে। অতএব এরূপ করায়ত্তের উৎপত্তি এবং বিলুপ্তি এবং পুনঃপ্রবর্তিত হওয়া সম্ভব। জ্ঞান এর কোনোটাই অসম্ভব মনে করে না। এটা হতে পারে যে, করায়ত্ত হওয়া (تَسْخِيْرٌ) ফিরে আসা বা তা অপসারিত হওয়ার নানা কারণ থাকতে পারে। তা ফিরিশতাদের দ্বারা বা আকাশের অবস্থান দ্বারা, বা আত্মিক চেতনা দ্বারা হতে পারে। যাকে মানব শক্তি সম্যকভাবে আয়ত্তে আনতে পারে না। অতএব, এসব কারণে শরীয়তে দেহ হতে আত্মা বিচ্ছিন্ন হওয়া, পুনরায় ফিরে আসার ব্যাপারে যে তথ্য এসেছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ ঃ মীযান

১৬. মীযান-এর উপর ঈমান আনা অপরিহার্য। কেননা যেহেতু রূহের সত্তাগত অস্তিত্ব এবং তা দেহের মুখাপেক্ষী না হওয়া সাব্যস্ত, তাই রূহ নিজেই বস্তুসমূহের সারবত্তা আবিষ্কার করার যোগ্যতা রাখে। আর মৃত্যুর পর রূহের আবরণ উন্মোচিত হয়ে যাবে। আর যাবতীয় বস্তুর আসল রূপ রূহের জানা হয়ে যাবে। এজন্যে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ -

অর্থাৎ ঃ এখন খুলে দিয়েছি তোমার সম্মুখ থেকে তোমার আবরণ। তাই আজ তোমার চোখ সতেজ—। সে সব বস্তু উহার সামনে থেকে দূরত্ব সৃষ্টির ব্যাপারে উহার আমলের প্রভাব এবং ওসবের নিদর্শনাদির পরিমাণ হবে। যদিও সব নিদর্শনাদির মধ্যে পরস্পরের প্রভাবসমূহের ব্যাপারে তফাত থাকবে। আর আল্লাহ তায়ালা শক্তি রাখেন, তিনি এমন কারণ সৃষ্টি করে দেবেন যদ্বারা সৃষ্টিকুল এক মুহূর্তের মধ্যে নৈকট্য ও দূরত্বের ব্যাপারে নিজেদেরই আমলের তাসীরের পরিমাণ জানতে পারবে। অতএব, মীযানের সংজ্ঞা হবে ঃ তা এমন এক বস্তু যদ্বারা কম ও বেশি বুঝা যায়। আর প্রত্যক্ষ জগতে তার দৃষ্টান্ত প্রচুর। তার মধ্যে চাক্ষুস রয়েছে দাঁড়িপাল্লা। যদ্বারা ভারি বস্তু মাপা হয়। আর আসমানের গতি এবং সময় নির্ণয়ের জন্য পরিমাপ যন্ত্ররূপে রয়েছে মানমন্দিরে স্থাপিত 'উসতুরলাব' (OSTORLAB)।

এক ধরনের পরিমাপ যন্ত্র হলো যদ্বারা রেখাসমূহের পরিমাপ করা হয়। যাকে মিসতার (مِسْتَرُ) বলে। এক ধরনের পরিমাপের বিদ্যা হলো যাকে ইলমে উরূয (علم عُرُوض) বলা হয়। যদ্বারা অক্ষরসমূহের জের, জবর, পেশ, সাকিন ইত্যাদির অবস্থানগত পরিমাপ করা হয়। পদ্য সাহিত্যে এর প্রয়োগ হয়। এক প্রকার বিদ্যাগত মাপ বিদ্যার নাম (مُوسِيْقِى) যন্ত্র সংগীত। যাদ্বারা সুরসমূহের উঠানামার পরিমাপ করা যায়। মোট কথা হলো, আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাখলুকদের জন্য প্রকৃত পরিমাপ যন্ত্র নির্ণয় করবেন। উল্লিখিত যে কোনোরূপ পরিমাপ যন্ত্র তিনি বেছে নিতে পারেন। বা অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারেন। বস্তুতঃ মীযান (পরিমাপ যন্ত্র) হওয়ার জন্য যা কিছুর আবশ্যক উল্লিখিত পরিমাপ পদ্ধতিতে তার প্রকৃত স্বরূপ বিদ্যমান রয়েছে। আর তার সারমর্ম হচ্ছে ঃ যদ্বারা বেশ-কম হওয়ার পরিমাণ করা যায় তা হলো মীযান আর তার আকার। আকার ধারণ করার সময় চাক্ষুস এবং দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের সময় ধারণায় উপস্থিত থাকে। আর আল্লাহ তায়ালাই জানেন, ইচ্ছা হলে প্রকৃত মীযানকে তিনি চাক্ষুস রূপ দিবেন। বা দৃষ্টান্ত স্বরূপে ধারণাপ্রসূত আকার দান করবেন। তাঁর ক্ষমতা অসীম। এসব ব্যাপারে ঈমান আনা অপরিহার্য।

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ ঃ হিসাব প্রসঙ্গ

আমলের হিসাব-নিকাশ গ্রহণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। কারণ হিসাবের অর্থ হলো বিভিন্ন পরিমাণ একত্রিত করা। আর তার সীমা-পরিসীমা অবগত হওয়া। আর এরূপ কোনো মানুষ নেই, যার জন্য বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপ (আমল) ফলদায়ক ও ক্ষতিকারক সাব্যস্ত না হবে। আল্লাহর অনুগ্রহের নিকটবর্তী বা তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার কারণ না হবে। আর এসবের সমষ্টিগত পরিমাপ কী হবে তা বিস্তারিত জানা সম্ভব নয়, এসবের এককভাবে গণনা করা ব্যতীত। যখন বিভিন্ন এককসমূহকে একত্রিত করা হবে, এসবের সম্যক জ্ঞান অর্জন করা হবে, তাকেই হিসাব গ্রহণ বলা হবে। আর এটা তো জানাই আছে যে, আল্লাহ তায়ালা এক পলকের মাঝে বিভিন্ন আমল এবং এসবের প্রভাবাদির সীমা পরিসীমা প্রকাশ করে দিতে সক্ষম। কেননা তিনি তড়িৎ হিসাব নিতে পারেন।

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ ঃ শাফায়াত

১৮. শাফায়াত করার প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য। শাফায়াত দ্বারা একপ্রকার নূর বুঝায়। যা আল্লাহ তায়ালার দরবার থেকে নবুয়তের সত্তামূলে আলো বিকিরণ করবে। অতঃপর নবুয়তের সত্তামূল থেকে সেই নূর ছড়িয়ে পড়বে এমন সব রত্ন রাশির প্রতি যাদের নবুয়তের সত্তামূলের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় থাকবে। আর তা থাকবে তাঁর সাথে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অধিক ভালোবাসা অথবা অধিক করে সুন্নাতের অনুসারী হওয়ার দরুন। অথবা অধিক করে যিকির করার কারণে যার সাথে থাকবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ। এর দৃষ্টান্তগুলো সূর্যের আলোর ন্যায়। যখন সূর্যের আলো পানির মধ্যে পতিত হয়, তখন তা থেকে দেয়ালের বিশেষ অংশে আলো প্রতিবিম্বিত হয়। সমস্ত দেয়ালের গায়ে তা প্রতিফলিত হয় না। আলোর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হওয়ার জন্যই স্থানটুকু নির্দিষ্ট এজন্যে হয় যে, অবস্থান দৃষ্টে পানির মধ্যে এবং ওই স্থানটুকুর মধ্যে এক প্রকার সামঞ্জস্যতা রয়েছে। যা

দেয়ালের অবশিষ্টাংশের নেই। আর দেয়ালটিতে নির্দিষ্টভাবে প্রতিবিম্ব পড়বে সেখানেই যেখান থেকে সূর্যের আলো পড়া পানির দিকে সরল রেখা টানা হলে যমিনে ওই রেখার কারণে এমন কোণ সৃষ্টি হয় যা পানিতে ওই কোণের সমান্তরালে সূর্যের প্রতিচ্ছবির দিকে রেখা টানলে হয়। তা উহা থেকে বড়ও হবে না, ছোটও হবে না। এটা বিশেষ স্থানেই হবে। যেরূপ স্থানগত সমান্তরালে থাকার কারণে আলো প্রতিবিম্বিত সুনির্দিষ্ট হওয়ার কারণ হয়। অনুরূপ জ্ঞানলব্ধ অশারীরিক বিষয়াদির সাথে সত্তাধারী অশারীরিক (جَوَاهِر مَعْنَوِيَّة) বিষয়াদির সামঞ্জস্যতা উহাতে আলো প্রতিফলিত হওয়ার কারণ হয়। বস্তুতঃ যে ব্যক্তির মধ্যে তাওহীদ বলিষ্ঠ থাকবে তার সম্পর্ক তো আল্লাহ তায়ালার সাথে মজবুত হবেই। তার প্রতি সরাসরি আল্লাহর দরবারে নূর চমকাবে। আর যে ব্যক্তির উপর রাসূলই মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতসমূহের অনুকূল এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার মহব্বত প্রবল থাকবে আর তার মাঝে তাওহীদের তাত্ত্বিক জ্ঞান অবলোকন দৃঢ়তা থাকবে, তার আল্লাহ প্রেম তো মাধ্যম অবলম্বনেই দৃঢ় হয়ে থাকে। তাই সে নূর হাসিল করার জন্য উছিলারই (অবলম্বন) মুখাপেক্ষী হবে। যেমন যে দেয়াল সূর্যের আলোর আড়ালে থাকে, সে দেয়াল পানির মাধ্যমের মুখাপেক্ষী হয়। আর যা সূর্যের সামনে থাকে তা সরাসরি সূর্যের আলো পায়।

অনুরূপ দুনিয়াতেও শাফায়াত হয়। যেমন একজন মন্ত্রী যিনি বাদশাহর নিকট নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হয়। আর বাদশাহর সুদৃষ্টির বিশেষ পাত্র হন। তখন বাদশাহ যে তাঁর উজিরের বন্ধুদের অপরাধ ক্ষমা করে দেন তার কারণ বাদশাহ এবং উজিরের বন্ধুদের মধ্যে সম্পর্ক সূত্র নয়; বরং তার কারণ হলো, তারা বাদশাহর উজিরের বন্ধু। উজিরের সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে। আর উজির বাদশাহর সাথে সম্পর্ক রাখেন। তাই বাদশাহর অনুগ্রহ ওই উজিরের মাধ্যমে হলো। তাদের তরফের কোনো সম্পর্কের কারণে হয়নি। যদি মধ্যখানে উজিরের মাধ্যম না হতো, তাহলে তাদের প্রতি বাদশাহর অনুগ্রহ হতো না। কেননা, বাদশাহ উজিরের বন্ধুদের এবং উজিরের সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্কে এজন্যেই অবগত হলেন যে, উজির তাদের প্রশংসা এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার প্রতি আগ্রহশীল। তাই প্রশংসাসূচক শব্দে উজিরের বচন এবং

উজিরের আগ্রহের প্রকাশকে রূপক অর্থে 'শাফায়াত' বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে শাফায়াতকারী হচ্ছে বাদশাহর নিকট উজিরের পদমর্যাদা। আর সুপারিশের শব্দ তো হলো উদ্দেশ্য প্রকাশের জন্য। বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা প্রশংসার মুখাপেক্ষী নন। বাদশাহ যদি উজিরের পদমর্যাদার সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্কের বিষয় অবগত থাকতেন তাহলে সুপারিশ করার জন্য বাক্য ব্যয়ের কোনো প্রয়োজন হতো না। তখন ক্ষমা, শব্দহীন শাফায়াতের দ্বারাই হতো। আর আল্লাহ তায়ালা বিশেষ সম্পর্কের খবর রাখেন। যদি তিনি নবীদেরকে শাফায়াত করার জন্য শব্দ প্রয়োগের অনুমতিও প্রদান করেন আর শব্দগুলো কী হবে তিনি তা জানেন তখন তাদের (নবীদের) শব্দসমূহ শাফায়াতকারীদের মর্যাদা অনুযায়ীই হবে। যদি আল্লাহ তায়ালা শাফায়াতের প্রকৃত স্বরূপ (حَقِيْقَتْ) কোন ইন্দ্রিয়গোচর বা ধারণায় আসতে পারে এমন আকারে রূপান্তরিত করতে চান, তাহলে তার দৃষ্টান্ত শব্দাকারে হবে। যে শব্দ শাফায়াত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর হাদীসসমূহে এসেছে, যে ব্যাপারাদি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সম্পর্কিত যেমন রাসূল-ই মকবুলের প্রতি দরূদ পাঠ করে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা তাঁর মুবারক কবর যিয়ারত করা, মুয়াজ্জিনের আযানের উত্তর প্রদান করা, বা আযান শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জন্য দোয়া চাওয়া এবং এছাড়া আরও অনেক কাজ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এবং তাঁর প্রতি আত্মিক সংযোগ (مُنَاسِبَتْ) সুদৃঢ় হয়।

পাদটীকা

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ ঃ মীযান

১৬. মীযান (مِيْزَانٌ) পরিমাপ নিয়ন্ত্রক

আল্লাহ তায়ালার অধিকার আছে তিনি রোজ কিয়ামতে প্রকৃত 'মীযানকে' (পরিমাপ নিয়ন্ত্রককে) প্রসিদ্ধ দাঁড়িপাল্লায় রূপদান করতে পারেন। আর আমলনামাসমূহকে (কর্ম তালিকা) বা নেক ও বদ কর্মগুলোকে কাঠামোতে রূপান্তরিত করে উহাতে উঠিয়ে ওজন করে

দেখিয়ে দেবেন। অথবা প্রকৃত মীযানকে অন্য কোনো চাক্ষুষ বা ধারণায় আসে এমন কিছু রূপদান করে প্রকাশ করবেন। যা দ্বারা সকলেই নিজ নিজ আমলসমূহের প্রভাব এবং ওসবের পরিণতির নিদর্শনাদির পরিমাপ অনুমান করতে পারবে। অতএব, শরীয়তে যেহেতু মীযান আছে বলে সাব্যস্ত যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ بِالْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا -

আর কিয়ামতের দিন ইনসাফ করার নিমিত্তে মীযানাদি স্থাপন করব। ফলে কোনো প্রাণীর উপর বিন্দুমাত্র অন্যায় করা হবে না। তা মীযান থাকবে বলে পরিষ্কার বুঝায়। আর জ্ঞানের দিক থেকে তা থাকার সম্ভাবনা প্রকাশ্যে অনুমেয়। এ জন্যে মীযান-এর প্রতি বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য।

(মুফতী শাহ দীন)

উস্তরলাব ঃ বিশ্লেষণ

১৭. উস্তরলাব

সৌর জগতের গতিবিধি পরিমাপ যন্ত্র। এ যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রের উচ্চতা, প্রাতঃকাল, উদয় অস্তকাল, বিগত সালের শুরু দ্বারা আগত সালের শুরু কবে তা জানা যায়। দিবার মধ্যক্ষণ, উদয়, অস্ত, দিক নির্ণয় ইত্যাদি বিষয় জানা যায়। (মুফতী শাহ দীন)

বিশ্লেষণ ঃ শাফায়াত

১৮. শাফায়াত পাঁচ প্রকার ঃ

শরীয়তে আল্লাহ তায়ালার দরবারে শাফায়াত (সুপারিশ) করার প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا -

অর্থাৎ, "সেদিন শাফায়াত উপকারে আসবে না। তবে যাকে শাফায়াত করার অনুমতি প্রদান করেন দয়াময় আল্লাহ। আর তিনি যার কথা পছন্দ করবেন।" এছাড়া আরও বহু আয়াত এবং অনেক হাদীস দ্বারা শাফায়াত প্রমাণিত হয়। যা বস্তুতঃ পাঁচ প্রকার ঃ

(১) সাধারণের জন্য হিসাব গ্রহণ তরান্বিত করার জন্য শাফায়াত। এটাকে শাফায়াতে 'আম্মা' সকল উম্মতের জন্য শাফায়াত বলা হয়। যা শুধু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করতে পারবেন।

(২) দ্বিতীয় প্রকার শাফায়াত হলো, কিছুসংখ্যক লোকজনকে বিনা-হিসাবে জান্নাত দানের শাফায়াত। এরূপ শাফায়াতও একমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করতে পারবেন। এটা তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্যই খাস।

(৩) তৃতীয় প্রকার শাফায়াত হলো, ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে যাদের জন্য দোযখে যাওয়ার উপযুক্ত কারণ থাকবে, তাদের জন্য শাফায়াত। এ শাফায়াত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং যাদেরকে শাফায়াত করার যোগ্য বলে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করবেন তারা করবেন। এরূপ শাফায়াতের ফলে যাদের জন্যে শাফায়াত করা হবে তারা দোযখে প্রবেশ করা হতে অব্যাহতি পাবেন।

(৪) চতুর্থ প্রকার শাফায়াত হবে দোযখ থেকে বের করে আনার জন্য শাফায়াত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ফিরিশতাগণ এবং অন্যান্য মুমিনগণ এমন শাফায়াত করবেন। এমন তথ্য বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

(৫) পঞ্চম প্রকার শাফায়াত হবে বেহেশতবাসীদের দরজা বুলন্দ করে দেয়ার জন্য শাফায়াত। পক্ষান্তরে, কাফিরদের সম্পর্ক ঈমান না থাকার কারণে, আল্লাহ তায়ালার দরবারের সাথে কোনোই সম্পর্ক নেই এবং নবুয়তের মূল সত্তা (جُوهرِ نبوتِ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেও নেই।

তাই কাফিরদের প্রতি সরাসরি বারগাহে ইলাহী থেকে আল্লাহর নূরের বিকাশ প্রতিফলিত হয় না। আর নবুয়তের সত্তামূলের মাধ্যমে তাদের উপর নূরের বিকাশ হয় না। এজন্য রোজ কিয়ামতে আযাব থেকে কাফিররা নিষ্কৃতি পাবে না। আর তাদের জন্য কারো শাফায়াতও গ্রহণ করা হবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ -

অতঃপর শাফায়াতকারীদের শাফায়াত তাদের কোনো উপকার সাধন করবে না। আরও বলেছেন ঃ

مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ -

"থাকবে না কেউ ওসব জালিম গুনাহগারদের জন্য বন্ধু। এবং থাকবে না শাফায়াতকারী কেউ, যার কথা মানা যাবে।"

(মুফতী শাহ দীন)

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ

১৯. দরূদ, যিয়ারতে রাওজা মুবারক, শাফায়াত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ -

(مسند احمد بروایت رویفع رضہ)

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি মুহাম্মদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি দরূদ পাঠ করবে এবং বলবেঃ হে আল্লাহ! তুমি তোমার সন্নিকটে বসার আসনে তাঁকে (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) উপবেশন করিও রোজ কিয়ামতে। তার জন্য আমার শাফায়াত অবধারিত হয়ে যাবে।

(হাদীসটি মসনাদে আহমাদে বর্ণিত। হযরত রুওয়ায়ফি (রাঃ) তা বর্ণনা করেছেন।)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ (ابن ابى الدنيا بروايت ابن عمر رضه بسند ضعيف)

অর্থ ঃ যে আমার কবর যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হবে।

(ইবনে উমরের দ্বারা হাদীসটি বর্ণিত। ইবনু আবিদ্দুনিয়া দুর্বল সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন।)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

(بخارى بروايت جابر بن عبد الله)

অর্থ ঃ আযান শোনার সময় যে বলবে ঃ হে আল্লাহ! মালিক এই পরিপূর্ণ আহ্বানের এবং আসন্ন নামাযের, দান কর মুহাম্মদকে সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াসীলা এবং শ্রেষ্ঠত্ব। আর তাঁকে উঠাও প্রশংসিত স্থানে। যার তুমি ওয়াদা করেছ। .... তার জন্য আমার শাফায়াত কিয়ামতের দিন বৈধ হয়ে যাবে।

(হাদীসটি জাবীর ইবনে আবদুল্লাহ হতে বুখারী বর্ণনা করেছেন।)

অনুচ্ছেদ ঃ পুলসিরাত

২০. পুলসিরাত ঃ কুরআন মজিদের এ আয়াত দ্বারা পুলসিরাতের প্রমাণ হয় ঃ

فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ -

অর্থাৎ ওদেরকে জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দাও। আর ওদেরকে দাঁড় করিয়ে রাখ, তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। অধিকাংশ মুতাজিলা মতবাদের লোকেরা বলে যে, পুলসিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। যদি তা সম্ভবও হয় তা হবে মুমিনদের জন্য আযাব। এর উত্তর হলো, পুলসিরাত সম্ভবপর হওয়া এবং পুলসিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করে যাওয়ার ব্যাপারটা কোনো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কেননা যে আল্লাহ্ তায়ালা পানির উপর চালাতে পারেন; আর পাখিগুলোকে হাওয়ায় ভর করে উড়াতে পারেন; তিনি এরূপ পথ (পুলসিরাত) রচনা করে দিতে পারেন যার উপর দিয়ে মানুষকে চলার ব্যবস্থা করে দেবেন। তিনি মুমিনদের জন্য উহার উপর দিয়ে অতিক্রম করাটাকে সহজ করে দিতে পারেন। অতএব, যেহেতু জ্ঞানের দৃষ্টিতে পুলসিরাত অসম্ভব ব্যাপার নয়, আর শরীয়তে উহার পরিষ্কার প্রমাণ রয়েছে, উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। (মুফতী শাহ্ দীন)

দশম অধ্যায়

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ ঃ পুলসিরাত প্রসঙ্গ

পুলসিরাতে বিশ্বাস রাখা সঠিক। বলা হয় যে, পুলসিরাত চুলের মতো সরু। এটা পুলসিরাতের লঘুর ব্যাখ্যা। কেননা পুলসিরাত চুলের চেয়েও সরু। উহার চুলের সাথে কোনো তুলনা চলে না। যেমন সরু হওয়ার ব্যাপারে জ্যামিতির রেখার অবস্থান। যা ছায়া এবং রোদের মাঝখানে অবস্থিত। তা ছায়াও নয়, রৌদ্রও নয়। চুলের সাথে উহার কোনো সামঞ্জস্য নেই। পুলসিরাতের সরু হওয়াও জ্যামিতির রেখার ন্যায় সূক্ষ্ম। যার কোনো ব্যাস নেই। বস্তুতঃ তা 'সিরাতুল মুস্তাকীম'-এর দৃষ্টান্ত। যা সরু হওয়ার দিক দিয়ে জ্যামিতির সরল রেখার ন্যায়। 'সিরাতুল মুস্তাকীম' (সোজা পথ) বিপরীত চরিত্রসমূহের মধ্যে প্রকৃত মধ্য অবস্থানে রয়েছে।

যেমন, অপচয় এবং কৃপণতার মাঝখানে রয়েছে, বদান্যতার প্রকৃত অবস্থান। আর চরম উষ্মা তথা ক্রোধান্বিত শক্তি প্রদর্শন (تَہَوُّر) এবং ভীরুতার মাঝখানে রয়েছে, বীরত্ব ২১. (شَجَاعَت) অপব্যয় এবং সংকোচনের মাঝখানে রয়েছে মিতব্যয়িতা। অহংকার এবং নীচতা ও হীনতা বরণের মাঝখানে রয়েছে বিনয়, বিনম্রতা। উগ্র যৌনাচারণ এবং যৌনবিমুখতার মাঝখানে রয়েছে পবিত্র জীবনযাপন। যাকে 'ইফফাত' ২২. (عِفَّت) বলা হয়। কেননা, উল্লিখিত গুণাগুণসমূহের দুটি দিক রয়েছে। এক, অতিরঞ্জিত দিক। দুই, ত্রুটিপূর্ণ দিক। এ উভয় দিকই নিন্দনীয়। অতিরঞ্জন এবং ত্রুটিকরণের মধ্যখানে রয়েছে মধ্য অবস্থান। আর মধ্য অবস্থানটি উক্ত দুটি দিক থেকে সর্ব প্রান্তে অবস্থিত। আর তা হলো মধ্যবর্তী আচরণ। যার মধ্যে অতিরঞ্জন নেই। নেই ত্রুটি। যেমন রৌদ্র এবং ছায়ার মাঝখানে বিভাজনকারী রেখা থাকে। তা ছায়ার মধ্যেও শামিল নয়, রৌদ্রের মধ্যেও শামিল নয়। এ বিষয়টির বাস্তব প্রয়োগের নমুনা হলো এই যে, মানুষের কর্তৃত্ব হলো ফিরিশতাদের সাথে সাম

সাপূর্ণ হওয়া। ফিরিশতারা পরস্পর বিরোধী, উপরে বর্ণিত গুণাগুণসমূহ হতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক। পক্ষান্তরে, মানুষ উক্তরূপ সংঘাতময় গুণসমূহ হতে পৃথক হওয়ার শক্তিই রাখে না। এজন্যে মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকার জন্য নির্দেশিত (مكلف) হয়েছে। আর সে মধ্যবর্তী অবস্থান হলো ওসব হতে আলগ থাকা।

অর্থাৎ আলগা থাকার ইচ্ছা করে যখন হাজার হাজার ব্যক্তিকে হাজার হাজার স্থানে একই অবস্থায় দেখার ইচ্ছা করে, তখন তাদেরকে বিভিন্ন স্থানে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী প্রত্যক্ষ করতে পারবে। পক্ষান্তরে, বাস্তবে উপস্থিত বস্তু একই স্থানে দেখা যাবে। আর আখেরাতের বিষয়টি এরূপে বুঝে নিতে হবে যে, তাতে অনেক প্রশস্ততা রয়েছে। এবং তাতে বহুবিধ পরিপূর্ণ কামনা থাকবে। আর পরকাল যাবতীয় কামনা অনুযায়ী হবে। অধিকন্তু তা শুধু অনুভূতিতে থাকা এবং বাস্তবে না থাকা বিন্দুমাত্র উহার মর্যাদা খাট করবে না। কারণ তা বাস্তবে থাকার উদ্দেশ্য হলো স্বাদ গ্রহণ করা। বস্তুতঃ স্বাদ পাওয়া যায় অনুভূতি গোচর অস্তিত্বের দ্বারা যার অস্তিত্ব অনুভূতি গোচর হবে তার স্বাদ পরিপূর্ণভাবে আহরণ করা যাবে। আর অবশিষ্ট বিষয় বাস্তবে বিরাজমান হওয়াটা হলো অতিরিক্ত ব্যাপার। যার কোনো প্রয়োজন করে না। মূলতঃ বাস্তবে পাওয়া যাওয়াটা এজন্যে আবশ্যক হয় যে, তা উদ্দেশ্য হাসিল করার পন্থা। আর তা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পন্থা একমাত্র এ দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ। যা অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং খাট। পক্ষান্তরে, পরকালে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবস্থাপনা থাকবে। এজন্য শুধুমাত্র একটি পন্থা থাকবে না।

আর তৃতীয় কারণ অর্থাৎ জ্ঞান গ্রাহ্য স্বাদ (لَذَّاتِ عَقْلِى) সম্ভবপর হওয়াও অস্পষ্ট নয়। কেননা এটা অবধারিত যে, ইন্দ্রিয়গোচর এসব কিছু জ্ঞানগত স্বাদসমূহের দৃষ্টান্ত হতে পারে, যা ইন্দ্রিয়গোচর নয়। কারণ জ্ঞানগ্রাহ্য বিষয়াদি নানা প্রকার হয়। তাই ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়াদি জ্ঞানগ্রাহ্য বিষয়াদির দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত হয়। আর ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়াদির প্রত্যেকটি ওই জ্ঞানগ্রাহ্য স্বাদের ন্যায় হবে, যেমন যার মর্যাদা জ্ঞানগ্রাহ্য স্বাদের সমান হবে।

যেমন কেউ স্বপ্নে দেখল, সবুজ তরিতরকারি এবং পানি প্রবাহিত হচ্ছে। আর মনোরম নহরগুলো দুধ এবং মধুতে এবং শরাবে পরিপূর্ণ হয়ে

আছে। বৃক্ষাদি মূল্যবান রত্নাদি, প্রবাল ও মতি, মতি দ্বারা সজ্জিত রয়েছে এবং প্রাসাদগুলো সোনা ও রূপার তৈরি। যার প্রাচীরসমূহ মূল্যবান রত্নাদি দ্বারা সাজানো। আর এক রকম সেবকগণ তার আশপাশে দণ্ডায়মান। এখন স্বপ্নের ব্যাখ্যাদাতা যদি তার বর্ণনা দেন তাহলে স্বাদ এবং আনন্দের দ্বারাই দেবেন। আর ওসব ওকে এক প্রকারের উপর সদৃশ মনে করবেন না। বরং প্রত্যেকটিকে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের ও আনন্দের ব্যাখ্যা দেবেন। এর কোনোটা দ্বারা জ্ঞানের স্বাদ এবং কোনোটা দ্বারা বিষয়াদির ঐশী-ইঙ্গিত, কোনোটা দ্বারা রাজত্ব করার আনন্দ, কোনোটি দ্বারা শক্তি পরাভূত হওয়া আর কোনোটি দ্বারা বন্ধু-বান্ধবের সাক্ষাৎ লাভ মনে করবেন। যদিও এসবের নামকরণ করবেন স্বাদ ও আনন্দ দ্বারা। কিন্তু এসব শ্রেণিগতভাবে এবং স্বাদের দিক দিয়ে বৈচিত্র্যময়। প্রত্যেকটির স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন। জ্ঞানলব্ধ স্বাদও অনুরূপ মনে করতে হবে। যদিও ওসব জ্ঞানলব্ধ স্বাদ না চোখে দেখা যায়, না কর্ণ দ্বারা শোনা যায়, আর না কোনো মানবের অন্তরে তার ধারণা সৃষ্টি হয়। হতে পারে এক ব্যক্তির জন্য এসব স্বাদ অর্জিত হবে। আবার এরূপও হতে পারে যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী তার ভাগী হবে। অতএব যে ব্যক্তি অনুকরণ প্রিয় হবে, তার ছবিতেই সদৃশ হওয়া বিকাশ লাভ করবে যা প্রকৃত পথের পৃথক হয়ে যাওয়া নয়।

যেমন সামান্য গরম পানি; যা ঠাণ্ডাও নয় গরমও নয়। বরং নাতিশীতোষ্ণ। আর যেমন কাঠের রং। যা কালোও নয় সাদাও নয়। অতএব, কৃপণতা এবং অপব্যয় মানুষেরই বিশেষণ। যে এ দুটির মাঝখানে চলবে তাকে বলা হবে বদান্য ব্যক্তি। এরূপ ব্যক্তি অপব্যয়ী হয় না, আবার কৃপণও হয় না ! বস্তুতঃ সোজা পথ (সিরাতে মুস্তাকীম) হলো উভয় প্রান্তিক অবস্থানের মধ্য চরিত্রের নাম। যা কোনো দিকেই আকৃষ্ট নয়। আর তা হচ্ছে চুলের চেয়েও সরু। প্রকৃতপক্ষে যা উভয়ের প্রান্তিক অবস্থানের সর্বশেষ দূরত্বের দাবি রাখে, তা মধ্য স্থলেই হতে হবে। যেমন লোহার গোলাকার রিং, যা আগুনে গরম করা হয়েছে। তার মধ্যে যদি একটি পিপীলিকা পড়ে যায়—যা স্বভাবতঃই গরম হতে পালায়—এখন পিপীলিকাটি কেন্দ্রস্থলেই অবস্থান করবে। কারণ গরম বেষ্টনি হতে প্রান্তিক দূরত্ব কেন্দ্রস্থলেই হবে। আর সে কেন্দ্রটি একটি বিন্দু। যার কোনো ব্যাস নেই। অতএব সিরাতিল মুস্তাক্বিম দু'দিকের মধ্যস্থল হলো। যার কোন ব্যাস নেই এবং চুলের চেয়েও সরু। এ জন্যে উহাতে অবস্থান

করা মানুষের জন্য অসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেকেরই স্বীয় ঝোঁক অনুযায়ী দোযখের আগুনের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন ঃ

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا -

"তোমাদের সকলকেই উহার মধ্যে অবতরণ করতে হবে—।"

আর এজন্যেই আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন ঃ ২১.

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ -

"আর তোমরা চাইলেও স্ত্রীদের মধ্যে সমতা আনতে পারবে না। অতএব তোমরা পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়বে না।"

এর কারণ হলো দুই স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা এবং মাঝখানে এমন অবস্থান গ্রহণ করা যে, উভয় স্ত্রীর মধ্যে কারো প্রতি অধিক আকর্ষণ থাকবে না—কী করে সম্ভবপর? যখন তুমি বিষয়টি অনুধাবন করতে পারলে, তাহলে জেনে নাও, যখন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য কিয়ামতে সিরাতিল মুসতাক্বিমকে যার জ্যামিতির রেখার ন্যায় ব্যাস নেই—স্বরূপে প্রকাশ করবেন তখন সকল মানুষকে উহার উপর সোজা দৃঢ়ভাবে চলার জন্য বলা হবে। ফলে যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সোজা পথে দৃঢ়ভাবে থেকেছে এবং অতিরঞ্জন ও ত্রুটি হতে বেঁচে চলেছে, অর্থাৎ কমও করেনি, বেশিও করেনি। উভয় দিকে ঝুঁকে পড়েনি। সে পুলসিরাতের উপর দিয়ে সোজা অতিক্রম করে যাবে। কোনো দিকেই ঝুঁকে পড়বে না। কেননা, দুনিয়াতে তার অভ্যাস ছিল কোনো দিকে ঝুঁকে পড়া থেকে বেঁচে থাকা। তাই এ অভ্যাস তার স্বভাবগত গুণে পরিণত হয়েছিল। বস্তুতঃ আদত যাদের স্বভাব হয়ে যায়। তাই সে পুলসিরাতের উপর দিয়ে সোজা চলে যাবে এবং পুলসিরাতের কথা অকাট্যভাবে হক বলে সাব্যস্ত। যা শরীয়তে আছে।

পাদটীকা ঃ বীরত্ব

(شَجَاعَتْ) (বীরত্ব) تَبُوْرْ (চরম শক্তি প্রয়োগ) جُبْنْ (কাপুরুষতা) ঃ ক্রোধ বাস্তবায়নে মধ্য পন্থাবলম্বন করাকে বীরত্ব (شُجَاعَتْ) বলে। তা এরূপে হয় যে, মানুষ এমন কর্ম করবে যা শরীয়তে কল্যাণকর এবং সৎকর্ম হয়। আর সীমাহীন ক্রোধকে 'শক্তির অপব্যবহার' তথা (تَبُوْرْ) বলে এবং যথাস্থানে শক্তির ব্যবহার না করে অন্যায়রূপে প্রকাশ পায়, এরূপ দুঃসাহসকে 'তাবুর' বলে। আর ক্রোধ প্রকাশে অনীহা প্রদর্শনকে কাপুরুষতা 'জুবন' (جُبْنْ) বলে। যা অযথা ভয়াকারে দেখা দেয়।

২২. "ইফ্‌ফাত" (عِفَّتْ) সৎজীবন। যৌন চাহিদার ন্যায়ানুগ প্রয়োগকে 'ইফফাত' বা সৎজীবন বলা হয়। যে বিষয়াদিতে শরীয়তের অনুমতি রয়েছে সে বিষয়াদিতে যেন প্রবৃত্তি প্রলুব্ধ হয়। যৌন চাহিদার অবৈধ আধিক্যকে বলা হয় পাপাচার বা ফুজুর (فُجُوْرْ)। আর তা প্রতিফলিত হয় শরীয়ত গর্হিত পাপ কাজে আত্মনিয়োগ করলে। আর যৌন চাহিদার শূন্যতাকে বলা হয় 'যৌন অনীহা' 'খুমুদ' (خُمُوْدْ)। বৈধ ভোগ-বিলাস এবং পবিত্র তৃপ্তিদায়ক কামনা পূরণে অনাগ্রহের দরুন 'যৌন অনীহা' সৃষ্টি হয়।

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ

আল্লাহতে বিশ্বাস, ফিরিশতা, ঐশীগ্রন্থ, রাসূল ও আখিরাতে ঈমান প্রসঙ্গে

তুমি যে আল্লাহ তায়ালার প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর নাযিলকৃত গ্রন্থাদির প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান আনয়নের প্রমাণ জানতে চেয়েছ, এ বিষয়টি যারা জানে না তাদের সাথে নাতিদীর্ঘ আলোচনা প্রয়োজন। আর যারা জ্ঞাত ব্যক্তিবর্গ তাদের

জন্য সংক্ষেপে বলাই যথেষ্ট। কেননা, তুমি যখন নিজেকে নবসৃষ্টি (حَادِثْ) 'হাদিস' বলে জ্ঞান রাখ অর্থাৎ পূর্বে ছিলে না, নতুন পয়দা হয়ে এসেছ। আর একথাও জান যে, যা কিছু নব সৃষ্টি তা সবই অস্তিত্ব লাভে অন্যের মুখাপেক্ষী। এতে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের প্রমাণ তুমি জানতে পেরেছ। আর এ দু'বিষয়ের জ্ঞান অর্জন বোধগম্য হওয়ার অতি নিকটতম। তার একটি হলো 'নবসৃষ্টি' হওয়া।

দ্বিতীয়টি হলো, নবসৃষ্টি নিজেই অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। স্বীয় অস্তিত্ব অর্জনে অন্যের প্রত্যাশী হয়। যখন তুমি নিজে স্বীয় সত্তাকে এরূপ চিনতে পেরেছ যে, তুমি এমন একটি অস্তিত্ব যা আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান (مَعْرِفَتْ) এবং ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয়াদির পরিচয় অর্জন করা তোমার বৈশিষ্ট্য। আরও জ্ঞাত হয়েছ যে, দেহ তোমার সত্তার বাস্তব রূপায়ণে মূল উপাদান নয়। আর দেহ বিনাশ হয়ে গেলে তোমার অস্তিত্ব বিলুপ্তি হয়ে যায় না। এখন তুমি পরকাল দিবস (يَوْمِ اٰخِرَتْ) অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের দলীল একই সাথে জেনে নিলে। কেননা, বিগত আলোচনা দ্বারা এটাই সাব্যস্ত হলো যে, তোমার জন্য দুটি দিবস রয়েছে। একটি বর্তমান দিবস। যেখানে তুমি দেহ নিয়ে ব্যস্ত। আর অন্য দিবস হলো পরকাল। যেখানে তুমি এই দেহ হতে আলগা হয়ে যাবে। কারণ যখন তোমার অস্তিত্ব দেহনির্ভর নয়, আর তুমি মৃত্যুবরণ করার মাধ্যমে এ দেহ হতে বিদায় নিলে, তখনই পরকালের সূচনা হয়ে গেল। আর যখন তুমি জানতে পারলে যে, তুমি দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুনিচয় হতে আলগ হয়ে গেছ, এখন তুমি আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ পরিচয় দ্বারা পুরস্কৃত হবে যা তোমার সত্তার বৈশিষ্ট্য। আর আসল স্বভাব চাহিদানুযায়ী যা তোমার স্বাদ নেয়ার শেষ পর্যায়। তবে শর্ত হলো মনের গতি প্রবৃত্তির চাহিদাসমূহের প্রতি ঝুঁকে না। অথবা আল্লাহ তায়ালা থেকে অমনোযোগী হওয়ার করণে এবং তোমার কামনা-বাসনার শেষ সীমা অন্তরালে থাকার দরুন আযাবে নিপতিত হবে। যে অন্তরায় তোমার এবং তোমার উদ্দেশ্যের মাঝখানে বাধা হয়ে থাকবে। আর তুমি তো জান যে, আল্লাহর পরিচয় লাভের (মাআরিফতের) উপায় উপকরণ হচ্ছে যিকির ফিকির এবং আল্লাহ ছাড়া যাবতীয় বিষয় হতে বিমুখ হয়ে থাকা। আর যে ব্যক্তি

আল্লাহর পরিচয় লাভের পথে বাধা হয়, তা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হলো প্রবৃত্তির কামনা এবং পার্থিব লোভ। আর এটাও জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাধারণ বান্দাদেরকে 'কাশফ'-এর মাধ্যমে তাঁর পরিচয় দান না করারও ক্ষমতা রাখেন—যেরূপ তিনি তাঁর খাস বান্দাদেরকে দান করে থাকেন। আর একথাও তোমার জানাই আছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে অর্থাৎ খাস বান্দাদেরকে 'কাশফ'-এর মাধ্যমে পরিচয় দান করেছেন। এখন তুমি প্রমাণসহ রাসূলগণের পরিচয় অর্জন করতে পারলে।

আর একথাও জানা আছে যে, নবী-রাসূলগণকে পরিচয় শব্দরাজি এবং পাঠদানাকারে অর্পিত হয়ে থাকে। এবং তাঁদেরকে 'ওহী' করে তা শোনানো হয়। তাঁরা চাই ঘুমিয়ে থাকুক বা জাগ্রত থাকুক। এখন এ বিবরণ দ্বারা তোমার জন্য আল্লাহর গ্রন্থের প্রতি ঈমান অর্জিত হয়ে গেল। আর তুমি যখন জেনে নিলে যে, আল্লাহ তায়ালার কার্যকলাপগুলো দু'প্রকার। এক প্রকার কার্য হলো যা তিনি সরাসরি করেন। অন্য প্রকার কাজ হলো তিনি যা মাধ্যমসহ অবলম্বন করেন। আর মাধ্যমসমূহের স্তর নানাপ্রকার হয়ে থাকে। নিকটতম মাধ্যম হলো তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থানকারীগণ (مُقَرَّبِيْنَ)। তাঁরা হলেন ফিরিশতাকুল ২৫.।

ফিরিশতাদের পরিচয় প্রমাণ দ্বারা হয় না। আর এ বিষয় দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। তাছাড়া রাসূলদের বাস্তবতা যা তুমি দলীল প্রমাণের দ্বারা অবগত হয়েছ, তাঁদের খবরই ফিরিশতাদের বাস্তব অস্তিত্বের জন্য যথেষ্ট প্রমাণ। তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাক। কেননা, এটাও ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনের পর্যায়সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ـ

অর্থাৎ তোমাদের যাদেরকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদার উচ্চতম স্তরে উন্নীত করবেন—।

পাদটীকা

নশ্বর সৃষ্টির জন্য

২৩. নশ্বর সৃষ্টির জন্য অবিনশ্বর স্বয়ম্ভর সৃষ্টিকর্তা আবশ্যক ঃ তুমি নিজে নশ্বর, নবসৃষ্টি (حَادِثٌ)। অনুরূপ জগতের সকল বস্তুই নশ্বর। কেননা জগত স্বয়ং পরিবর্তনশীল। আর যাবতীয় পরিবর্তনশীল বস্তু নবসৃষ্টি যা নশ্বর। যখন নব সৃষ্টি নশ্বর বস্তু সৃষ্টি হলো, তখন তা অবশ্যই সৃষ্টিকারী কর্তার প্রত্যাশী হবে। আর নশ্বর নবসৃষ্টি উদ্ভাবনকারী স্বয়ং নশ্বর হন না। বরং তিনি অবিনশ্বর স্বয়ম্ভর হন। যাকে (قَدِيْمٌ وَّاجِبُ الوجود) বলা হয়। কারণ সৃষ্টিকর্তাকে যদি নশ্বর ধরা হয়, তখন তিনিও কোনো সৃষ্টিকর্তার মুখাপেক্ষী হবেন। আর দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তাও অপর তৃতীয় সৃষ্টিকর্তার মুখাপেক্ষী হবেন। এরূপে পরস্পর অসংখ্য সৃষ্টিকর্তা হতে থাকবেন। বস্তুতঃ যা পর পর হতেই থাকবে তা অর্জিত হওয়া অসম্ভব। যদি তা অর্জিত হয়ে যায় তখন তো যা সাব্যস্ত করে নেয়া হয়েছিল, (অর্থাৎ অসীম হওয়া) তার বিপরীত সাব্যস্ত হবে। তা অবান্তর হবে। কেননা, যা অসংখ্য হওয়ার শর্তে অর্জিত হবে, তখন তা গণনার আওতায় এসে যাবে। আর যে কোনো সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। যার ফলে যে বস্তু গণনায় আসবে তাও দ্বিগুণ হবে। যখন তা দ্বিগুণ হলো, তা থেকে যা ডবল হবে, তা থেকে অধিক হবে। যে পরিমাণে অধিক হলো তা তদপেক্ষা কম পরিমাণের সমাপ্তির পর বের হয়। এমতাবস্থায় যখন পরস্পরাগত অসংখ্য বলে মেনে নেয়া বস্তু কম হলো, তখন তা সমাপ্ত হলো। যখন তা সমাপ্ত হলো তখন আর অসীম রইল না। অথচ উহাকে অসীম বলে ধরে নেয়া হয়েছিল। অতএব, অবধারিতভাবে সাব্যস্ত হলো যে, জগত সৃষ্টিকর্তা পরনির্ভর সত্তা বা নশ্বর হতে পারে না। তাঁকে স্বয়ম্ভর অবিনশ্বর হতে হবে। যাকে (وَاجِبُ الْوُجُوْد) বলে। আর তিনি হলেন আল্লাহ তায়ালার সত্তা। যাঁর প্রতি ঈমান রাখা অপরিহার্য। (মুফতী শাহ দীন)

২৪. নবী (আঃ)-দের প্রতি ঈমান আনার যৌক্তিক ভিত্তি

নবী-রাসূলদের প্রয়োজন আছে বলে ব্রাহমাদ দার্শনিকগণ (بَرَاهِمَة) দ্বিমত পোষণ করেন। তারা বলেন যে, জ্ঞান থাকা অবস্থায় নবী-রাসূলগণের কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা বলি ঃ পরকালে যে সব কার্য দ্বারা অবশ্যই নাজাত পাওয়া যাবে তা জ্ঞান প্রয়োগে আনা যায় না। আর স্বতন্ত্রভাবে নেক ও বদ আমলের কারণে প্রতিদান ও আযাব হওয়ার বিস্তারিত বর্ণনা জ্ঞান দ্বারা জানা যায় না। অনুরূপ কোনো কাজ নেক হওয়া বা বদ হওয়ার ব্যাপারটি নবী-রাসূলের মাধ্যম ছাড়া শুধু জ্ঞান দ্বারা জানা যায় না। এজন্যে আমাদের পার্থিব কল্যাণ এবং পরকালে নাজাত লাভের জন্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সরাসরি অন্য কোনো মানুষ ব্যতীত শুধু কাশফ (ঐশীসূত্রে) সূত্রে বোধ দান করেছেন এবং নবুওয়াতের সত্যায়নের জন্য অলৌকিক সম্মানাদি (মুজিযা) দান করেছেন। তারা ফায়দা দিবে একথা দিবালোকের চেয়েও পরিষ্কার। যখন নবীদের আগমন ফলদায়ক বলে প্রকাশ্যে জানা গেল এবং অলৌকিক ঘটনাবলি দ্বারা তাঁদের সত্যায়নের ব্যাপার সুসাব্যস্ত হলো, তাই পরকালীন নাজাত অর্জন করার জন্য নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য। (আবু হাসান, মুফতী শাহ দীন)

২৫. ফিরিশতাদের ব্যাপারে দার্শনিকদের বিশ্বাস সাকুল্যেই বাতিল এবং শরীয়তের বিপরীত। কেননা তাঁরা প্রথমতঃ দেহযুক্ত স্বয়ম্ভর সত্তাসমূহকে (جَوَاهِر مُجَرَّدَه) অর্থাৎ দশ প্রকার জ্ঞানকে (عُقُول عَشَرَه) দশটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন। দ্বিতীয়তঃ তারা বস্তু সত্তাধারী বিষয়াদির সাথে এ সবের সম্পর্ক আবিষ্কার করে থাকেন। তাঁরা আল্লাহ তায়ালা হতে প্রথম জ্ঞান (عَقْل اَوَّل) অবধারিতভাবে প্রকাশিত মেনে নিয়ে প্রথম আসমান এবং দ্বিতীয় জ্ঞান (عَقْل ثَانِىْ) এর জন্য এটাকে

আবিষ্কারক (مُوْجِدْ) সাব্যস্ত করেন। আর দ্বিতীয় আসমানের এবং তৃতীয় জ্ঞানের (عَقْلِ ثَالِثْ) প্রবর্তক মনে করেন। এরূপ তাঁরা দশটি জ্ঞান (عَقْلْ) সাব্যস্ত করেন। তাঁরা দশম জ্ঞানকে (عَقْلِ عَاشِرْ) অধিক ক্রিয়া সম্পাদনকারী জ্ঞান (عَقْلِ فَعَالِ) বলেন। আর আসমানের নিচের চন্দ্রের জন্য উহাকে প্রবর্তক বলেন। এখন সাব্যস্ত করার জন্য বহুরকম দুর্বল যুক্তি পেশ করে থাকেন। যার দুর্বলতা অপ্রকাশ্য নয়।

আর দার্শনিক ইবনে হাযম ফিরিশতাদেরকে দেহহীন আত্মা বলেছেন। আর মুতাকাল্লিমীন তথা ইসলামি দার্শনিকগণ আলোময় দেহ (نُوْرَانِى اَجْسَامْ) বলেছেন। বিশুদ্ধ মত এটাই। ফিরিশতাগণ দেহ রাখেন তা আলোময় দেহ (اَجْسَامْ نُوْرَانِىْ)। ফিরিশতাদের দৃষ্টিগত আমল আকার আদম সন্তানদের আকারে নয়। কেননা আদমের আকৃতি যাবতীয় সৃষ্টিকুলের আকৃতি হতে পৃথক। আর তা অত্যন্ত সুন্দর আকার। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ -

নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করেছি উত্তম কাঠামোতে। আয়াতটি এর উপর সাক্ষ্য প্রদান করে। আল্লাহ তায়ালার কালামের আয়াত দ্বারা বার্তাবাহক ফিরিশতাদের প্রকৃত স্বরূপ ডানা সর্বস্ব বলে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

جَاعِلُ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا اُولِىْ.......مَثْنَىٰ وَثُلٰثَ وَرُبَاعَ -

অর্থাৎ ফিরিশতাদেরকে করেছেন বার্তাবাহক দুই, তিন, চার ডানাবিশিষ্ট। এ আয়াতও উক্ত বক্তব্য প্রমাণ করে। তবে আল্লাহ তায়ালা ফিরিশতাদেরকে মানুষ এবং অন্যদের আকার ধারণ করার শক্তিদান করেছেন। যেমনটি তিনি উদ্ভিদ-এর ব্যতিক্রম, পশুকুলকে আকার এবং অবস্থান পরিবর্তন করার শক্তিদান করেছেন। জীবেরা দাঁড়ান অবস্থায় যে আকার ধারণ করে, বসা অবস্থাতে তা বদলে যায়। আর আল্লাহ তায়ালা ফিরিশতাদের ন্যায় জ্বিনসমূহের আকার বদল করার শক্তি দিয়েছেন। কিন্তু

যেহেতু জ্বিন ও শয়তানদের দেহ অগ্নি ও বায়ু-নির্যাস গঠিত, তাদের মধ্যে প্রবৃত্তির কামনা এবং রুষ্টতাও বিদ্যমান, এজন্যে এদের পানাহার এবং সঙ্গম করার প্রয়োজন রাখা হয়েছে। ফিরিশতারা এর ব্যতিক্রম। তারা পাপাচারমুক্ত মাসুম। আর তারা পানাহার এবং সঙ্গম করার প্রয়োজন বিমুক্ত। ফিরিশতাদেরকে রূহানী অশারীরিক, মালাইকা এবং আত্মা ও খোদায়ী ব্যবস্থাপনা সম্পাদনকারী মালাকুত (مَلَكُوْتٌ)-ও বলে। আর ফার্সী ভাষায় ফিরিশতাকে সরূস (سَرُوْشٌ) হিন্দীতে দেবতাও বলা হয়। (মুফতী শাহ দীন)

একাদশ অধ্যায়

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ

জান্নাতের স্বাদ এবং সুখভোগ প্রসঙ্গ

ইন্দ্রিয় স্বাদ যা জান্নাতে পাওয়া যাবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। যেমন হুর (অতীব সুন্দরী নারী), পানাহার ও পরার জন্য এবং ঘ্রাণ নেয়ার জন্য নানা প্রকার জিনিস পত্রাদি। এসবে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। কেননা, এসব অসম্ভব কিছু নয় বরং তা সংগৃহীত হওয়া সম্ভব। আর এসবের সম্ভবপরতা বিশ্বাসে আনার তিনটি দিক রয়েছে। হয়তো এসব স্বাদ সামগ্রী ইন্দ্রিয়গোচরে আসবে বা ধারণাপ্রসূত হবে, জ্ঞানগ্রাহ্য হবে। ইন্দ্রিয়গোচরীভূত স্বাদ তো প্রকাশ্য ব্যাপার। যেমন এ জগতে তা হতে পারে, অনুরূপ তা পরকালেও হতে পারে। কারণ পরকালে আত্মাসমূহকে দেহে ফিরিয়ে দেয়ার পরই এসব স্বাদ পাওয়া যাবে। আর আত্মা দেহে ফিরে আসা সম্ভবপর হওয়ার প্রমাণ বিদ্যমান আছে। তা দ্বারা এসব ইন্দ্রিয়গোচর স্বাদসমূহ সম্ভব বলে সাব্যস্ত হয়। আর কোনো স্বাদ যা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, যা উপভোগ করার প্রতি মানসিকতা খুব বেশি আকৃষ্ট হয় না—যেমন দুধ সেবন, রেশমি বস্ত্র পরিধান করা, কলাগাছ যার ফলগুলো স্তরে স্তরে সাজানো—বেহেশতে উক্তরূপ স্বাদ সংগৃহীত হওয়ার জন্য বাধা নেই। কারণ, এসবের স্বাদ তাদের জন্য হবে, যাদের এসবের প্রতি অধিক প্রয়োজন ও আগ্রহ থাকবে। বস্তুতঃ বেহেশতে যার মনে যা চায় তাই আছে। আর এসব তারাই চাইবেন, যাদের মধ্যে নিত্য নতুন চাহিদা পয়দা হবে। আর যারা এসব কামনা করবে না, যারা তদ্বারা স্বাদ পাবে না, তাদের মধ্যে নতুন করে কামনা সৃষ্টি করে দেয়া হবে। কেননা, স্বাদ উপভোগ কামনানুযায়ী হয়ে থাকে। যেমন, সঙ্গম করার তাড়না না থাকলে স্বাদ অনুভব হয় না, বরং অনিচ্ছার উদ্রেক করে। তাই আল্লাহ তায়ালা কামনা সৃষ্টি করেছেন। আর তা পূরণের জন্য তদনুযায়ী স্বাদ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সাক্ষাতের মজা তারাই অনুভব করতে পারেন, যাদের জন্য আল্লাহ ইচ্ছা করেন। সকলে তা অনুভব করতে পারে না, যদিও বাহ্যতঃ সকলেই তা স্বীকার করে। কেননা, সকলের মধ্যে যখন আল্লাহর

পরিচয় (مَعْرِفَتْ) নেই, তখন তাঁকে দেখার আগ্রহও থাকবে না। ফলে আল্লাহ দর্শনে স্বাদও পাবে না। কিন্তু কিয়ামতের দিন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাদের আগ্রহ, ভালোবাসা এবং পরিচয় আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দেবেন। ফলে, আল্লাহ তায়ালার দীদারের স্বাদ তাদের নিকট বড় হয়ে উঠবে।

আর ধারণাপ্রসূত স্বাদের সম্ভাবনা কোনো অবোধগম্য ব্যাপার নয়। যেমন স্বপ্নে তার পরিচয় মিলে। তবে, ফারাক শুধু এতটুকু যে, স্বপ্নের স্বাদ দ্রুত সমাপ্ত হয়ে যায়। সে কারণে নগণ্য মনে হয়। যদি তা স্থায়ী হতো, তখন ইন্দ্রিয় স্বাদ এবং ধারণাপ্রসূত স্বাদের মধ্যে কোনো তফাৎ থাকত না। কেননা, মানুষ স্বাদ অনুভব করে ঐসব অবস্থায়, যখন ধারণায় এবং ইন্দ্রিয় চেতনায় তা রেখাপাত করে। শুধু বাস্তব অস্তিত্বের দরুন স্বাদ অনুভব করে না। যদি এসবের আকার বাস্তবে রূপান্তরিত হয়, আর ইন্দ্রিয় চেতনায় রেখাপাত না করে, তাহলে স্বাদ অনুভূত হবে না। যদি আকার ইন্দ্রিয় চেতনায় অঙ্কিত থাকে তা স্থায়ী থাকে, আর বাস্তবে তা পাওয়া যায়, তখন স্বাদ স্থায়ী থাকে। আর ধারণা শক্তির এজগতে নানাপ্রকার ছবি রচনা করার অর্থাৎ নবরূপ আবিষ্কার করার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু উহার নব আবিষ্কৃত ছবিসমূহে শুধু ধারণাই থাকে। তা প্রকাশ্যে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয় না। আর তা চোখের দৃষ্টি শক্তিতেও অঙ্কিত হয় না। এজন্য যদি ধারণা শক্তি অত্যন্ত উত্তম ছবিও আবিষ্কার করে, আর ক্ষীণতর ধারণা পোষণ করে যে, তা তার প্রত্যক্ষ হচ্ছে তার সামনে উপস্থিত আছে, তখন এরূপ ধারণাপ্রসূত ছবির স্বাদ বড় কিছু হয় না। কারণ এরূপ ছবি চোখে দেখা যায় না। যেমন স্বপ্নের ব্যাপারে দেখা যায় না। আর ধারণা শক্তি যেরূপ কল্পনায় ছবি আঁকার শক্তি রাখে, অনুরূপ যদি তা দৃষ্টি শক্তিতেও অঙ্কিত করার শক্তি রাখত, তাহলে এরূপ ছবির স্বাদ বেড়ে যেত। আর এরূপ কল্পনার ছবি বাস্তব ছবির স্থানে উপনীত হতে পারত।

বস্তুতঃ দুনিয়া এবং আখিরাতে ছবি অঙ্কিত হওয়ার মাঝে তেমন কোনোরূপ পার্থক্য হবে না। মাত্র এতটুকু তফাৎ থাকবে যে, আখিরাতে দৃষ্টি-শক্তিতে ছবি অঙ্কিত হওয়ার পরিপূর্ণ শক্তি এসে যাবে। তাই মন যা চাইবে, তা ধারণায় উপস্থিত হয়ে যাবে। আর ধারণায় আসাটাই তা চোখে দেখে ফেলার কারণ হবে। অর্থাৎ তা দৃষ্টি-শক্তিতে অঙ্কিত হয়ে যাবে। আর যখনই কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ জাগ্রত হবে আর ধারণা

করবে, তখনই তা এমনভাবে উপস্থিত হয়ে যাবে যেন তা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। রাসূল-ই কারীমের উক্তিতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ سُوقًا يُبَاعُ فِيهِ الصُّوَرُ ـ

অর্থাৎ "অবশ্যই জান্নাতে ছবি বেচাকেনার বাজার বসবে।" এখানে বাজার বলতে আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ বুঝানো হয়েছে। যা হবে সেই শক্তির উৎসমূল, যদ্বারা ইচ্ছানুযায়ী ছবি আবিষ্কৃত ও তার আত্মপ্রকাশ ঘটবে এবং দৃষ্টি শক্তিতে তা অঙ্কিত হবে। আর যতক্ষণ ইচ্ছা বলবৎ থাকবে, ততক্ষণ স্থায়ী হবে। অর্থাৎ যতক্ষণ আল্লাহ্ চাইবেন, তা স্থায়ী থাকবে। এমনভাবে অঙ্কিত হবে না যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিলীন হয়ে যায়। যেমন দুনিয়ায় স্বপ্নে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তা বিলীন হয়ে যায়। আর এ শক্তি যার বিবরণ উপরে দেয়া হয়েছে, তা ইন্দ্রিয়গোচর বাস্তবে দৃষ্টি করার শক্তি অপেক্ষা অধিক পরিপূর্ণ এবং ব্যাপক। কেননা ইন্দ্রিয়গোচর বাস্তবে যা পাওয়া যায় তা একাধিক স্থানে পাওয়া যায় না। আর যখন কোন কিছু শুনতে থাকে বা দেখতে থাকে নিবিষ্টচিত্তে তখন অন্য কিছু অবগতির অন্তরালে থেকে যায়। আর আখিরাতে ধারণার ক্ষেত্রে অনেক অবকাশ রয়েছে। এখানে কোনোরূপ সংকোচন বা কোনোরূপ বাধা নেই। এমনকি, যদি কোনো বস্তু দেখায় মগ্ন থাকবে, এবং বাস্তবতার দ্বার যার জন্য উন্মুক্ত হয়নি, তার জন্য ছবিই সাদৃশ্যরূপে চিত্রিত করা হবে। বস্তুতঃ তত্ত্ববিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ (عارف) যাঁরা ছবি জগৎ এবং ইন্দ্রিয় গোচর স্বাদের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেন তাঁদের জন্য জ্ঞানগত আনন্দ এবং স্বাদ গ্রহণের সূক্ষ্মতম দ্বার খুলে দেয়া হবে। যা তাঁদের মর্যাদা এবং কামনার জন্য উপযুক্ত হবে। কেননা, বেহেশতের সংজ্ঞাই হলো, উহাতে যে যা চাইবে, উপস্থিত পাবে। যখন কামনা-বাসনা বৈচিত্র্যময়, তাহলে প্রতিদান এবং স্বাদও বৈচিত্র্যময় হওয়াটা অবান্তর হবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তায়ালার ক্ষমতা অসীম। আর মানবীয় সামর্থ্য আল্লাহ্ তায়ালার ধারণাতীত রহস্যময় বিষয়াদি সম্যকভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাখে না। আর আল্লাহ্ তায়ালা অনুগ্রহ করে নবুওয়াতের মাধ্যমে বান্দাদেরকে ততটুকু বোধদান করেছেন, যতটুকু তাদের দ্বারা বুঝা সম্ভব ছিল। অতএব এখন যা

বোধগম্য হয় তা বিশ্বাস করা কর্তব্য। আর যা আল্লাহ পাক কর্তৃক প্রদান করার উপযুক্ত, তা বুঝে আসুক বা নাই আসুক, ওসবগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য হবে। যদিও তা সম্যকভাবে অবগত হওয়া যাবে না। তবে মনে রাখতে হবে—

فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ -

অর্থাৎ "সত্য উপলব্ধির বৈঠকে যা অনুষ্ঠিত হবে সর্বময় ক্ষমার অধিকারী বাদশাহর সান্নিধ্যে—

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ

আযাবে কবর

যদি তুমি বল, এ সব স্বাদ ইন্দ্রিয়গোচর যা ধারণাপ্রসূত। যা জান্নাতে পাওয়া যাবে বলে ওয়াদা করা হয়েছে। আর তা ইন্দ্রিয় ও ধারণা শক্তির দ্বারাই জানা যাবে। আর এসব হলো শারীরিক শক্তি যা দেহেই সৃষ্টি হয় ২৮.। অনুরূপ কবরের আযাব এবং জাহান্নামের আযাব শারীরিক শক্তির দ্বারাই অনুভব করা যাবে। বুঝে আসবে। যখন আত্মা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর দেহের অংশগুলো বিলীন হয়ে যাবে। আর ইন্দ্রিয় এবং ধারণা শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তখন কীভাবে যাকাত আদায় না করার কারণে বিষাক্ত সাপের আকার ধারণ করে এরূপ ব্যক্তিকে দংশন করবে। আর কাফিরের উপর কী করে ৯৯টি সর্প পাঠিয়ে দেয়া হবে? যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে? কেননা, উক্তরূপ দুটি প্রকার হয়তো ধারণাপ্রসূত হবে, নয়তো ইন্দ্রিয়গোচর হবে। ইন্দ্রিয় চেতনা আর ধারণা উভয়ই মৃত্যুর সাথেই নির্মূল হয়ে গেছে। তাহলে এরূপ আযাবের কথা কী করে সাব্যস্ত হয়?

এখন জেনে নাও, যে কবরের আযাব অস্বীকারকারী, সে-ই সশরীরে হাশর হওয়াকে অস্বীকার করে। আর আত্মা দেহে ফিরে আসাকে অসম্ভব মনে করে। অথচ তা অসম্ভব হওয়ার জন্য কোনো নির্ভরযোগ্য বাস্তব প্রমাণ নেই। বরং অসম্ভব নয় যে, এমন শরীর বানানো হয়ে থাকবে মৃত্যুর পর আত্মা যার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। আর এরূপ হওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। কবরেও না, আখিরাতেও না। আর আগেকার দার্শনিকরা এ

বিষয়ের উপর যে প্রমাণাদি বর্ণনা করেছেন, তা বাস্তবমুখী নয়। অনন্তর শরীয়তে এরূপ আযাব হওয়ার কথার প্রমাণ রয়েছে। কাজেই তা বিশ্বাস করা অপরিহার্য।

আর দার্শনিকদের নিকট এরূপ আযাব সম্ভবপর না হওয়ার উপর যে কোনো প্রমাণ নেই তার প্রমাণ হলো, দার্শনিকদের সর্বশেষ উত্তম দার্শনিক বুআলী সীনা। তিনি তাঁর রচিত নাজাত ও মুক্তি (نَجَاتْ وَ شَفَا) গ্রন্থে দেহে পুনরায় রূহ ফিরে আসা অসম্ভব নয় বলে প্রমাণিত করেছেন। তিনি বলেছেন, হতে পারে আসমানে এরূপ কোনো দেহ এজন্যে বানানো হয়ে থাকবে, যাতে মৃত্যুর পর রূহ স্থান গ্রহণ করবে। আর তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের থেকে এক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে, এরূপ ব্যাপার অসম্ভব না হওয়ার মত পোষণ করেছেন কোনো কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ। যারা অনর্থক বাকচাতুরি করতেন না। এতে বুঝা গেল দার্শনিক বুআলী সীনা এ মূলনীতির ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। আর এরূপ বিকল্প দেহ থাকা অসম্ভব হওয়ার উপর তাঁর নিকট কোনো দলীল সাব্যস্ত ছিল না। যদি এরূপ হওয়াটা অসম্ভব হতো তাহলে তিনি এর প্রবক্তাকে প্রগলভ, বাচাল, অবাস্তব উক্তিকারী নয় বলে বলতেন না। কারণ অসম্ভব বিষয়ের প্রবক্তা হওয়ার চেয়েও বেশি কি মিথ্যাচার হতে পারে?

কোনো সময় কেউ বলে থাকেন, বুআলী সীনা এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন আত্মরক্ষামূলক। কেননা, তিনি তাঁর রচিত 'আত্মা-গ্রন্থে' (كِتَابُ النَّفس) যেখানে 'পুনর্জনম' (تَنَاسُخْ) প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, সেখানে আত্মার-দেহ বদলিয়ে পুনর্জনম অসম্ভব বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর এটা অবিকল সশরীরে হাশর হওয়ার ধারণা বাতিল করে দেয়ার দলীল। অতএব আমরা এর উত্তরে বলব, পুনর্জনম অসম্ভব হওয়ার বিষয়ে যে প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে, তা বাস্তবভিত্তিক নয়। কেননা, পুনর্জনম অবাস্তব সাব্যস্ত করার জন্য যে যুক্তি দেখিয়েছেন, তাও বাস্তবভিত্তিক নয়। কারণ তিনি পুনর্জনম অসম্ভব হওয়ার জন্য বর্ণনা করেছেন যে, আত্মা দেহের দিকে পুনরায় ফিরে আসতে হলে উহাকে এমন দেহের প্রতি ফিরে আসতে হবে, যা আত্মাকে গ্রহণ করার উপযুক্ত হবে। আর যে দেহে রূহকে গ্রহণ করার যোগ্যতা থাকত, আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে রূহের

প্রবাহ তাতে হয়েই গেছে। কারণ দেহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে আকার ধারণ করার দাবি রাখে। আর দেহের আকার ধারণ করার স্বয়ংক্রিয় দাবি আত্মার প্রবাহকে চায়। আর বিচ্ছিন্ন আত্মাও সেই দেহের সাথে লেগে গেল। এমতাবস্থায় এক দেহের জন্য দুটি আত্মা সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর এরূপ হওয়া অসম্ভব। আর বর্ণিত উক্ত দলীলটি সশরীরে হাশর অসম্ভব হওয়ার দলীলরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে কিনা এ দলীলটি দুর্বল। কারণ আমরা বলতে পারি দেহের যোগ্যতা বৈচিত্র্যময় হতে পারে। কোনো দেহে এমন যোগ্যতা থাকতে পারে যা বিচ্ছিন্ন আত্মার জন্য উপযোগী, যে আত্মা প্রথমে উহাতে ছিল। ফলে ওই দেহ আত্মা দ্বারা পরিচালিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আর নতুন আত্মার প্রবাহিত হওয়ার মুখাপেক্ষী হবে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়। এমতাবস্থায় যদি জরায়ু (রেহেম) দুটি শুক্র গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তখন আকার দানকারী আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে সেই জরায়ুতে দুটি আত্মার প্রবাহ নিষ্পন্ন হবে। আর এ দুটি শুক্রের প্রত্যেকটি এক একটি আত্মার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। এরূপ নির্দিষ্ট হওয়াটা শুক্রের মধ্যে আত্মা প্রবিষ্ট হওয়ার দিক দিয়ে হবে না। কারণ, দেহে আত্মা পরনির্ভর বিষয়াকারে প্রবিষ্ট হয়ই না। বরং উভয় উপযোগী দেহের মধ্যে একটি দেহ একটি আত্মার সাথে নির্দিষ্ট হওয়া সেই সম্পর্কের কারণে হয়, যা সেই দেহেও আত্মার মাঝে গুণগত সম্পর্কের কারণে নির্দিষ্ট হয়। অনুরূপভাবে অন্য আত্মা দেহের সাথে নির্দিষ্ট হয়। কাজেই যখন দুটি সম-আত্মার মাঝে এরূপ নির্দিষ্ট কারণ হতে পারে তা হলে প্রথমে যে আত্মা বিদ্যমান ছিল, সেই বিচ্ছিন্ন আত্মার সাথে নতুন আত্মার সম্পর্ক কেন হতে পারবে না? কাজেই যখন একটি বিচ্ছিন্ন আত্মার সাথে একটি উপযুক্ত দেহের অধিক সম্পর্ক থাকবে, তখন ঐ দেহ আকার দানকারী আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে নতুন আত্মা প্রবাহিত হওয়ার প্রত্যাশী থাকবে না। যখন সেই দেহ মুখাপেক্ষী রইল না তখন উহাতে নতুন আত্মা প্রবাহিতও হবে না। এ বক্তব্যের জন্য অনেক যুক্তি রয়েছে। আমি তার গভীরে যেতে চাই না। কেননা, উদ্দেশ্য হলো, একথা

পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা যে, যে ব্যক্তি সশরীরে হাশর হওয়া অস্বীকার করে, তার কোনো প্রমাণ নেই। যখন এরূপ কোনো দলীল নেই, তখন মৃত্যুর পর কবরে হাশরে ইন্দ্রিয়গোচর এবং ধারণাপ্রসূত অনুভূতি থাকাটা সহজেই বুঝে আসে।

যদি কেউ বলে যে, আমরা দেখতে পাই যে, মৃতের কোনোরূপ ইন্দ্রিয় অনুভূতি থাকে না, নড়াচাড়া করে না। তা হলে কী করে অনুভূতি আঁচ করা যায়।

উত্তরে আমরা বলব, মূর্ছাবস্থায় বেহুঁশ ব্যক্তিও তো নড়াচড়া করতে দেখা যায় না। আর এরূপ হতে পারে যে, অনুভূতি এমন অংশের সাথে জড়িত থাকবে, যা অবিভাজ্য অণুর কাছাকাছি। আর মৃতকে অবলোকনকারী তা দেখতে পাচ্ছে না। কাজেই মৃতের দেহের নড়াচড়া দেখার কোনোই মূল্য নেই।

বিশ্লেষণাত্মক পাদটীকা

২৬. আল্লাহর দীদার লাভ

একথা সত্য যে, আল্লাহ তায়ালার দেহ নেই। আর দেহের জন্য যা দেহনির্ভর ব্যাপার-স্যাপার (عَوَارِضْ) থাকে—যেমন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছবি, পরিমাণ-পরিধি, দিক এবং পার্শ্বপট ইত্যাদি থেকে তিনি মুক্ত। কারণ তাঁর সত্তা অনিবার্যভাবে স্বয়ম্ভর, প্রকৃত একক অর্থাৎ (اَحَدٌ) আহাদ—অবিভাজ্য সত্তা। আর 'আহাদ' তথা অবিভাজ্য সত্তা কোনোরূপ ভাগ-বণ্টন গ্রহণ করে না। অর্থাৎ যার অংশ বের হয় না। জ্ঞানগত দিক দিয়েও না, যেমন জিন্‌স (جِنْسٌ) এবং 'ফাস্‌ল' (فَصْلٌ)। আর বাস্তব ক্ষেত্রেও না। যেমন বস্তু (هَيُوْلٰى) আর বস্তুর আকার (صُوْرَتْ) বা দেহবিমুক্ত বা পরিমাণ-পরিধিমুক্ত স্বয়ং সম্পন্ন সত্তা (جَوَاهِرِ مُجَرَّدْ) আখিরাতে দৃষ্টিগোচর হবে না। যেমন কুরআনের স্পষ্ট উক্তিতে এসেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ -

অর্থ ঃ "আর কিছু চেহারা সেদিন স্বীয় প্রতিপালকের দিকে চেয়ে দেখবে—" তবে এটা হবে অনন্য ধরনের দেখা। এরূপ দর্শন লাভ জ্ঞানত দিক দিয়েও প্রকাশ্য বুঝা যায়। কারণ, দেখা এক ধরনের জানা এবং পরিষ্কার পরিস্ফুটিত হওয়া। তবে বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে 'কাশফ' তথা পরিস্ফুটিত হওয়া অপেক্ষা 'দেখা' বেশি স্বচ্ছ। যাহোক যখন এটা নির্ভুল যে, আল্লাহ তায়ালার সত্তার সাথে জানার (عِلْم) সম্পর্ক স্থাপিত অথচ তিনি কোনো দিকে অবস্থান করেন না। আর যেমন এটা নির্ভুল যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টিকুল অবলোকন করেন। আর তিনি সৃষ্টিনিচয়ের সামনে অবস্থান করেন না। তাই এটাও সম্ভব যে তাঁর সৃষ্ট মাখলুক তাঁকে দেখবে। তাঁর অবস্থান সামনে থাকবে না। আর যেমন আল্লাহ তায়ালাকে জানা যায় কোনোরূপ অবস্থান ব্যতীত, অনুরূপ তাঁকে দেখাও কোনোরূপ অবস্থান ব্যতীত এবং শারীরিক আকার ধারণ ব্যতীত হতে পারে। মোটকথা, জ্ঞানের দৃষ্টিতেও আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ সম্ভব বলে সাব্যস্ত হয়েছে। আর শরীয়তেও পরিষ্কার ভাষায় সাব্যস্ত আছে। এজন্যে আল্লাহ দর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। (মুফতী শাহ দীন)

২৭. জান্নাতে ছবির বাজার

জান্নাতে একটি বাজার রয়েছে। যেখানে ছবি বিতরণ করা হবে। ইমাম তিরমিযী হযরত আলীর বরাতে এরূপ অর্থবোধক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। বর্ণনার শব্দরাজি এরূপ ঃ

إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَسُوقًا مَا فِيهَا شَرِىٌّ وَلَا بَيْعَ إِلَّا الصُّوَرُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ - الحديث -

অর্থাৎ—নিশ্চয় জান্নাতে একটি বাজার আছে। যেখানে বেচাকেনা হবে না। তবে সেখানে নর ও নারীর ছবি থাকবে—হাদীসটি শেষ পর্যন্ত পঠিতব্য। (মুফতী শাহ দীন)

২৮. কবরের আযাব

খারিজী এবং অধিকাংশ মুতাজিলা এবং কিছুসংখ্যক 'মুর্জিয়া' কবরের আযাব বিশ্বাস করে না। তারা ধারণা করে, মৃতের মধ্যে যেহেতু বোধ নেই সেহেতু আযাবও অনুগ্রহানুভব থাকাও অসম্ভব। কিন্তু তাদের এরূপ ধারণা অমূলক। কেননা, যখন সাব্যস্ত হয়েছে যে, আত্মাসমূহের 'ফানা' নেই, (তা অস্থিতিহীন হয় না) যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ خُلِقْتُمْ لِلْاَبَدِ। তোমরা চিরকালের জন্য জন্মেছ দ্বারা তা প্রমাণিত। অতএব মৃত্যুর দ্বারা দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক উঠে যাওয়ার পর কবরে পুনরায় উহার কিছুটা সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াতে অনুভবের চেতনার উন্মেষ ঘটায় তা সম্ভবপর। যদ্বারা আযাব ও অনুগ্রহের সম্ভাবনা প্রকাশ পায়। আর যেহেতু শরীয়তের প্রমাণাদিও এর উপর সাক্ষ্য দেয় সে জন্যে এতে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। আর তা অস্বীকার করা মূর্খতা মাত্র। (মুফতী শাহ দীন)

২৯. বরাত ঃ কিছুটা বেশ-কমে বর্ণনাটি বুখারী শরীফে রয়েছে।

বুখারী ঃ ১ঃ১৮৮, যাকাত অধ্যায়।

৩০. ৯৯টি অজগর সাপ সম্পর্কে বর্ণনা ঃ ইমাম দারিমী আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। আর তিরমিযী শরীফে ৯৯ সংখ্যার স্থলে ৭০টি সাপের উল্লেখ রয়েছে। (মুফতী শাহ দীন)

৩১. আত্মার বিকল্প দেহ

মৃত্যুর পর আত্মার সম্পর্ক নতুন দেহের সাথে থাকাটা শরীয়তে সাব্যস্ত ব্যাপার। যেমন শহীদগণের আত্মা সবুজ পাখিদের বক্ষে থাকবে বলে উল্লেখ আছে। অর্থাৎ যে সমস্ত জীব সুখে বেহেশতের সরোবরে বিচরণ করবে সে সবের বক্ষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। আর আরশের নিচে ঝুলন্ত কিন্দীলে (আলো দানিতে) অবস্থান করবে। এরূপ মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকেও বর্ণিত রয়েছে।

এজন্যে হিন্দুমতে পুনর্জীবন লাভের (تَنَاسُخ) বাতিল ধর্মবিশ্বাস সাব্যস্ত হয় না। তারা বলেন ঃ দুনিয়াতে আত্মা জড়দেহের সাথে সম্পৃক্ত হয়। জড়দেহ তদ্বারা প্রতিপালিত হওয়ার পর যখন এ সম্পর্ক মৃত্যুর কারণে নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন আত্মা দ্বিতীয় জড়দেহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। দ্বিতীয় জড়দেহ প্রথম জড়দেহের থেকে ভিন্ন হয়। আর আত্মা উহাকে প্রতিপালন করে এমতের সমর্থন শহীদগণের আত্মার অবস্থান দ্বারা হয় না। কেননা, শহীদদের আত্মার শরীয়ত মতে যে জীবের সাথে সম্পর্ক সাব্যস্ত হয়, সে সব জীব জড়দেহ বিশিষ্ট নয়। আর এসব জীব শহীদদের আত্মা দ্বারা প্রতিপালনও হয় না; বরং শহীদদের আত্মা সেই সব জীবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে কোনোরূপ ক্লেশ-ক্লান্তি ব্যতীত বেহেশতের সুখভোগ করে। যেমন ঘোড়ায় আরোহণকারী ঘোড়ায় চড়ে আনন্দ উপভোগ করে। অথচ বাহনের অর্থাৎ ঘোড়ার রূহ ভিন্ন এবং আরোহণকারীর রূহ ভিন্ন। ঘোড়ার রূহ ঘোড়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে। আর আরোহণকারীর রূহ ভিন্ন থেকে যায়, শহীদদের রূহের জন্য এ বৈশিষ্ট্য কেন? তার কারণ হলো, শহীদগণের আত্মা যখন আল্লাহর পথে জান দিয়েছিল, যা দেহ ত্যাগের কারণ হলো। সে জন্যে শহীদদের রূহ উহাদের পরিত্যক্ত দেহের বদলায় বেহেশতে উহারা এ দেহ প্রাপ্ত হয়। কেননা প্রতিদান কর্মের অনুরূপ হয়ে থাকে। আর এরূপ আনন্দ উপভোগ ইত্যাদি লাভ করার দৃষ্টিতে শহীদগণকে 'জিন্দা' বলা হয়।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ-

অর্থ ঃ যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলবে না। বরং তারা জীবিত—। কেননা, মৃত্যুর কারণে দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছিন্নতা আসে। ফলে, নতুন অর্জন এবং আত্মাসমূহের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং আনন্দোপভোগে বাধা সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে শহীদদের রূহগুলো (বিকল্প) দেহ সম্পর্ক লাভ করে আনন্দোপভোগ করতে থাকে। সেজন্যে উহাদের জন্য একপ্রকার জীবন সাব্যস্ত হয়। আর উহাদের এরূপ জীবন পার্থিব

জীবনের ন্যায় হয় না। কারণ উহাদের সংশ্লিষ্ট দেহের উপর উহাদের তদারকি করার এবং প্রভাব বিস্তার করার সংশ্লিষ্টতা থাকে না। এরূপ পুনর্জীবন লাভ (تَنَاسُخْ) করাকে যার কোনোরূপ তদারকি করার ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার থাকে না—দার্শনিক বুআলী সীনা অসম্ভব মনে করেননি। আর তিনি দার্শনিক ফারাবী থেকে এ তত্ত্বেরই বর্ণনা করেছেন। যেমন মহাজ্ঞানী 'তূসী আল ইশারাত' (ইঙ্গিত) গ্রন্থের ভাষ্যে লিখেছেন ঃ

ثم انها لا يجوز ان تكون معطلة عن الادراك وكانت مما لا يدرك الا باللجسمانية فزهب بعضهم الى انها تتعلق با جسام اخر ولا يخلو اما ان لا تعسير صورة لها ـ وهذا ما ذكره الشيخ ومال اليه اوتعير فتكون نفوسا لها وهذا القول بالتناسخ الذى يبطله الشيخ اما المزهب الاول فقد اشار اليه فى كتاب المبداء المعاد ـ وذكر ان بعض اهل العلم مَنْ لا يَخالف فيما يقول واظنه يريد الفار ابى قال قولا وهو ان هؤلاء اذا فارقوا البدن ـ اخ ـ

অর্থাৎ—অতঃপর উহাদের (রূহদের) জন্য অনুভূতিশূন্য হয়ে যাওয়ার বৈধতা আসে না। অথচ উহা দৈহিক উপকরণের দ্বারা ই যে বস্তু লাভ করে থাকে তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে কারণে দার্শনিকদের একাংশ মত পোষণ করেন যে, রূহগুলো অন্যান্য দেহনিচয়ের সাথে যখন সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলে, তখন তার দুই অবস্থা হয়। হয়তো উহাদের কোনো আকার থাকে না, আর এ তত্ত্ব উল্লেখ করেছেন শায়খ বুআলী সীনা। আর এদিকেই তিনি ঝুঁকেছেন। নয়তো আকার ধারণ করবে। তখন রূহগুলো সেই আকারের রূহ হয়ে যাবে। এটাই হলো পুনর্জনম (تَنَاسُخْ) লাভের

মতবাদ। যাকে শায়খ বুআলী সীনা অচিরেই বাতিল সাব্যস্ত করবেন। আর তিনি প্রথমোক্ত মতবাদের দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন "আলমাবদাআ ওয়াল মাআদ" (সৃজন ও পুনরুত্থান) গ্রন্থে। তিনি উল্লেখ করেছেন, কোনো এক জ্ঞানী স্বীয় মতামত ব্যক্ত করার সময় সঠিক ধারণা পোষণ করতে পারেননি। আর আমি (তূসী) মনে করি তিনি দার্শনিক ফারাবীর কথা বলতে চেয়েছেন—ফারাবী এক মত প্রকাশ করেছেন। তা হলো ঃ রূহগুলো যখন শরীর থেকে আলগ হয়ে যায় ....

আর শায়খ বুআলী সীনা যে পুনর্জনমকে (تَنَاسُخْ) অসম্ভব সাব্যস্ত করেছেন, তা দ্বারা বিচ্ছিন্ন আত্মার উহার আসল দেহের দিকে প্রত্যাবর্তন করা অসম্ভব সাব্যস্ত হয় না। থেকে যায় দার্শনিকদের 'সময়কে' অস্তিত্ব গ্রহণে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিগত পরনির্ভর বিষয়াদিরূপে নিয়ে সুনির্দিষ্ট বিলুপ্ত বস্তুর পুনরায় আত্মপ্রকাশকে 'অসম্ভব' হওয়া দ্বারা সশরীরে হাশর হওয়াকে 'অসম্ভব' বলে প্রমাণ করা। তা হলো একটি বিনাশনের উপর অপর বিনাশনের ভিত্তি স্থাপন করার নামান্তর। যাকে "বিনাই ফাসিদ আলাল্ ফাসিদ" বলা হয়। এটা বাতিল হওয়া সুস্পষ্ট।

মোটকথা হলো রূহগুলো স্বীয় পরিত্যক্ত দেহসমূহের সাথে পুনরায় সম্পৃক্ত হওয়াটা "অসম্ভব" নয়; বরং তা সম্ভব। আর শরীয়তে কবরে এবং হাশরে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপিত হবে বলে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। সে জন্যে এ বিষয়াদিতে বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য।

অনুরূপ পৃথিবীতেও আত্মাসমূহের স্বীয় দেহের সাথে পুনরায় এসে যুক্ত হওয়াও সম্ভবপর ব্যাপার। যেমন কোনো কোনো মৃত পুনরায় জীবিত হয়েছে। অথবা অধিকাংশের মতে হযরত আদম আলাইহিস সালামের পৃষ্ঠ থেকে তাঁর সন্তানদিগকে পিপিলীকার ন্যায় দেহ দান করে বের করা হয়েছে। আর হযরত আদম আলাইহিস সালামকে দেখানো হয়েছে। আর তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয় ঃ

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ -

আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? যার উত্তরে আদমের সন্তানেরা বলেছিল ঃ হাঁ (بَلٰى)। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى -

অর্থ ঃ আর যখন বের করলেন তোমার রব্ব আদম সন্তানদের, তাদের পিষ্ঠ থেকে তাদের সন্তানদেরকে। আর তাদেরকে তাদের উপর সাক্ষী করলাম ঃ আমি কি তোমাদের সৃষ্টিকারী প্রতিপালক 'রব্ব' নই? তারা বলল, হাঁ—আমরা সাক্ষ্য দিলাম—।

অতএব, তখন রূহসমূহের সম্পর্ক উহাদের নিজ নিজ দেহের সাথে স্থাপিত হয়। অতএব পুনরায় যখন সেই দেহগুলো শুক্র আকারে প্রজন্মের পর প্রজন্মে নিজ নিজ নির্দিষ্ট সময়ে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে, তখন রূহগুলোর সম্পর্ক উহাদের সাথে স্থাপিত হতে থাকে।

এখানে 'অধিকাংশের মত' এজন্যে বলা হয়েছে যে, কোনো কোনো পণ্ডিত ভিন্ন মত পোষণ করেন। যেমন, যমখশরী, শায়খ আবু মানসূর এবং যাহ্হাক প্রমুখ। তারা আল্লাহ তায়ালার উক্তি—যখন তোমার রব্ব আদমের সন্তানদের তাদের পিঠ হতে এদের সন্তানদেরকে বের করলাম—আয়াতসমূহকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ অর্থে নিয়েছেন। আর তারা এরূপ অর্থ করেন ঃ আদমের সন্তানদেরকে তাদের পিতাদের পিঠ থেকে পয়দা করেছেন। আর তাদের সামনে আল্লাহ তায়ালা তাঁর স্বীয় প্রতিপালনের এবং একত্ববাদের প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন। আর তাদেরকে তিনি জ্ঞানদান করেন। যা সঠিক পথ ধরার এবং বিপথগামীর মাঝে পৃথক করে। অতএব, এটা যেমন তাদের বিরুদ্ধে তাদের দ্বারাই সাক্ষী নিযুক্ত করা। আর তাদেরকে—আমি তোমাদের সৃষ্টিকারী প্রতিপালক নেই? প্রশ্ন করা হলো। আর তারা যেমন উত্তরে বলল ঃ

بَلٰى اَنْتَ رَبُّنَا -

হাঁ, তুমি আমাদের রব্ব। এরূপ অর্থ নেয়ার প্রমাণ হলো, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ -

আদম সন্তানদের থেকে তাদের পিঠ থেকে—। বলেননি যে (مِنْ ظُهُوْرِهٖ) "আদমের পিঠ থেকে—।"

দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, এরূপ সওয়াল জবাবের কথা তো আমাদের স্মরণই নেই। এমতাবস্থায় এরূপ সওয়াল ও জবাবকে কিরূপে দলীলরূপে গ্রহণ করা যায়?

এর উত্তরে কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, সত্যবাদী সংবাদদাতা এরূপ সওয়াল ও জবাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়াই স্বয়ং স্বীয় স্মরণের মতো এবং স্মরণের স্থলে রয়েছে। যাতে এটা প্রমাণ বলে প্রকাশ পায়। কিন্তু এরূপ উত্তর কষ্টপ্রসূত নয় বলা যায় না। যা প্রকাশ্যে অনুমেয়। (মুফতী শাহ দীন)

সম্পর্কীয় জ্ঞান ঃ ইলম-ই হাকীকত তথা রূহানী তত্ত্বাদি আবিষ্কৃত হওয়ার উপলব্ধি অর্জিত হয়েছে—তারা প্রকৃত 'কলব'-এর বাস্তব পরিচয় এবং নেক আমল ও বদ আমল দ্বারা উহা কিরূপে পরিমার্জিত ও কলুষিত হয়ে থাকে তা ভালোরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

দ্বাদশ অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২.

নেক ও বদ আমল অন্যের খাতে লিপিবদ্ধ হওয়ার প্রমাণ

হাদীস শরীফে এসেছে যে, জালিমের নেকীসমূহ মজলুমের খাতে লিপিবদ্ধ হবে। আর মজলুমের বদীসমূহ জালিমের দফতরে লেখা হবে। কোনো কোনো সময় যাদের নবুয়তের মূল উৎসের হাদীসসমূহের রহস্যাদি বুঝে আসেনি, তারা এরূপ হওয়াকে অসম্ভব মনে করে। তারা বলে নেকী-বদীসমূহ কার্যকলাপ এবং নড়াচড়া বিশেষ। আর কর্ম এবং নড়াচড়া অতীত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় বিলুপ্ত (مَعْدُوْمٌ) বিষয় কী করে স্থানান্তরিত হবে? বরং কার্যকলাপ এবং নড়াচড়া স্থায়ী থাকলেও অর্থাৎ বিলুপ্ত না হলেও তা তো অস্তিত্বের দিক থেকে পরনির্ভর (عَوَارِضْ) বিষয়। তাহলে অস্তিত্ব পরনির্ভর বিষয় কী করে স্থানান্তরিত হতে পারে?

উত্তরে আমরা বলব যে, জুলুম করার কারণে নেকী এবং বদীর স্থানান্তরিত হওয়া জুলুম করা অবস্থায়ই এ দুনিয়ায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। কিন্তু তা বুঝা যাবে আখিরাতে। এখন নিজের ইবাদাতকে অন্যের খাতে এবং অন্যের বদীকে নিজের খাতে তখন দেখতে পাবে।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ -

(আজ রাজত্ব কার হাতে? এক আল্লাহর হাতে যিনি পরাক্রমশীল) পরকালে এরূপ হবে বলে জানানো হয়েছে। অথচ দুনিয়াতেও অনুরূপই রাজত্ব আল্লাহর হাতে। পরকালে নিত্য নতুনভাবে কিছু ঘটবে না। কিন্তু কিয়ামতের দিন সকলেই প্রকাশ্যে তা দেখতে হবে। বস্তুতঃ মানুষ যা প্রত্যক্ষ করে না, তা মানুষের সামনে উপস্থিত থাকে না। যদিও তা

প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান থাকে। যখন মানুষ তা জেনে ফেলে তখন তা মানুষের জন্য বিদ্যমান হয়ে যায়। তাই বলা যায়, তখন তা প্রত্যক্ষকারীর জন্য বিদ্যমান হয়েছে। আর এমতাবস্থায় তা নতুন করে হয়েছে বলে বিশ্বাস করে। তাই নতুন করে বিদ্যমান হয়েছে বলে ধারণা জন্মায়। অতএব, যারা বলে, বিলুপ্ত বিষয় কী করে স্থানান্তরিত হবে আমাদের আলোচনা দ্বারা তা বাতিল হয়ে যায়।

আর এরূপ উত্তরও হতে পারে যে, ইবাদত স্থানান্তরিত হওয়ার অর্থ হল, স্বয়ং ইবাদত স্থানান্তরিত হয় না। কিন্তু ইবাদতের ফল হলো ছাওয়াব ও জওয়াব। ইবাদতের ফল স্থানান্তরিত হওয়াকে ইবাদত স্থানান্তরিত বলে ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। আর এরূপ অর্থ রূপক প্রয়োগে এবং ক্ষীণ ইঙ্গিতে (مَجَازُ وَاسْتِعَارَة) গ্রহণ করা যায়। যা ভাষাতত্ত্বে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যদি বলা হয় যে, ইবাদতের ফল বা ছাওয়াব হয়তো পরনির্ভর (عَرَضٌ) হবে অথবা স্বনির্ভর (جَوْهَرٌ) হবে। যদি তা পরনির্ভর (عَرَضٌ) হয়, তাহলে সন্দেহ থেকেই যায়। যদি তা স্বনির্ভর (جَوْهَرٌ) হয়, তাহলে ওই স্বনির্ভর (جَوْهَرٌ) কী?

আমি বলব, ইবাদতের ছাওয়াব বলতে ইবাদতের ছাওয়াবের প্রভাব ক্রিয়া বুঝায়। আর তা হলো অন্তর নূরে আলোকিত হওয়া। অনুরূপ পাপ দ্বারা পাপের তাসীর (প্রভাব) বুঝায়। পাপ অন্তরকে কলুষিত করে, কঠোর করে। আর ইবাদতের নূরের প্রভাবে বান্দারা ঐশ্বরিক জ্ঞানাহরণের এবং প্রতিপালকের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করার যোগ্যতা লাভ করে। ৩৩. আর অন্তর কঠিন হলে কালিমাচ্ছন্ন হলে, তা দিয়ে আল্লাহর সৌন্দর্য অবলোকনে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এবং অন্তরালে থাকার উপযোগিতা অর্জন করে। তাই ইবাদত অন্তরের আলো এবং পরিচ্ছন্নতা দ্বারা আল্লাহর দীদার লাভের আনন্দ উপার্জন করে। আর পাপ অন্তরে কালিমা এবং কঠোরতার দিক দিয়ে হিজাব তথা যবনিকা বা আড়াল ও পর্দা আনয়ন করে। তাই নেকী এবং বদীর প্রভাবের মধ্যে বৈপরীত্য ও পরস্পর পিছু ধাবনের প্রবণতা পয়দা হয়। এজন্যে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ -

অর্থাৎ নিশ্চয় নেক কাজগুলো দূর করে দেয় আমলের আছরকে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ -

অর্থ ঃ বদ আমলের পেছনে নেক আমলকে লাগিয়ে দাও। আর কষ্ট ও ক্লেশ পাপ নির্মূল করে দেয়। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَنَّ الرَّجُلَ يُثَابُ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ حَتَّى الشَّوْكَةِ تُصِيْبُ رِجْلَهٗ -

অর্থাৎ নিশ্চয় ব্যক্তিকে ছাওয়াব দেয়া হয় প্রতিটি ব্যাপারে। এমনকি তার পায়ে কাঁটা বিঁধলেও। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

كَفَّارَاتٌ لِاَهْلِهَا -

যে কষ্ট পেল তার জন্য কষ্ট গুনাহের অবসানকারী হয়। অতএব, জালিম জুলুম করা দ্বারা স্বীয় প্রবৃত্তির বাসনা চরিতার্থ করে। এ কারণে তার অন্তর কঠিন হয়ে যায় এবং কালিমাচ্ছন্ন হয়। আর ইবাদত করার জন্য জালিমের অন্তরে যে আলোর প্রভাব পড়েছিল, তা অপসারিত হয়ে যায়। তাই যেমন তার ইবাদত ছিনিয়ে নেয়া হলো। আর যার উপর জুলুম করা হয় সে ক্লেশ পায়। এতে তার প্রবৃত্তির পাপ চাহিদা দূরীভূত হয়ে যায়। ৩৪. ফলে, আলোকিত হয়ে যায়। আর প্রবৃত্তির ইচ্ছা চরিতার্থ করার কারণে অন্তরে যে কালিমা ও কাঠিন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল তা দূরীভূত হয়ে যায়। তখন যেন অন্তরের আলো জালিমের অন্তর থেকে মজলুমের অন্তরে স্থানান্তরিত হয়ে আসল। আর মজলুমের অন্তরের কলুষতা জালিমের অন্তরে স্থানান্তরিত হলো। নেকী এবং বদী স্থানান্তরিত হওয়ার এটাই অর্থ।

যদি বলা হয় এটা তো প্রকৃত অর্থে স্থানান্তর নয়। বরং এর অর্থ হলো, জালিমের অন্তর হতে আলো নিভে গেল। আর মজলুমের দিলে নতুন আলো সৃষ্টি হলো। ফলে মজলুমের দিলের অন্ধকার দূর হয়ে গেল। আর জালিমের দিলে এক পৃথক অন্ধকার জন্ম নিল। এটা প্রকৃত স্থানান্তর নয়।

উত্তরে আমরা বলব, 'স্থানান্তর' শব্দটি রূপক অর্থে (مَجَازٌ) এবং ক্ষীণ ইঙ্গিত প্রয়োগের ক্ষেত্রে (اِسْتِعَارَةٌ) এরূপ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় ঃ

اِنْتَقَلَ الظِّلُّ مِنْ مَوْضَعٍ اِلٰى مَوْضَعٍ؟

ছায়া একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলে গেল—আর এরূপও বলা হয়—

اِنْتَقَلَ نُوْرُ الشَّمْسِ وَالسِّرَاجِ مِنَ الْاَرْضِ اِلَى الْحَائِطِ وَمِنَ الْحَائِطِ اِلَى الْاَرْضِ -

"সূর্য এবং প্রদীপের আলো জমি থেকে দেয়ালে স্থানান্তরিত হয়েছে। দেয়াল থেকে মাটিতে স্থানান্তরিত হয়েছে।" আর দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যখন গ্রীষ্মকালে তাপ পৃথিবীতে প্রবল থাকে তখন বলা হয় ঃ

اِنْهَزَمَتِ الْبُرُوْدَةُ اِلٰى بَاطِنِهَا -

—"শীত মাটির অভ্যন্তরে লুকিয়েছে।" এখানে লুকানো অর্থ স্থানান্তরিত হওয়া। আরও বলা হয় ঃ

نُقِلَتْ وَلَايَتُ الْقَضَا وَالْخِلَافَةِ مِنْ فُلَانٍ -

—"বিচারপতির পদ এবং খেলাফত অমুকের নিকট থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে।" উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহে স্থানান্তরই বলা হয়। অতএব, প্রকৃত স্থানান্তর হলে কোনো বস্তু প্রথমে যেখানে ছিল অবিকল তা সেখান থেকে সরে ভিন্ন স্থানে চলে যাওয়া। যদি উহার ন্যায় অন্য কিছু হয়, তাহলে অবিকল উহাই হয়, তখন তার স্থানান্তরকে রূপক অর্থে স্থানান্তর বলা হবে। ইবাদত স্থানান্তর হওয়ার অনুরূপ স্থানান্তরিত বুঝায়। শুধু এতটুকু কথা থেকে যায় যে, ইবাদত বলে ক্ষীণ ইঙ্গিতে (كِنَايَةٌ) ছাওয়াবকে বুঝানো হয়েছে। যেমন কার্য ও কারণে কারণ উল্লেখ করে ক্ষীণ ইঙ্গিতে কার্য বুঝায়। আর কোন এক বিশেষণের কোথাও অবস্থানকে এবং উহার সদৃশ অন্য কোনো বিশেষণ অন্যস্থানে না থাকাকে স্থানান্তর বলা হয়। এসব প্রয়োগ কথাবার্তায় ব্যাপক প্রচলিত হয়। যদি এ ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টান্ত নাও থাকত তবু এর অর্থ সপ্রমাণিত বলে স্বীকৃত হতো। অথচ শরীয়তেও এরূপ প্রয়োগের প্রমাণ রয়েছে। এমতাবস্থায় তা কিরূপে সাব্যস্ত হবে না?

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ

স্বপ্নে আল্লাহ তায়ালার দীদার লাভ

স্বপ্নে আল্লাহ তায়ালার দীদার লাভ সম্পর্কে তুমি প্রশ্ন করেছ। যা নিয়ে লোকেরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করে। তুমি জেনে রাখ, যখন বিষয়টি খোলাসা হয়ে যাবে, তখন এ বিষয়ে কোনোরূপ দ্বিমত থাকবে না। সত্যকথা এটাই যে, আমরা বলি, স্বপ্নে আল্লাহ তায়ালাকে দেখা যায়। যেমন আমরা বলে থাকি, আল্লাহর রাসূলকে খাবে দেখা যায়—(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখন স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখার অর্থ কী হবে? যে জ্ঞানীর মন-মানসিকতা (طَبِيْعَتْ) সাধারণ লোকদের মনমানসিকতার কাছাকাছি হবে, সে এরূপ মনে করবে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাবে দেখেছেন, সে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ মোবারকই দেখছে, যা মদীনার পবিত্র রাওজায় রাখা হয়েছে। যদি কেউ মনে করে যে, তিনি কবর ফেঁড়ে বের হয়ে কোনো স্থানের দিকে তাশরীফ এনেছেন; সুতরাং এরূপ জ্ঞানীর চেয়ে অজ্ঞানী আর কে হবে? কেননা খাবে কোনো সময় দেখা যায় যে, একই বস্তু একই রাত্রে একই অবস্থায় হাজারো স্থানে দেখা যাচ্ছে। আয়না যদি দশটি থাকে, তখন একব্যক্তি একই অবস্থায় এক ব্যক্তিকে দশটি স্থানে দেখতে পারবে। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব যে, একই ব্যক্তি একই হালে, হাজার স্থানে বিভিন্ন আকারে থাকবে? অর্থাৎ বুড়োও দেখাবে যুবকও দেখাবে। লম্বাদেহী দেখাবে, বেঁটেও দেখাবে। স্বাস্থ্যবান দেখাবে এবং অসুস্থও দেখাবে। এরূপ যাবতীয় অবস্থায় দেখাবে। যে এরূপ ধারণা করে তার আহাম্মকি চরমে। সে জ্ঞান হারিয়েছে, তার সাথে কথা বলার যোগ্য সে থাকেনি।

সে হয়তো বলবে, যে ব্যক্তি হযরত আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাবে দেখেছে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সদৃশকে হয়ত দেখে, দেহ মোবারক দেখে না। এমতাবস্থায় সে হয়তো দেহ মোবারকের

সদৃশ দেখে থাকবে বা রূহ মোবারকের সদৃশ দেখে থাকবে। যার কোন আকার প্রকার নেই। যদি বলা হয় যে, নবীদেহের সদৃশ দেখেছে তা হলে তার দেহের গোশত, হাড্ডি, রক্ত সে দেখেনি। আমরা বলব, দেহ তো স্বয়ং ইন্দ্রিয়গোচর হয়। তার সদৃশ দেখার প্রয়োজন কী? অতঃপর যে মৃত্যুর পর রাসূল মকবুলের দেহ মোবারকের সদৃশ দেখেছে আর রূহকে দেখেনি, সে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই দেখেনি। বরং সে দেহ দেখেছে, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাড়া দেয়াতে নড়াচড়া করত। কেননা নবীর পরিচয়ে রূহ, হাড্ডি এবং গোশতকে নবী বলে না। তাই দেহের সদৃশ দেখলে কিরূপে রাসূল মাকবুলকে দেখা হবে? (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাই বলা হবে, বাস্তব এটাই যে তা রাসূল মকবুলের পবিত্র রূহ মোবারকের সদৃশ যা নবুয়তের স্থান। আর এই ব্যক্তি যে অবয়ব দেখেছে তা প্রকৃতপক্ষে রূহ মোবারকের সদৃশ। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূহ, তাঁর মূল বস্তু, তা দেহ নয়।

যদি বলা হয় যে, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বচনের অর্থ কী হবে? তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِيْ -

—"যে আমাকে খাবে দেখল সে অবশ্যই আমাকে দেখল।' এর উত্তর হবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসটির উদ্দেশ্য তাই। অর্থাৎ সে যা কিছু দেখেছে তা সদৃশ দেখেছে। যে সদৃশ বাস্তব জানার জন্য আমার এবং দর্শকের মধ্যে মাধ্যমের কাজ করেছে। তাই যেমন এখন নবুয়্যতের সারবস্তু (جَوْهَرِ نُبُوَّتْ) অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র রূহ, যা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর বিদ্যমান রয়েছে তা রং এবং দৈহিক আকার বিমুক্ত। কিন্তু বাস্তবানুযায়ী সদৃশের মাধ্যমে উম্মতকে সেই রূহের পরিচয় হাসিল হয়। ৩৬.

আর সেই সদৃশ্যের আকার থাকে। আর তা উহার রং এবং ছবি। যদিও নবুয়্যতের সারবস্তু (جَوْهَرِ نُبُوَّتْ) অর্থাৎ রূহ, আকার এবং রং ও ছবি হতে পূত পবিত্র। আর অনুরূপ, আল্লাহ তায়ালাও আকার এবং ছবি রূপ বিমুক্ত। ৩৭.

তবে বান্দাদের তাঁর যে পরিচয় মিলে, তা তাঁর ইন্দ্রিয়গোচর সাদৃশ্যের মাধ্যমে হয়। সে ইন্দ্রিয়গোচর সদৃশ চাই নূর জাতীয় হোক, বা নূর ব্যতীত অন্য কিছু সুন্দর ছবির আকারে হোক। যা সেই প্রকৃত সৌন্দর্যের গ্রহণযোগ্য সদৃশ হওয়ার উপযোগী হয়। যার কোনোই সুরত এবং রং নেই। মোটকথা, এ সদৃশ সত্যিকারের পরিচয় লাভের মাধ্যমে হবে। এখন যে স্বপ্নে দেখবে সে বলতে পারে, আমি আল্লাহ তায়ালাকে স্বপ্নে দেখেছি। তার কথার এরূপ অর্থ হবে না যে সে আল্লাহ তায়ালার সত্তাকে (ذَات) দেখেছে আর তাঁর রূহকে, তার দেহকে দেখেছে। বরং তার কথার অর্থ হবে সে আল্লাহ তায়ালার জাতের সদৃশ দেখেছে।

'মিসাল' এবং 'মিস্‌ল'-এর তফাৎ

যদি বলা হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তো সদৃশ (مِثَال মিসাল) আছে। আর আল্লাহ তায়ালার তো কোনোই দৃষ্টান্ত (مِثْل মিস্‌ল) নেই।

উত্তরে আমরা বলব, এ প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে 'মিসাল' এবং 'মিস্‌ল' শব্দদ্বয়ের পার্থক্য না বুঝার কারণে। 'মিসল' তা হয়, যা গুণগত সর্বদিক দিয়ে উপমেয় উপমানের মতো হয়। আর 'মিসাল' এ, সর্বক্ষেত্রে সমান হওয়ার প্রয়োজন করে না। কেননা, জ্ঞান (عَقْل) এমন বস্তু, যার সমতুল্য প্রকৃতপক্ষে অন্য কিছুই নেই। আর আমাদের জন্য বৈধ হবে জ্ঞানের উপমা সূর্যের সাথে করা, কেননা, জ্ঞান এবং সূর্যের মধ্যে এক বিষয়ে সামঞ্জস্যতা রয়েছে। ৩৮. আর তা হলো, সূর্যের আলোকে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়াদি পরিষ্কার দেখা যায়। ৩৯. যেমন জ্ঞানের আলোকে জ্ঞানগত বিষয়াদি বুঝা যায়। মোটকথা, এতটুকু সামঞ্জস্য হওয়াই উপমা প্রদানে যথেষ্ট। বরং বাদশাহর উপমা হয় সূর্যের সাথে। আর উজিরের উপমা হয় চন্দ্রের সাথে। বাদশাহ তার অবয়ব এবং ব্যক্তিত্বে সর্বদিক দিয়ে সূর্যের সমতুল্য নয়। উজিরও সর্বদিক দিয়ে চন্দ্রের সমতুল্য নয়। কিন্তু এতটুকু সাযুজ্যই যথেষ্ট যে, বাদশাহের সকলের উপর প্রাধান্য থাকে। আর সকলের উপর তাঁর প্রভাব পড়ে। এতটুকুতে সূর্যের সাথে তাঁর সাযুজ্য সম্পর্ক রয়েছে। আর চন্দ্র আলোর প্রভাব প্রবাহে সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে মাধ্যমের কাজ করে। যেমন ন্যায়বিচারের আলো বিস্তারে

উজির বাদশাহ এবং প্রজাদের মাঝখানে মাধ্যম হয়। এটা হলো 'মিসাল' (সদৃশ) হওয়া। এটা অবিকল (মিস্‌ল) হওয়া নয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন ঃ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ -

অর্থ ঃ পৃথিবী ও আসমানসমূহের আলো হলেন আল্লাহ। তাঁর নূরের উপমা হলো যেমন একটি তাক—তাক খোপে রয়েছে একটি প্রদীপ। প্রদীপটি কাঁচ বেষ্টনীতে স্থাপিত। আর কাঁচ যেন মুক্তার ন্যায় স্বচ্ছ জ্বলন্ত তারকার ন্যায়। যা জ্বালানো হয় বরকতময় যায়তুন বৃক্ষের তেল দ্বারা। যার অবস্থান প্রাচ্যেও নয় প্রতীচ্যেও নয়। উহার তেল জ্বলে উঠার উপক্রম করে আগুন সংযোগ করা না হলেও—আলো স্থাপিত আলোর উপর— (সূরা নূর ঃ ২৪ ঃ ৩৫)

এখন আল্লাহর আলো, আর কাঁচ, আর তাক, খোপ, বৃক্ষ ও তেলের কী ধরনের সাযুজ্য রয়েছে তাও আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا -

—তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। ফলে উপত্যকাসমূহ স্বীয় ধারণ ক্ষমতানুযায়ী প্রবাহিত হয়ে যায়। অনন্তর প্লাবন বহন করে ভাসমান আবর্জনা— (১৩ ঃ ১৭)

এ আয়াতে কুরআন শরীফের উপমা বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনের বর্ণনা অতি প্রাচীন। যার কোনো তুলনা হয় না। তবু কেন পানি কুরআনের তুল্য হয়? আর বহু স্বপ্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখানো হয়েছে। ৪০.

যেমন দুধ এবং রশি দেখানো হয়েছে। তিনি বলেছেন, দুধ হলো ইসলাম। আর রশি হলো কুরআন। এছাড়া আরও বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যা অগণিত। এখন দুধ এবং ইসলামের মধ্যে কোনো সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায় না। আর রশি আর কুরআনের মধ্যেও কোনো সাযুজ্য মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মাঝে সাযুজ্য বিদ্যমান রয়েছে। আর তা হলো, 'হাবল' (রশির) পার্থিব পরিত্রাণ লাভে ধারণ করা হয়। আর কুরআন মজীদ ধারণ করা হয় পরকালের নাজাতের জন্যে। আর দুধ উপাদেয় খাবার। খাবার দ্বারা প্রকাশ্যে জীবন রক্ষা পায়। আর ইসলাম উপাদেয় খানার সমতুল্য যদ্বারা আত্মিক জীবন রক্ষা পায়। এ সবই মিসাল (مِثَال) উপমা। এসব মিসল (مِثْل) (অবিকল দৃষ্টান্ত) নয়। বরং উল্লিখিত বিষয়াদির জন্য অবিকল কোনো দৃষ্টান্তই নেই। আল্লাহ তায়ালারও কোনো অবিকল দৃষ্টান্ত নেই। বরং আছে উপমাসমূহ যাকে 'মিসাল' (مِثَال) বলা হয়।

যা জ্ঞানগত সাযুজ্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার গুণাবলির তথ্য অবগত করে। কেননা যখন আমরা অনুসারীগণকে বুঝাব যে, আল্লাহ তায়ালা বস্তুনিচয় কিরূপে সৃষ্টি করেন, আর কিরূপে তিনি তা অবগত থাকেন আর কেমন করে তিনি ওসবের তত্ত্বাবধান করে থাকেন, আর তিনি কিরূপে কথা বলেন, আর কিরূপে তাঁর সত্তার সাথে তাঁর কালাম (কথা) সম্পৃক্ত হয়—এসবের উপমা মানুষের সামনেই বর্ণনা করতে হবে। যদি মানুষ নিজের সত্তায় এসব বিশেষণসমূহ অবগত না হয়ে থাকে, তখন তা আল্লাহ তায়ালার বেলায়েত এসবের উপমা বুঝে আসবে না। স্মৃতি বয়ে মিসাল (مِثَال) উপমা আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে ন্যায্য। আর অবিকল দৃষ্টান্ত (مِثْل) অন্যায্য।

যদি বলা হয় যে, এ তাত্ত্বিক আলোচনা দ্বারা স্বপ্নে আল্লাহ তায়ালার দীদার লাভ সম্ভব বলে সাব্যস্ত হয় না। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও খাবে দেখা যাবে না বলে সাব্যস্ত হয়। কারণ যা দেখা গেল তা তো 'মিসাল' উপমা। তা অবিকল বস্তু নয়। তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উক্তি ঃ

مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِيْ -

(যে আমাকে খাবে দেখল সে অবশ্যই আমাকেই দেখল) এক ধরনের রূপক প্রয়োগ সাব্যস্ত হয়। তার অর্থ দাঁড়াবে ঃ যে আমার উপমা দর্শন করল সে যেন আমাকেই দেখল। আর সে যা কিছু উপমারূপ বস্তুর নিকট থেকে শুনল তা যেন আমার নিকট থেকেই শুনল।

উত্তরে আমরা বলব ঃ যে ব্যক্তি বলে যে,

رَأَيْتُ اللّٰهَ فِى الْمَنَامِ -

আমি খাবে আল্লাহকে দেখেছি—তার উদ্দেশ্যও অনুরূপই হয়। এরূপ উদ্দেশ্য হয় না যে, সে আল্লাহ্ তায়ালার সত্তাকে দেখেছে। পক্ষান্তরে, এটা সাব্যস্ত যে, আল্লাহ তায়ালার সত্তা এবং নবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্তা দৃষ্টিগোচর হয় না। আর উল্লিখিত উপমারূপ দৃষ্টিগোচর হয় মাত্র। যা সম্ভব। ওসব উপমারূপকে খাবদ্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার সত্তা এবং রাসূলুল্লাহর সত্তা মনে করে। এখন তা অস্বীকার কী করে করা যাবে! অথচ খাবে ওসবের অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়। যে এ সমস্ত উপমারূপ খাবে নিজে দেখেনি, তার নিকট বহু সূত্রে বর্ণিত তথ্যের মাধ্যমে এ খবর পৌঁছে থাকবে। তাদের কাছ থেকে—যারা উল্লিখিত উপমারূপ দেখেছে। বস্তুতঃ ধারণাপ্রসূত বিশ্বাস উপমারূপে কখনো সত্য হয়, আর কখনো মিথ্যা হয়। সত্য উপমাকে আল্লাহ তায়ালা দর্শনকারী এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে কোনো ব্যাপার অবগতি হওয়ার জন্য মাধ্যম করে দেন। আর আল্লাহ্ তায়ালার ক্ষমতা আছে তিনি তাঁর এবং তাঁর বান্দাদের মধ্যে এরূপ মাধ্যম তথ্য পৌঁছে দেয়ার জন্য আর বাস্তব বিষয় অবগত করে দেয়ার জন্য সৃষ্টি করে দিতে পারেন। বস্তুতঃ এরূপ মাধ্যম রচনা করা বাস্তব ব্যাপার। তা সম্ভবপর হওয়াকে কী করে অস্বীকার করা যাবে?

যদি বলা হয় যে, অনুরূপ রূপক প্রয়োগের রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাপারে তো অনুমতি আছে। ৪১.

বস্তুত আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে তো এরূপ প্রয়োগই বৈধ হবে যার অনুমতি থাকবে।

উত্তরে আমরা বলব, এরূপ প্রয়োগেরও অনুমতি এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

رَأَيْتُ رَبِّيْ فِيْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ -

"আমি অতি সুন্দর সুরতে আমার প্রতিপালককে দেখেছি।" (ইমাম দারেমী আবদুর রহমান ইবনে আয়েশ সূত্রে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি, আল্লাহ তায়ালার জন্য সুরত প্রমাণ করার জন্য যে বর্ণনাটি এসেছে তার একটি। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ -

"আল্লাহ স্বীয় সুরতে আদমকে সৃষ্টি করেছেন।" আর অনুরূপভাবেই এখানে আল্লাহ তায়ালার সত্তার সুরত উদ্দেশ্য নয়। কারণ তাঁর সত্তার তো কোনোরূপ সুরতই নেই। কিন্তু ওই তাজাল্লী (সত্তাস্বরূপ বিকশিতকরণ) এর দিক থেকে যে উপমারূপ (মিসাল) সাথে থাকে। যেমন হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম দাহইয়া কালবীর সুরত ধরে এবং অন্যান্য আকার ধারণ করে জাহির হতেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে একাধিকবার এরূপে জাহির হতে দেখেছেন। অথচ তিনি মাত্র দু'বার জিব্রাঈল (আঃ)-কে প্রকৃত রূপে দেখেছেন। ৪২. আর দাহইয়া কলবীর সুরতে আত্মপ্রকাশ করাটা এরূপ ছিল না যে, জিব্রাঈলের (আঃ) সত্তা দাহইয়া কালবীর সত্তারূপে বদলে দিয়েছিল। বরং তা এরূপ ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সেই সুরতটা এক উপমারূপে প্রকাশ পায়। যা জিব্রাঈলের তরফ হতে আল্লাহ তায়ালার পয়গাম পৌঁছে দিয়ে থাকত। এরূপই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার উক্তি ঃ

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا -

অর্থাৎ "অতঃপর জিব্রাঈল মারয়ম-এর সামনে পূর্ণ মানুষের রূপে এসে গেল।" ৪৪.

অতএব, এরূপ সুরত ধরে বিকশিত হওয়াতে জিব্রাঈলের সত্তায় ও কায়ায় পরিবর্তন সূচিত হয়নি। বরং জিব্রাঈল নিজ সত্তার বিশেষণে অটল ছিলেন। যদিও নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে দাহইয়ায়ে কালবীর সুরতে ছিলেন। অনুরূপই, এরূপে প্রকাশিত হওয়া আল্লাহ তায়ালার পক্ষে অসম্ভব নয়। তা জাগ্রতাবস্থায় হতে পারে আবার স্বপ্নেও হতে পারে। অতএব, এক অর্থে সুরতের প্রয়োগ বৈধ হওয়াটা বর্ণনা সূত্রে সাব্যস্ত হলো। আর বিগত ধর্ম পুরুষ (سَلَفْ)

কর্তৃক ও সুরতের প্রয়োগ সৃষ্টিকর্তার জন্য সাব্যস্ত আছে। এ বিষয়ে বহু হাদীস এবং তথ্যাদি বর্ণিত হয়েছে। যদি বর্ণনা সূত্রে এবং বিগত ধর্ম পুরুষ সকলদের থেকে এরূপ প্রয়োগ সাব্যস্ত নাও হতো তবু আমরা বলতাম, যে শব্দ প্রয়োগ আল্লাহ তায়ালার জন্য সঠিক হয়, আর শ্রোতাদের বিভ্রান্ত হওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনাও না থাকে তা প্রয়োগ করা হারাম ও নিষিদ্ধ না হয়ে তা আল্লাহ তায়ালার জন্য প্রয়োগ করা বৈধ আছে। আর আল্লাহ তায়ালার দীদার লাভ শব্দ দ্বারাও তা অধিক পরিমাণ নানা ভাষায় প্রয়োগিত হওয়াতে তাতে সত্তা দর্শনের ক্ষীণতম ধারণার সৃষ্টি হয় না। যদি এমন ব্যক্তির ধারণা করা যায় যে, এরূপ বাক্য দ্বারা বাস্তবের খেলাফ ক্ষীণতম ধারণা পোষণ করতে পারে, তখন তার সামনে এরূপ কথা উচ্চারণ করা সমীচীন হবে না। বরং এরূপ ব্যক্তির সামনে বাক্যটির ব্যাখ্যা পেশ করতে হবে।

যেমন আমাদের জন্য বৈধ হবে না যে, আমরা বলব, আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি, তাঁর সাথে মিলন করতে চাই। কারণ এরূপ বাক্য প্রয়োগ দ্বারা কতিপয় লোকের মনে অপবিত্র ধারণা উৎপন্ন হয়েছে। আর বহু লোকের মনে এরূপ বাক্য প্রয়োগ দ্বারা আমরা যে অর্থ বর্ণনা করেছি তাই তাঁরা বোঝেন। তাঁদের মনে কোনরূপ অপবিত্র ধারণা উদয় হয় না। অতএব, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করতে গিয়ে যার সাথে কথা বলা হচ্ছে তার অবস্থা লক্ষ্যে আনতে হবে। যেথা অস্পষ্টতা থাকবে না সেখানে পরিষ্কার না করে, ব্যাখ্যা না দিয়ে বাক্য উচ্চারণ করা জায়েয হবে। আর যেখানে অস্পষ্টতা থাকবে, সেখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং খুলে বলা আবশ্যক হবে। মোটকথা, এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালার সত্তা দেখা যায় না। আর যা দৃষ্টিগোচর হয় তা তাঁর সত্তার সদৃশ 'মিসাল'। আর এবিষয়ে দ্বিমত রয়েছে যে, আল্লাহর সত্তার দীদার লাভ আল্লাহকে দেখার অর্থে বলা জায়েয হবে কিনা! অতএব, যে ব্যক্তি মনে করে যে, আল্লাহ তায়ালার জন্য সদৃশ হওয়া অসম্ভব, তার এরূপ ধারণা ভুল। বরং আমরা আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর বিশেষণাদির জন্য সদৃশ বর্ণনা করে থাকি আর তাঁর সত্তাকে তাঁর অবিকল বস্তু বা মিসল (مِثْلُ) হতে পবিত্র বলে মনে করি। পক্ষান্তরে, তাঁর সত্তার 'মিসাল' তথা 'সদৃশ'কে অসম্ভব জ্ঞান করি না।

বিশ্লেষণাত্মক অনুচ্ছেদ

সারকথা

যখন তুমি রূহের হাকীকত জেনে নিলে তখন ছাওয়াব এবং আখিরাতের আযাবও জেনে ফেললে। রূহ যখন দেহ ছেড়ে চলে যায় তখন তার হাল্কা ধারণা শক্তিও দেহ হতে উধাও হয়ে যায়। আর দেহের আকার আকৃতির কিছুই রূহের সঙ্গে থাকে না।

আর তুমি এটাও অবগত হয়েছ যে, রূহের স্থিতি দেহ ছাড়াও সম্ভব। প্রত্যেক মানুষের মরে যাওয়ার এবং এ দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার বিষয় জানা আছে। আর জানে যে সে তো মরা। জানে নিজের দেহ দাফন করা হয়েছে। যেমন দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় জানত। কবরে সে নেক ও বদ আমলের বদলা পাবে। প্রত্যেকের জন্য কবর হয়তো বেহেশতের বাগান হবে অথবা দোযখের গর্ত হবে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসে এসেছে ঃ

اَلْقَبْرُ اِمَّا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النِّيْرَانِ -

অর্থ ঃ কবর হয়তো জান্নাতের বাগান হবে। অথবা অগ্নিময় গর্ত হবে। যদি মানুষ নেকবখত হয় তাহলে নিশ্চিন্ত হালে থাকবে। আর সুখকর পরিবেশ হবে। অর্থাৎ এমন বাগানে থাকবে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। আর এরূপ সবুজময় উদ্যানে থাকবে যেখানে রয়েছে হুর ও গিলমান। আর রয়েছে পাক পরিষ্কার পান পাত্র ইত্যাদি। যেমন তার বিশ্বাস ছিল, আর নিজেকে মনে করত। এটাই কবরের প্রতিদান। যদি সে নেককার না হয় তখন যে সব আযাবের কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়ে গেছেন, তাতে অবস্থান করবে। এটাকেই কবরের আযাব বলা হয়। বস্তুতঃ কবর এ অবস্থারই নাম। তাতে প্রতিদান মিলবে বা আযাব হবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত হবে। যাকে দ্বিতীয় জন্ম বলা হয়। আত্মা এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন বাচ্চা মার উদর হতে বের হয়ে আসে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَاءَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ-

অর্থ ঃ বলে দাও, তাকে জীবিত করবেন তিনি, যিনি সর্বপ্রথম তাকে জীবন দান করেছিলেন। আর তিনি যাবতীয় সৃষ্টি কৌশল উত্তমরূপে জ্ঞাত।

আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলেন ঃ

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُوْنَ -

অর্থ ঃ তিনিই যিনি তোমাদের উপকারের জন্য সবুজ কাঁচা বৃক্ষ থেকে আগুন বের করেন। তাই তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও।

এসব উক্তি পুনরায় জীবিত হওয়ার পরিষ্কার প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে। আর আল্লাহই উত্তম জানেন বিশুদ্ধ বিষয়। আর আল্লাহর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা এবং অনুগ্রহ। আর করুণা হোক আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি। তাঁর সকল আল ও আসহাবের প্রতি।

বিশ্লেষণাত্মক পাদটীকা

৩৩. লতীফা-ই কলবী, ইলম-ই শরীয়ত ও তরীকত

ইলম-ই হাকীকত এখানে দিল (অন্তর) বলতে অন্তরের সূক্ষ্মতম ভাবাসক্তি (লতীফা-ই-কালবীকে) বুঝানো হয়েছে। গোলাকার নিম্নাংশ পর্যায়ক্রমে লম্বা মাংসের বিশেষ খণ্ড বুঝানো হয়নি। কেননা, নেক বা বদ আমলের দরুন উক্তরূপ মাংস খণ্ড সম্পূর্ণ উজ্জ্বল বা কালিমাচ্ছন্ন হয়ে যায় না। বরং এতে অন্তরের ভাবাসক্তি প্রভাবান্বিত হয়। আর শরীয়তের পথ অবলম্বনকারীদের পরিভাষায় প্রকৃত 'কলব' (অন্তর) এটাকেই বলে। এরূপ লতীফা-ই কলব-এর সম্পর্ক যাকে আভিধানিক অর্থে 'কলব' বলা হয় যা হচ্ছে মাংসের বিশেষ খণ্ড, এর সাথে এরূপ যেমন দৃষ্টিশক্তির সম্পর্ক রয়েছে প্রকাশ্য চর্ম-চোখের সাথে। যাদের ইলম-ই-শরীয়ত তথা শরীয়তে অলঙ্ঘনীয় নির্দেশাদির সাথে ইলম-ই-তরীকত তথা অন্তরের কার্যকলাপ (نَاسُوْتِ) অদৃশ্য ফিরিশতাজগত (مَلَكُوْتِ) অপূর্ব মহিমাজগত (جبروت) এবং নিরাকার জগত (لاهوت) অতিক্রম করার পর আল্লাহর অন্বেষণে সাধনাকারীর মর্যাদা অর্জিত হয় আল্লাহর দরবারে নিদর্শনাদির দর্শন লাভ হয়। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তথায় পৌঁছার তাওফীক দান কর। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে একনিষ্ঠতা, একাগ্রতা (ইখলাস) সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করে বলেছেন ঃ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ -

(আল্লাহর ইবাদত এরূপে কর যেন তুমি তাঁকে দেখছো। তবে যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও তাহলে তিনি যে তোমাকে দেখেন সে ধারণা পোষণ করে তাঁর আনুগত্য কর—) এ হাদীসে বর্ণিত প্রথম অবস্থাকে সূফীগণ 'মুশাহাদা' (সাক্ষাৎ দর্শন) এবং দ্বিতীয় পর্যায়কে 'হুযুরে কালবী' (অন্তর উপস্থিতি) বলে নামকরণ করেছেন। (মুফতী শাহ দীন)

বিদআতপন্থী সন্দেহ পোষণ করেছে। বলেছে এসব হাদীস আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى -

এর সাথে সাংঘর্ষিক। (অর্থ ঃ আর উঠাবে না কোনো বহনকারী অন্যের পাপের বোঝা) এরূপ মনে করা বা এরূপ স্থানান্তরিত হওয়াকে অসম্ভব (محال) মনে করা নিরেট মূর্খতা মাত্র। (মুফতী শাহ দীন)

৩৪. 'মুশাহাদা' নূর দর্শন

আত্মশুদ্ধির যাবতীয় পর্যায় অতিক্রম করার পর মুশাহাদা বা নূর দর্শন পর্যায় আসে। যার সর্বপ্রথম পর্যায় হল পাপ হতে 'তাওবা' করার পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায় হলো, আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত (تَزْكِيَه وَ تَصْفِيَه) করা। মন্দ অভ্যাস দূরীভূতকরণ এবং উত্তম ও প্রশংসনীয় অভ্যাস ও গুণাবলি অর্জন করার পর সর্বদা মুখে, অন্তরে, আত্মায় এবং নিবিড় ও গভীর রহস্যে নিমগ্ন হয়ে অর্থাৎ বস্তুজগত বিস্মৃত হয়ে আল্লাহতে বিলীন হওয়া।

৩৫. নেক ও বদ আমল অন্যের খাতে যাওয়া

বুখারী শরীফে প্রায় এরূপ অর্থবোধক হাদীস রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা থেকে হাদীসটি বর্ণিত। হাদীসটিতে আমলের দফতরের উল্লেখ নেই। বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীসের মর্মকথা এইরূপ ঃ

ইসলামের স্বীকৃত বিধান মতে একজনের নেক আমল অন্যের জন্য উৎসর্গ করা বৈধ ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর তাঁর নেক আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি পর্যায়ে নেক আমল বন্ধ হয় না।

(ক) সদকায়ে জারিয়ার ছাওয়াব মৃত্যুর পরও দানকারী লাভ করতে থাকে।

(খ) উপকারী জ্ঞান-এর ছাওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে।

(গ) পুণ্যবান ছেলে-সন্তান পিতামাতার জন্য নেক দোয়া করলে তাও পিতামাতা লাভ করেন।

৩৬. খাবে মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দর্শন লাভ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখা এবং

مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِيْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِيْ صُوْرَتِيْ -

—(যে আমাকে খাবে দেখবে সে অবশ্যই আমাকে দেখবে। কেননা, শয়তান আমার সুরত ধারণ করতে পারে না) এর অর্থ গ্রহণে আলিমগণ দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। ইমাম নাওয়াবী (রহঃ) কোনো কোনো আলিমদের অভিমত তুলে ধরে বলেছেন ঃ

فَقَدْ رَآنِيْ (অবশ্যই আমাকে দেখেছে) বাক্যের অর্থ হলো, তার দেখাটা নির্ভুল (رُؤْيَاهُ صَحِيْحَةٌ)। অর্থাৎ তার স্বপ্ন নির্ভুল। তা কল্পনা-প্রসূত অর্থহীন স্বপ্ন (اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ) নয় যাকে মনগড়া শয়তানী খেয়াল (تَسْوِيْلَاتُ شَيْطَانٍ) প্রসূত বলা যাবে। কেউ বলেছেন ঃ فَقَدْ رَآنِيْ (অবশ্যই আমাকে দেখেছে) বাক্যের অর্থ হলো ঃ فَقَدْ اَدْرَكَنِيْ

অর্থাৎ "সে অবশ্যই আমাকে অনুধাবন করেছে।" আর অনুধাবন করার জন্য নিকটবর্তী হওয়া এবং যাকে দেখা গেল তার মাটির নিচে বা মাটির উপরে হওয়ার শর্ত নেই। বরং শুধু অস্তিত্বশীল হওয়াই শর্ত। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দেহের অস্তিত্ব তো আছেই। সে কারণেই স্বপ্নে তার দীদার হয়।

আর কেউ বলেছেন, যদি নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্ট সুরতে দীদার হয় তখন তো সত্যিকারের দীদার হবে। অন্যথায় ব্যাখ্যা সাপেক্ষে দীদার (تَاوِيْلِ رُؤْيَاءَ) হবে।

কেউ বলেছেন, স্বপ্নে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন লাভ চাই তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্ট সুরতে হোক বা অনির্দিষ্ট কোনো সুরতে হোক, তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃত দর্শনই হবে। কেননা, খাবে দেখা সুরত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র আত্মার সদৃশ (مِثَالٌ) দর্শনই হবে। বিশুদ্ধতম মত এটাই। যা বুঝতে কষ্ট হয় না। (মুফতী শাহ দীন)

৩৭. مِثَالُ مُطَابِقٌ সদৃশপূর্ণ উপমা প্রসঙ্গ

'মিসাল-ই মুতাবিক বলে অসদৃশ উপমা হতে পৃথক ধারণা দেয়া হয়েছে। কেননা অসদৃশপূর্ণ উপমাকে مِثَالِ كَاذِبٌ (অসংলগ্ন উপমা) বলা হয়। এরূপ অসংলগ্ন উপমা বা 'মিসালই কাযিক' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সদৃশ হয় না। কাজেই এরূপ সুরত দেখলে হাদীসে বর্ণিত প্রতিদান লাভ হবে না। মুফতী শাহ দীন)

৩৮. আল্লাহর কি ছবি সুরত আছে?

আল্লাহ তায়ালার সত্তা আকারহীন। কেননা সুরতাকার দৈহিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য। যা পরিমাণ, অবস্থান, হালত, সীমানায় সীমাবদ্ধ এবং প্রান্তিক দিকসমূহের দ্বারা অর্জিত হয়। আর আল্লাহ তায়ালা তো দৈহিক বৈশিষ্ট্যাদি হতে মুক্ত। কারণ দেহ নানা উপাদানে গঠিত হয়। আর যা গঠিত হয় নানা অংশের সমন্বয়ে তারই উপাদানসমূহের মুখাপেক্ষী থাকে। বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা স্বয়ম্ভর অনিবার্যভাবে বিদ্যমান। আর মুখাপেক্ষিতা স্বয়ম্ভরতা এবং নিজ মহিমায় অনিবার্যিতভাবে বিদ্যমান সত্তা পরমুখাপেক্ষী হয় না। এটা তাঁর সত্তাগত অবস্থানের পরিপন্থী। আল্লাহর সত্তা যখন দৈহিক বৈশিষ্ট্যাদি বিমুক্ত সাব্যস্ত তখন দেহের জন্য অবধারিত সুরতাকার হলেও বিমুক্ত হবেন। তাই স্বপ্নে আল্লাহ তায়ালার দীদার লাভ যেমন নূর ইত্যাদি সুন্দরতম সুরতে দৃষ্ট হয় তা সদৃশ বিকাশের উপর মেনে নিতে হবে। কেননা, প্রকৃত আল্লাহর সত্তার বিকাশের উপর তা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। (মুফতী শাহ দীন)

৩৯. ইন্দ্রিয়ভূত বিষয়

প্রত্যক্ষ করা জ্ঞান বলে ইন্দ্রিয়ভূত বিষয়াদির বিকাশকে অভিহিত করা হয়। এরূপ জ্ঞানকে উপলব্ধিও বলে। এজন্যে ইন্দ্রিয়সমূহকে উপলব্ধির উপায়াদি (مَشَاعِرُ) বলা হয়। (মুফতী শাহ দীন)

৪০. 'আকল' জ্ঞান বলতে কী বুঝায়?

বিদ্যাগত বিশেষণকেও আকল তথা জ্ঞান বলা হয়। পূর্বে তার বর্ণনা এসেছে। আর এক শক্তিকেও আকল তথা জ্ঞান বলা হয়। যা মানুষের প্রকৃত অন্তরে (قَلْبٌ) জ্ঞানালোকরূপ বিরাজমান। যা দ্বারা জ্ঞানগত বিদ্যাসমূহ (عُلُوم نَظْرِىْ) অন্তর গ্রহণ করে থাকে। আর অনাবিষ্কৃত শিল্পকর্ম উপকরণের চিন্তা-ভাবনার যোগ্যতা মানুষ অর্জন করে। এরূপ জ্ঞানকে সূর্যের আলোর সাথে তুলনা করা হয়। কেননা, জ্ঞানের আলো জ্ঞানগত বিষয়াদির উপলব্ধির মাধ্যম হয়। যেমন সূর্যের ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়াদির পরিষ্কার ফুটে উঠর কারণ হয়। (মুফতী শাহ দীন)

৪১. ইলম ও দুধের উপমা

ইমাম বুখারী ইবনে উমরের (রাযিঃ) বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবে দুধ দেখার দ্বারা ইলম স্বপ্নের ব্যাখ্যায় উল্লেখ রয়েছে। ইলম এবং দুধের মধ্যে সম্পর্ক এটাই যে, দুধ দৈহিক খাবারের চাহিদা পূরণ করে আর ইলম অন্তরের জীবনের খোরাক। (মুফতী শাহ দীন)

৪২. ইযন (إِذْنٌ) প্রসঙ্গ

ইযন (অবকাশ দান) বা অনুমতি দানের উপর আলোচনার প্রথমে যে হাদীস উপরে এসেছে তা দ্বারাই বুঝে আসে। হাদীসটি হলো ঃ

مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ -

অর্থাৎ যে আমাকে খাবে দেখল সে আমাকেই দেখল।

৪৩. জিব্রাঈল দর্শন

প্রকৃত আকারে হযরত জিব্রাইল আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'বার দেখেছেন। একবার হেরা পর্বতের উপর। দ্বিতীয়বার মেরাজ রজনীতে। যেমন বুখারী ও মুসলিম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (মুফতী শাহ দীন)

৪৪. দাহইয়া কাল্‌বীর সুরতে জিব্রাঈল (আঃ)

বুখারী ও মুসলিম জিব্রাঈল (আঃ)-এর দাহইয়া কালবীর সুরত ধরার কথা উসামা ইবনে যায়েদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। (মুফতী শাহ দীন)

৪৫. মানুষের সুরতে জিব্রাঈল (আঃ)

হযরত জিব্রাঈল (আঃ) মানুষের সুরত ধরে বিবি মরিয়মের নিকট এজন্যে আগমন করেছিলেন যা তিনি হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর কথোপকথনে বুঝতে পারেন। তাঁর পরিচয় লাভ করেন।

হিব্রু ভাষায় 'মারয়াম' অর্থ সেবক। হযরত মারয়ামকে তার মাতা বায়তুল মুকাদ্দাস-এর খেদমতের জন্য মান্নত করেছিলেন। যে জন্যে তার নাম 'মারয়াম' (খাদেম) হয়।

জিব্রাঈলের শাব্দিক অর্থ হলো আল্লাহর বান্দা। আব্দুল্লাহ। 'জিবর' অর্থ হলো ক্ষমতাহীন বান্দা। ইস অর্থাৎ আল্লাহ। জিবর+ঈল=জিব্রাঈল। অর্থাৎ আল্লাহর বান্দা। তাফসীর ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতীম এ, হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরামা আলকামা হতে বর্ণনা এসেছে যে, হযরত জিব্রাঈলকে 'রূহুল কুদুস' (পবিত্রাত্মা)ও বলে। এরূপ তথ্য একটি হাদীসে এসেছে।

পরিশেষে আমাদের দোয়া হলো ঃ যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য। আর সালামত ও সালাম আমাদের নেতা মুহাম্মদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি, তাঁর সকল আল ও আসহাবের প্রতি।

উপসংহার

এ পর্যন্ত আমরা অনেক চড়াই-উৎড়াই অতিক্রম করে 'রূহ' বা আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে যথেষ্ট ঘাম ঝাড়িয়েছি এবং একই সাথে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদেরকেও জ্ঞান চর্চার বহু উদ্যানে পরিভ্রমণ করিয়েছি। কিন্তু তাই বলে সব কিছুই যে বলা হয়ে গেছে কিংবা ব্যক্ত করা হয়েছে, তা বলার অবকাশ নেই। হয়তো এমন অনেক কথা বা দিক রয়ে গেছে যা বলা হয়নি বা উদঘাটন করা হয়নি। সে যাই হোক, এত কিছুর পরও কিছু একটা থেকে যায়, বা কিছুটা রেশ অব্যাহত থাকে। এই থাকাকে কেন্দ্র করেই এই পর্যায়ে আমরা সুধীমহলের সামনে পূর্বোক্ত আলোচনার সম্যক সারাংশ তুলে ধরার প্রয়াস পাব। এক্ষেত্রে আমরা এই বিষয়ের মূল উপাত্তগুলোর নির্যাস পৃথকভাবে পরিবেশন করতে চেষ্টা করব। আশা করি আমাদের এই চেষ্টা ও যত্ন অনাহুত বা বাহুল্যতার আবর্তে নিপতিত হবে না।

রূহ এবং নাফস সম্বন্ধে কুরআন শরীফ নাযিল হওয়ার পূর্বে যে ধ্যান-ধারণা বিদ্যমান ছিল, তা বহুলাংশে সংশোধিত হয়ে যায় কুরআন শরীফ নাজিল হওয়ার পর। আল কুরআনে রূহ এবং নাফস সম্পর্কে যে বিশদ বিবরণ এসেছে, এর পর এ নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশই থাকার কথা নয়। কিন্তু তথাপিও বিজ্ঞ মনীষীদের কথায় অনেক সদৃশ ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এবার লক্ষ করা যাক, এগুলোর স্বরূপ কী এবং কেমন?

কুরআনুল কারীম নাজিল হওয়ার পর রূহ এবং নাফস শব্দের ব্যবহারে খ্রিস্টান এবং নব্য-আফলাতুনী মতবাদ এবং ভাবধারার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তারা রূহ মানবিকতা, ফিরিশতা বা তৎসংক্রান্ত অর্থে এবং ঐশী অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে এরিস্টটলের মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণই বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। আরবে নব্য-আফলাতুনী মতবাদের প্রবর্তক হচ্ছেন আল-কিনদী। আরবের প্রাথমিক দর্শন শাস্ত্রে তিনি এই মতবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর লেখনী ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, "মানবাত্মা আদি কারণ হতে নির্গত হয়েছে।" প্রথমতঃ জীবনীশক্তি বা ধীশক্তির মাধ্যমে এবং তারপর বিশ্ব আত্মার মাধ্যমে। উহা এই বিশ্ব আত্মারই অংশ। সুতরাং এটা

প্রণিধানযোগ্য যে, মানবাত্মা অবিনশ্বর স্বর্গীয় অথবা বোধগম্য সত্তা। এর মুক্তি ও নিষ্কৃতি নির্ভর করে পার্থিব জগতের দেহজ কলুষ হতে বিমুক্ত হয়ে চিরস্থায়ী আত্মিক সত্তা জগত-সংসারে প্রত্যাবর্তনের মাঝে। আত্মার প্রকৃতি ও পরিণাম সম্বন্ধে মতবাদ এটাই। এই মতবাদ পরবর্তী মুসলিম সুফীবাদেরও অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু বলে স্বীকৃত।

এককালে আত্মা এবং আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক যে মতবাদ মুসলমানদেরকে প্রভাবিত করেছিল, তা ধর্মীয় তর্কশাস্ত্রে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এই নিবন্ধের মাঝে আমরা মুসলিম মনীষীদের কতিপয় বিখ্যাত মতবাদ উপস্থাপন করতে প্রয়াস পাব। যাতে করে প্রকৃত সত্যকে গ্রহণ করার পথ সহজতর হয়ে উঠে।

১। আল আশআরী উল্লেখ করেছেন যে, রাফিদিয়া মতবাদ অনুসারে 'রূহুল্লাহ' হযরত আদম (আঃ)-এ মূর্ত হয়েছে এবং পরে নবী ও পয়গাম্বরগণ ও অন্যান্যদের মধ্যে দেহান্তরিত হয়েছে। এটা মূলতঃ শেরেকী মতবাদ। এটা কোনোক্রমেই গ্রহণ করা যায় না। তাছাড়া আরও বিতর্কমূলক মতবাদ এই যে, মানুষ দেহ (জিসম) মাত্র। দেহ এবং রূহ কেবল রূহ মাত্র। তাঁর বর্ণনায় মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনো উক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

২। আল বাগদাদী তার আল্ ফারক আল্ ফিরাক গ্রন্থে মানব প্রকৃতি সম্পর্কে একইরূপ নাস্তিক মতবাদ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, দেহান্তর মতবাদ Plato এবং ইহুদিগণ পোষণ করে। তাছাড়া তিনি হুলুলিয়া সম্প্রদায়ের অবতারবাদী মতবাদও বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে হাল্লাজিয়াগণও তাদেরই অন্তর্গত। তার মতবাদ এরূপ ঃ "আল্লাহর জীবনের জন্য রূহ এবং পরিপুষ্টির দরকার হয় না। কারণ সব আরওয়াহই মাখলুক বা সৃষ্টি।" এ মতবাদ খ্রিস্টানী বিশ্বাস পিতা, পুত্র এবং আত্মার অনন্ত সত্তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

৩। ইবনে হাযম তাঁর রচিত কিতাব আল ফাস্ল ফী আল মিলাল গ্রন্থে মানুষের আত্মা অর্থে নাফস এবং রূহ উভয়ই প্রয়োগ করেন। যারা মানুষের আত্মা অন্য দেহে ধারণ করে পুনরায় জন্মলাভ করে বলে স্বীকার করেন তাদেরকে তিনি ইসলামের গন্ডির বহির্ভূত বলেছেন। তারা আদৌ মুসলমান নয়। এই শ্রেণির ব্যক্তিবর্গের মধ্যে চিকিৎসাবিদ দার্শনিক

মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া আল রাযীকেও তিনি অন্তর্ভুক্ত করেন। কোনো কোনো আশআরীয়া রূহ অবিরত পুনঃসৃষ্টির যে মত গ্রহণ করেন তিনি তা পুরাপুরি বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর অভিমত হচ্ছে এই যে, সকল আদম সন্তানের আত্মাকে এবং ফিরিশতাদেরকে আল্লাহ পাক আদমকে সিজদা করতে নির্দেশ দেয়ার পূর্বে এক সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন এবং সকল আত্মা প্রথম আকাশে বারযাখে অবস্থান করে। তারপর যথা সময়ে ফিরিশতাগণ তাদেরকে ভ্রূণের মধ্যে ফুঁক দিয়ে প্রবেশ করায়। এর জন্যে আল্ কুরআনের সূরা ৪ আয়াত ৭০ এবং সূরা ৭ আয়াত ১৭১ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করেছে।

৪। আল শাহরাস্তানী স্বীয় গ্রন্থ কিতাব আল মিলাল ওয়া আল নিহাল-এর প্রথম খণ্ডে পৌত্তলিক আরবদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভে বিশ্বাস সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে নাফস অথবা রূহ শব্দের প্রয়োগ করেননি, বরং তিনি বলেছেন ঃ পৌত্তলিক আরবেরা মনে করত রক্ত ভূতুড়ে পাখি হয়ে প্রতি শতাব্দীতে কবর দেখতে আসে। উক্ত গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে তিনি রূহ সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মত এবং বিরোধী মতবাদ বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি হুনাফা অর্থাৎ সঠিক পন্থাবলম্বী সাবিয়াদের বাক-বিতণ্ডার কথাও বর্ণনা করেছেন। আল সাবিয়াগণ মূলতঃ দ্বিত্ববাদী, নির্গমনবাদী এবং নাস্তিকতাবাদী। সাবিয়াদের মত সম্বন্ধে তাঁর প্রদত্ত বর্ণনায় ইখওয়ান আল সাফার অভিমত অবিকল প্রতিফলিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, মানুষ দেহধারী অবয়ব এবং বিদেহী নফসের সমন্বয়ে গঠিত এবং নাফসের মূল বস্তু (জাওহার) আকাশমণ্ডল (আল আফলাক) হতে আগত। তিনি রূহানী শব্দটি ভালো মন্দ সব আত্মা সম্পর্কে প্রয়োগ করেছেন এবং মানব প্রকৃতির বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ মানুষের আত্মা তিন প্রকার। যথা ঃ (ক) উদ্ভিদ (খ) জৈব এবং (গ) মানবিক। প্রত্যেক প্রকারের নিজস্ব উৎস, প্রয়োজন, স্থান এবং শক্তি নির্দিষ্ট আছে। এই বর্ণনা ইখওয়ান আল সাফার বর্ণনারই অনুরূপ।

বস্তুতঃ শাহরাস্তানী নব্য আফলাতুনী ভাবধারা বর্জন করেছেন। উক্ত ভাবধারা মতে মানবাত্মা (নুফুস) অলৌকিক জগতের আত্মার উপর নির্ভরশীল (আল নুফুস আল রূহানিয়াত)। তিনি হেরমেটিক মতবাদও বর্জন করেছেন। উক্ত মতবাদ অনুসারে নাফস আসলে পাপপূর্ণ, আল

রূহের মুক্তিলাভ ঘটে, জড়দেহ হতে এর মুক্তি লাভে। এরিস্টটল মানবাত্মার যে বিশ্লেষণ করেছেন, তা De Anima-তে দেখানো হয়েছে এবং Aleaxander of Aphrodisias এবং Prophyry কর্তৃক প্রচারিত হয়েছে। তবে, আরবের দার্শনিক আল্ কিনদি এবং আল্ ফারাবী প্রমুখ উক্ত দার্শনিকতত্ত্ব অবিকল গ্রহণ করেছেন। তাদের প্রত্যেকেই এক একখানা 'কিতাব আল্ নাফস' লিখেছেন এবং ইবনে সীনা লিখেছেন দুই খানা। আল ইবনে মিসকাওয়াহ লিখেছেন— 'তাহজীব আল্ আখলাক। উক্ত কিতাবের বিষয়বস্তু অন্যান্য কিতাবগুলোর অনুরূপ অপার্থিব। আনুষ্ঠানিক মনস্তত্ত্বের নৈতিক সূত্র নাফস এবং রূহ শব্দ বিভিন্ন প্রকার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে গ্রিক এবং খ্রিস্টান ইতিবৃত্তে এবং কুরআন ও হাদীসে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আল কুরআনে নাফস এবং রূহ শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তবে, হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, প্রাথমিক হাদীস সংগ্রহে ইমাম মালেক (রহ)-এর 'মুয়াত্তা' একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। উক্ত গ্রন্থের তালাক অধ্যায়ে ৯৫ নং হাদীসে 'নাসামা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। নাসামা অর্থ ক্ষুদ্র কীট সদৃশ কিছু। রূহকে বুঝাতে এই শব্দের ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু আল কুরআনে 'নাসামা' শব্দের ব্যবহার নেই। বরং আত্মা অথবা তেজের পরিবর্তে নাফস শব্দের ব্যহার করা হয়েছে। কিন্তু মুসনাদে ইবনে হাম্বলে নাসাম, (৬ঃ৪২৫), নাফস (১ঃ২৯৭) এবং নাফসও রূহ (৪ঃ২৮৭, ২৯৬) ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দত্রয়ের অর্থ ও মর্ম প্রায় সমার্থক বলে ধরে নেয়া হয়েছে। অধিকন্তু সহীহ মুসলিমে (৮ঃ৪৪) মানবাত্মা অর্থে রূহ এবং আরওয়াহ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া সহীহ বুখারীতেও (৪ঃ১৩৩) মানবাত্মা বুঝাতে রূহ এবং আরওয়াহ শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

আল শাহরাস্তানী নাসামা বা মানবাত্মা শব্দের প্রয়োজনানুভূত ব্যাখ্যা দান করেছেন এবং গ্রিক দর্শনকে বহুলাংশে সমর্থন করেছেন। কিন্তু এত কিছু ডামাডোলের পরও দার্শনিকগণ গ্রিক মনস্তত্ত্বের ভাবধারাকে সনাতন ইসলামের ভাবধারার উপর জোর করে চালাতে পারেননি। মুতাকাল্লিমগণ এবং আরো বহু মুসলিম মনীষী আল কুরআনের পরিভাষাকে বিস্তৃত করেছেন, কিন্তু "আত্মা আল্লাহ পাকের প্রত্যক্ষ সৃষ্টি এবং উহা বিভিন্ন গুণের অধিকারী" এই সনাতন মতই তারা পোষণ করেছেন।

৫। এরিস্টটলের মত হচ্ছে এই যে, আত্মা অশরীরী। ইসলামি শাস্ত্রে প্রখ্যাত দার্শনিক আল গাজ্জালীর প্রভাবে এই মত মুসলিম মতবাদে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। কলিকাতা হতে প্রকশিত 'তাহানাবীর' পরিভাষা অভিধানে মানুষের 'রূহ' এবং 'নাফস' সম্বন্ধে গাযযালীর মতবাদ বিষয়ক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, মানুষ একটি আধ্যাত্মিক বস্তু। (জাওহারে রূহানী) তা জড়দেহে সীমিত বা খোদিতও নয়, এর সাথে সংযুক্তও নয় এবং তা থেকে বিচ্ছিন্নও নয়। এর অস্তিত্ব ঠিক আল্লাহর অস্তিত্বের ন্যায়। কেননা আল্লাহ্ জগতের মধ্যেও নহেন, কিংবা জগতের বাহিরেও নহেন। এতদর্থে ফিরিশতাগণের অস্তিত্বও অনুরূপ। বস্তুতঃ আত্মার জ্ঞান এবং অনুভব শক্তি আছে। সুতরাং আত্মা আকস্মিক বা আপতনিক নয়। গাযযালীর তাহাফুত আল ফালাসিফা গ্রন্থেও একথাই বলা হয়েছে। আর আল্ রিসালাত আল্ লাদুন্নিয়ার দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'রূহ' এবং 'কালব' (হৃদয়) সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। যে সত্তা বুদ্ধিবৃত্তির যাবতীয় কর্মকাণ্ডের আরাধ্য স্থান। এই নামগুলো তারই পরিচায়ক। তা জৈব আত্মা হতে পৃথক। জৈব আত্মা সূক্ষ্মানুভূতিশীল, কিন্তু তা নশ্বর। অবিনশ্বরতার ছাপ বা রূপরেখা এতে নেই। এই জৈব আত্মা হলো রিপুর আবাসভূমি। গাজ্জালী (রহঃ) অশরীরি রূহকে কুরআনুল কারীমে উল্লিখিত 'নাফসে মুতমায়িন্না' এবং 'আর্ রুহুল আমরী'র সাথে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। তারপর তিনি নাফস শব্দটি মানুষের জৈব অর্থাৎ নিম্নস্তরের প্রকৃতি অর্থে ব্যবহার করেছেন। এই জৈব বা নিম্নস্তরের প্রকৃতিকে চরিত্রের নৈতিকতা বা নীতি ও আদর্শের জন্য সংযত রাখা প্রয়োজন।

বস্তুতঃ ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আস্তিক দার্শনিকদের অন্তর্ভুক্ত। যে সকল দার্শনিক আল্লাহর উপর বিশ্বাসী, তিনি তাদের পর্যায়ভুক্ত ছিলেন, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তিনি কোনো কোনো মুতাযিলা অথবা শিয়া মতবাদও সমর্থন করতেন, কিন্তু তার সমর্থনের ফলেও তা কোনোদিন ইসলামে প্রাধান্য লাভ করেনি। প্রখ্যাত বিশ্লেষণবাদী দার্শনিক ধর্মতত্ত্ব বিশারদ ফখরুদ্দীন রাজী (রহঃ) তাঁর ঐ মত গ্রহণ করতে সম্মত ছিলেন না। তৎপ্রণীত 'মাফাতিহুল গায়ব' গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের ৪৩৫ পৃষ্ঠায় আল্ কুরআনের সূরা ১৭ : ৮৭ আয়াতের

টীকায় তিনি গাযযালীর 'তাহাফুত' হতে মতামত সম্বন্ধীয় উক্তি উদ্ধৃত করেন। কিন্তু মাফাতিহের ৪৩৪ পৃষ্ঠায় নাফস যে দেহযুক্ত এই তত্ত্বের সত্যতা তিনি স্বীকার করেন। মুহাস সালের হাশিয়ায় তদীয় 'মায়ালীমে উসুলুদ্দিন'-এ তিনি ঐ সকল দার্শনিকের মত ভিত্তিহীন বলে মত প্রকাশ করেন, যারা বলেন যে, নাফস একটি পদার্থ (জাওহার)। কিন্তু তা দেহ বৈশিষ্ট্য (জিসম) বা দৈহিক নয়।

৬। ইমাম আল বায়যাবী (রহঃ) তৎপ্রণীত বিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব পদ্ধতি সংক্রান্ত 'তাওয়ালি আনওয়ার' গ্রন্থে রূহ ও নাফস বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থটির ভাষ্য রচনা করেছেন, আল ইস্কাহানী এবং এর শব্দার্থ বিশ্লেষণ করেছেন আল জুরজানী (রহঃ)। উক্ত গ্রন্থে তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবতারণা করেছেন।

(ক) বিদেহী পদার্থের শ্রেণিবিভাগ, (খ) আসমানী জ্ঞান (গ) বিভিন্ন আসমানী গোলকের আত্মা, (ঘ) মানবাত্মার দেহ হীনতা (ঙ) আত্মার সৃষ্টিতত্ত্ব, (চ) দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক, (ছ) আত্মার অবিনশ্বরতা।

ইমাম বায়যাবী (রহঃ)-এর বিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বের বিশ্লেষণ হচ্ছে এই যে, যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অদ্বিতীয়, তাই তিনি সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র প্রজ্ঞা বা আকল। এই আকল যা সর্বপ্রথম আল্লাহপাক থেকে উদ্ভূত হলো, তাই সমস্ত শক্তি সম্ভাবনার আদিকারণ বা ইল্লাত। উহা দেহ (জিসম) নয়, এমনকি উহা মৌলিক পদার্থও (হায়ূলা) নয়। এবং এর কোন আকার (সুরত) নেই। আর এটাই (আত্মা) নাফস এবং ফালাক (আকাশ, কক্ষপথ) সম্বলিত অপর একটি প্রজ্ঞার গৌণ কারণ বা সবব।

আর দ্বিতীয় প্রকার প্রজ্ঞা হতে তৃতীয় প্রকার প্রজ্ঞার উদ্ভব। আর এই প্রকারেই দশম পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। দশম পর্যায়ে প্রজ্ঞার নাম রূহ, যে রূহ সম্বন্ধে আল কুরআনের ৭৮নং সূরার ৩৮নং আয়াতে উল্লেখ আছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম বায়যাবীর আন্ওয়ারুত্ তানজীল ২ ঃ ৩৮৩ পৃষ্ঠায় বিবরণ রয়েছে। জড় জগতে এই রূহের সক্রিয় প্রভাব বিদ্যমান এবং উহাই মানব আত্মার উৎপাদক (আরওয়াহ)। এই প্রজ্ঞার পরবর্তী স্তরে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ফিরিশতাগণ। দার্শনিকগণ এদের নামকরণ করেছেন— আননুফুসুল মালাইকা। আর যারা নিম্ন পর্যায়ের নুফুস তারা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। পার্থিব ফিরিশতা যাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সাধারণ উপাদানসমূহ

এবং পার্থিব আত্মাসমূহ। যেমন বিচার বুদ্ধি জ্ঞানসম্পন্ন আত্মা (আন্নুফুসে নাতিকা) যা ব্যক্তি সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ ছাড়া দেহহীন সত্তাও বিদ্যমান। যাদের প্রভাব বা প্রতিপত্তি নেই। তারাই হলেন ফিরিশতা এবং জিন। ফিরেশতাদের কেউ কেউ উত্তম (আল করুবিয়ূন) আবার কেউ কেউ অধম (আশ্ শায়াতীন)। আর জিনরা ভালো মন্দ উভয় প্রকার কাজের ক্ষমতা রাখে। আল বায়দাবী সূরা বাকারার ২৮নং আয়াতের ভাষ্য প্রসঙ্গে এরূপ শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। তাঁর মনস্তাত্ত্বিক অভিমত ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-এর অভিমতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং গাযযালী (রহঃ)-এর কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। আত্মার দেহহীনতা সম্বন্ধে তিনি (তাজাররুদুন নাফস) পাঁচটি যুক্তিপূর্ণ হেতুবাদ উপস্থাপন করেছেন। এর চারটি কুরআনের আয়াত এবং একটি হাদীস। কিন্তু সমালোচকগণ মন্তব্য করেছেন যে, তাঁর উক্তিসমূহ দ্বারা শুধু প্রমাণিত হয় যে, আত্মা দেহ হতে স্বতন্ত্র।

তারপর তিনি এই যুক্তি প্রদান করেন যে, দেহ সম্পূর্ণ হলেই নুফুস সৃষ্টি হয়। নাফস দেহের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এর সাথে ঘনিষ্ঠও নয়। তবে তাদের সম্পর্ক প্রেমিক ও প্রেমিকার আকর্ষণের ন্যায়। নাফসের সম্পর্ক রূহের সাথে এবং রূহ হৃদয় থেকে উদগত এবং সূক্ষ্ম সারবান অণু পরমাণু দ্বারা গঠিত। যুক্তি বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন নাফস এক প্রকার শক্তি উৎপাদন করে। সেই শক্তি রূহের সাথে সর্ব শরীরে প্রবহমান থেকে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথাযথ ক্রিয়াকলাপ চালু রাখে এবং বিবিধ ক্রিয়াকর্মের শক্তি অনুভবমান আর এগুলোই বাহ্য পঞ্চেন্দ্রিয় এবং আভ্যন্তরীণ পঞ্চশক্তি। অর্থাৎ অনুভূতি যোগাযোগ পরিবহন শক্তি। যেমন কল্পনা শক্তি, অনুধাবন শক্তি, স্মৃতিশক্তি (আল্ মুহাররিকা) যা ইচ্ছা প্রসূত (ইখতিয়ারিয়া) এবং স্বভাবসিদ্ধ (তাবঈয়া)।

৭। রূহ এবং নাফসের উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রচলিত মুসলিম অভিমত ইবনে কায়্যিম আল্ যাওজিয়া প্রণীত 'কিতাবুর রূহ' নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের এক বিংশতি অধ্যায়ের মধ্যে ঊনবিংশতিতম অধ্যায়টি নাফসের বিশিষ্ট প্রকৃতির সমস্যাদি আলোচনায় নিয়োজিত। তিনি আশয়ারী এবং আল রাযীর অভিমতের সারাংশ উদ্ধৃত করেছেন। মুতাকাল্লিমগণ মনে করেন, মানুষ

শুধু অনুভূতিশীল দেহ সর্বস্ব জীব। আল রাযীর এই অভিমত তিনি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, সকল ধীশক্তি সম্পন্ন মানুষই বিশ্বাস করে যে, মানুষ আত্মা এবং দেহের সমন্বয়ে গঠিত। তাঁর মতে রূহ এবং নাফস অভিন্ন। রূহ নিজেই দেহী। অনুভূতিক্ষম দেহ হতে সূক্ষ্মতার জন্য স্বতন্ত্র, আলোকের স্বভাববিশিষ্ট, উন্নত, ওজনে হালকা, জীবন্ত, চলমান এবং গোলাপ ফুলের অন্তর্গত পানির ন্যায় দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। উহা সৃষ্ট কিন্তু চিরস্থায়ী। নিদ্রাকালে সাময়িকভাবে উহা দেহ ত্যাগ করে যায়। দেহের মৃত্যুকালে উহা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং মুনকার ও নাকিরের প্রশ্নের জবাব দেয়ার নিমিত্ত আবার দেহে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু নবী এবং শহীদগণ এভাবে পুনরায় দেহে ফিরে আসেন না। তারপর রূহ কিয়ামত পর্যন্ত কবরে অবস্থান পূর্বক বেহেশতী সুখ অথবা দুঃখ যন্ত্রণার পূর্বস্বাদ উপভোগ করে। এ পর্যায়ে ইবনে হাযমের অভিমত খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, আদম সন্তান-সন্ততির রূহ আল বারযাখে অবস্থান করে যতদিন পর্যন্ত না তাদেরকে ভ্রূণের মধ্যে প্রবিষ্ট করান না হয়। কিন্তু ইবনে কাইয়্যিম এই মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি রূহের দেহিত্ব সম্পর্কে ১৬টি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, বিরোধী যুক্তিতর্কের ২২টি খণ্ডনমূলক উত্তর দিয়েছেন এবং ২২টি প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর প্রদান করেছেন। তিনি মূলতঃ সনাতন ইসলামের মতবাদ প্রকাশ করেছেন।

৮। সূফীবাদের গোড়ার দিকে সুফীগণ রূহের জড়দেহিতা স্বীকার করতেন। আল কুশায়রী স্বীয় 'রিসালাত' গ্রন্থে এবং আল হুযবিরী স্বীয় 'কাশফুল মাহজুব' গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। উভয়ের অভিমত হচ্ছে এই যে, রূহ সূক্ষ্ম সৃষ্টি পদার্থ (আয়ন) বা দেহ (জিসম) অনুভূতিশীল শরীরে সংস্থাপিত, ঠিক যেমন রস সংস্থাপিত হয় সবুজ বৃক্ষলতায়। নাফস সকল প্রকার দোষমুক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কিন্তু সব কিছু মিলিয়েই মানুষ গঠিত।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) রূহের অলৌকিকতা সম্বন্ধে দার্শনিক যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করা সত্ত্বেও অপর একটি আধ্যাত্মমূলক ব্যাখ্যা প্রসার লাভ করেছে। এই ব্যাখ্যাটি আমরা 'ইবনুল আরাবী' হতে পাই। তিনি বস্তুসমূহকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। (ক) আল্লাহ যিনি স্বয়ম্ভূ ও

স্রষ্টা। (খ) পৃথিবী এবং (গ) একটি তৃতীয় জগত। এই তৃতীয় জগতের নিশ্চিত কোনো সংজ্ঞা নেই। কিন্তু এর দৈবাধীন স্থিতি আছে। যে স্থিতি সমস্ত বাস্তবতার সাথে বিজড়িত এবং সকল বস্তুর ও পৃথিবীর বিশিষ্ট প্রকৃতির আদি উৎস। সমস্ত বাস্তবতার মধ্যে এটাই বিশ্বজনীন সার বাস্তবতা। মানুষ মধ্যবর্তী সৃষ্টি (বারযাখ) হিসেবে ঐশী সত্তা ও সৃষ্টি জগতের মধ্যে যোগ সাধন করে এবং খলীফা হিসেবে শাশ্বত গুণাবলি এবং সৃষ্টি বস্তুসমূহের মধ্যে সংযোগ সাধন করে। তার জৈব আত্মার (রূহ) উদ্ভব ঐশী প্রাণবায়ু অনুপ্রবেশের দরুন, বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন আত্মার (নাফসে নতিকা) উদ্ভব সর্বব্যাপ্ত আত্মা হতে (নাফসে কুল্লিয়া) এবং দেহের উদ্ভব জাগতিক উপাদান হতে। মানুষের খলীফা হিসেবে মর্যাদা এবং দিব্যসত্তার সাথে তার সাদৃশ্য সর্বব্যাপ্ত সত্তা হতে উদ্ভুত। তা বহুনামে পরিচিত! পবিত্র আত্মা (রুহুল কুদুস) সর্বোচ্চ জ্ঞান, প্রতিনিধি (খলীফা) পরিপূর্ণ মানব (ইনসানুল কামিল) এবং নিয়ন্ত্রিত জগতের রূহ (আলমে আমর)। আলমে আমরকে ইমাম গাযযালী (রহঃ) আল্লাহর প্রত্যক্ষ সৃষ্টি বলে বিবেচনা করেন। তৎপ্রণীত 'ফুসুস' কিতাবে তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ আল্লাহ্ স্বয়ং নিজের নিকট এরূপে আত্মপ্রকাশ করেন যে, সেই আত্মপ্রকাশই তাঁর সত্তার বিকাশস্থল। এই 'স্থলে' থাকে একটি রূহ, তিনিই হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ্ পাকের খলীফা এবং পরিপূর্ণ মানব। তিনি রূহের স্বরূপ এবং মূলসত্তা সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। তিনি যে সকল অভিমত উদ্ধৃত করেছেন এগুলোর অধিকাংশই গাযযালীর তাহাফুত গ্রন্থ হতে সংগৃহীত। মতবাদের বিভিন্নতায় তিনি আপত্তিকর কিছু আছে বলে মনে করেন না। কারণ সকলেই একমত যে, রূহ সৃষ্ট। নাফস এবং রূহ সম্বন্ধে লিখিত পুস্তিকায় কী উপায়ে রূহের গুণাবলি উৎকর্ষ সাধন করে এবং নাফসকে দমন করে মানুষ পূর্ণ মানবের মর্যাদা অর্জন করে, তা তিনি বর্ণনা করেছেন। তবে, ইবনুল আরাবীর সমকালীন কবি ইবনুল ফারিদ সময় সময় তার নিজের রূহকে শনাক্ত করেছেন এমন বস্তুর সাথে, যা হতে ভালো কিছু উৎসারিত হয়। আল তাঈয়া আল কুবরা কাব্য গ্রন্থের হাশিয়ায় এর আলোচনা স্থান পেয়েছে। আর তিনি নিজের রূহকে এমন মেরুর সাথে শনাক্ত করেছেন, যাকে কেন্দ্র করে আসমানসমূহ আবর্তন করে। আল তাঈয়ার ভাষ্যকার আল কাশানী

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন—এই শনাক্তকরণ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ রূহ (রূহুল আরওয়াহ) এবং সর্বোচ্চ মেরুর সাথে। কাব্যগ্রন্থের ব্যাখ্যাসমূহ সংকলনকারী বলেন, আল্লাহর অবতার (হুলুল) হওয়া এবং তাঁর সাথে অভিন্ন ভাবে যুক্ত হওয়া (ইত্তিহাদ) অসম্ভব। কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে (ফানা) আল্লাহর নাফসের সাথে রূহ এবং নাফসের মিলন (ওয়াসুল) সম্ভবপর। কারণ আল্লাহর নাফসই সকল মানুষের নাফস।

শায়খ আবদুল কাদীর জ্বিলানী-(রহঃ) এই রূপ প্রকার স্থিতিকে সরাসরি সর্বেশ্বরবাদ রূপে আখ্যায়িত করেছেন। আল্ ইনসানুল কামিল গ্রন্থে উল্লিখিত রূহুল কুদ্স, রূহুল আরওয়াহ এবং রূহ আল্লাহর ঐশী সত্তার (আল হাক্কু) বিভিন্ন দিকে বিশেষ প্রকাশ বুঝায়। এই সব অসৃষ্ট এবং 'কুন' (হও) আদেশের অন্তর্গত নহে। জ্ঞান ও অনুভূতি সম্পন্ন সমস্ত অস্তিত্বের আত্মাসমূহ এই আধ্যাত্মিক ঐশী সত্তার (যাত) মধ্যে নিহিত। সর্ব অস্তিত্ব আল্লাহর নাফসে স্থিতিশীল এবং তাঁর নাফস ও তাঁর মূল সত্তায় স্থিতিশীল। তাছাড়া অনুভূতি সম্পন্ন বস্তু মাত্রই সৃষ্ট আত্মার (রূহ) অধিকারী। 'রূহান মিন্ আমরিনা' আয়াতে (২৪ঃ৫২) সুস্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর আমর বা অনুজ্ঞা হিসেবে পরিচিত ফেরেশতা (যা আল্লাহর সত্তার একটি বিশেষ দিক) হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূহে সংযোজিত করে দেয়া হয়। ফলে সেই রূহে এলাহী হাকিকাতি মুহাম্মাদিয়া রূপে প্রকাশ পায় এবং সেই কারণেই তিনি পূর্ণ মানবে (اَلْاِنْسَانُ اَلْكَامِلُ) পরিণত হন। এই রূহ হচ্ছে মানবীয় নাফসের একটি সুনির্দিষ্ট স্বভাব এবং এর পাঁচটি পরিচিতি বিশেষণ রয়েছে। যথা–

(ক) জৈব حَيْوَانِيَّة (খ) অন্যায় আদেশকারী (اَمَّارَة) (গ) স্বতঃপ্রবৃত্ত (اَلْمُلْهِمَة) (ঘ) ভর্ৎসনাকারী (لوامة) এবং (ঙ) প্রশান্ত (مُطْمَئِنَّة) আর ঐশী গুণরাজি যখন নাফসের মধ্যে প্রতিভাত হয়, তখন সেই নাফসের অধিকারীর (عَارِفْ) নাম পরিজ্ঞাত পরম সত্তার (مَعْرُوفْ) নাম, গুণ ও সত্তায় পরিণত হয়।

৯। রূহ বা আত্মাকে কুরআনুল কারীমে আল্লাহর আদেশ বলে বলা হয়েছে। (اَلرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ) আর মানুষ সৃষ্টির আগে আত্মার

সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের মৃত্যুর পরেও আত্মার বিনাশ ঘটবে না। আত্মা চিরঞ্জীব ও অমর। আল্ কুরআনে আত্মার স্বরূপ উদঘাটন করে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ -

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করব। কিন্তু ইসলাম আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তিতে (Transmigration of soul) বিশ্বাস করে না। এই মতবাদ অনুযায়ী আত্মা মোক্ষ লাভের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন দেহ গ্রহণ করতে থাকবে, ইসলাম এই মতবাদ পোষণ করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে মৃত্যুর পরও আত্মার নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব চলতে থাকবে।

আধুনিক যুগের অন্যতম দার্শনিক 'কান্ট' বলেন যে, আমাদের নৈতিক চেতনায় আমরা পুণ্য ও শান্তির পূর্ণ সংহতি বা মিলনের আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু বাস্তব জীবনে তার বিপরীত দেখতে পাই। তাই, আমাদের বিশ্বাস মৃত্যু জীবনের শেষ নয়। পরকালে ভালো ও মন্দ কাজ সে ফলভোগ করবে এবং উন্নততর অথবা অধঃপতিত জীবন লাভ করবে। সুতরাং আত্মার অবিনশ্বরত্ব নৈতিকতার ভিত্তি।

আধুনিককালে নীট্‌শ তার চিরন্তন পুনরাবর্তন মতবাদে (Theory of Eternal Recurrence) আত্মার অমরতা সমর্থন করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে, জগতে শক্তি (Energy) অপরিবর্তনীয় ও সসীম। দেশ (Space) আত্মগত। কাজেই অবাস্তব। কাল বস্তুগত। ইহা সীমাহীন প্রক্রিয়া। কাজেই শক্তির ধ্বংস নেই। পৃথিবীতে যা ঘটছে তা বারবার ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটতে থাকবে।

কিন্তু নীটশের এই চিরন্তন পুনরাবর্তনবাদে নিরন্তর প্রগতির কোনো স্থান নেই। তবে, আল কুরআনের দৃষ্টিতে আত্মার অমরতা অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য এবং জীবনের নৈতিক ও জৈবিক দাবি মিটায়। আল কুরআনের মতে অহং-এর কালিক আরম্ভ এবং মৃত্যুর পর জগতে ইহার পুনরাবর্তন ঘটে না। মানুষের জৈবিক পরিণতি যাই ঘটুক না কেন, তার আত্মিক সত্তার বিলোপ নেই। কাজেই মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিলয় সাধন ঘটবে না।

মানুষ স্বোপার্জিত গুণারাজির দ্বারা ব্যক্তিগত অমরতা লাভ করে। মানুষের অহং আত্মবিকাশও ক্রমবিবর্তনের ব্যক্তিকেন্দ্র। নাজাত বা মুক্তিলাভের পূর্ব পর্যন্ত মানবাত্মা সংগ্রাম করতে থাকবে।

মাওলানা রুমীর মতে মানুষের আবির্ভাব অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার সর্বশেষ স্তর নয়। মৃত্যুর পর মানুষের আত্মিক সংগ্রাম চলতে থাকবে এবং মানবাত্মা ঐশী গুণ লাভ করবে। কিন্তু এই স্তরও অভিব্যক্তির শেষ স্তর নয়। মানবাত্মা স্বয়ং আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত (ফানা ফিল্লাহ) না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। মানবজীবন অখণ্ড ও বিরামহীন। আল্লাহ্ পাক শ্রেষ্ঠতম ও বৃহত্তম আলোকমণ্ডলীর অধিকারী (نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ) এই শ্রেষ্ঠতম ও বৃহত্তম আলোকমণ্ডলী হতে আলোক লাভ করবার জন্য মানব জীবন সতত সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। মৃত্যুর পর মহাজীবনের অস্তিত্ব ইসলামি বিশ্বাসের এক প্রয়োজনীয় শর্ত। এই বিশ্বাস মানবজীবনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ইহা অবহেলিত ও নিরাশ প্রাণে আশার প্রদীপের আলোক সঞ্চারী। পক্ষান্তরে, ইহা পাপ ও দুষ্টতার আতিশয্যের প্রতিবন্ধক। পরকালে অবিশ্বাস মানুষের নৈতিক শক্তিহীনতার কারণ।

ইসলামে জান্নাত ও জাহান্নাম স্থান পরিবর্তন নয় এবং ইহা কালিক ও মানসিক অবস্থারই প্রতিবেদক। মানুষ সৎ ও অসৎ কর্মের দ্বারা জান্নাত ও জাহান্নামের ভাগীদার হয়। বস্তুতঃ সৎকর্মের সুফল স্বরূপ মানুষ জান্নাত-সুখ ও অসৎকর্মের প্রতিফলস্বরূপ জাহান্নামে যন্ত্রণা ভোগ করে। ইহা তার আত্মিক ও মানসিক অনুভূতি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে পরকাল প্রধানতঃ মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কেউই বিনা চেষ্টায় ও বিনা সাধনায়, বিনা সংগ্রামে শান্তি ও তৃপ্তিলাভ করতে পারবে না। মৃত্যুর পরও মানুষকে মহাজীবন লাভের জন্য সংগ্রাম করে যেতে হবে। এই সংগ্রাম হবে আত্মিক সংগ্রাম। কাজেই ইসলামের দৃষ্টিতে মানবাত্মা অমর, অক্ষয়, চিরঞ্জীব ও চির বর্তমান।

১০। ইবনে মাশকাওয়াথ একজন প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক। 'রূহ' (Soul) বা আত্মা সম্পর্কে তাঁর অভিমত এই যে, রূহ বা আত্মা আধ্যাত্মিক সত্তা। আধ্যাত্মিক সত্তা এই কারণে যে, তা একই সময়ে বহু বস্তু বা গুণের সংবেদন লাভ করতে পারে। কিন্তু দেহ বা জড়বস্তুর পক্ষে

তা সম্ভব নয়। আত্মা একই সময়ে সাদা, কালো, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। কিন্তু দেহ ও জড় তা পারে না। রূহ বা আত্মা আধ্যাত্মিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রত্যয় (Ideas) উপলব্ধি করতে সক্ষম। অতএব আত্মার জ্ঞান শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি বলেন যে, সংবেদন (Sensation) জ্ঞানের সর্বনিম্নমান। তাঁর মতে সংবেদন প্রথমে উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পরিণত হয় এবং তারপর আত্মার বিচার শক্তি বলে তা প্রকৃত জ্ঞানে পরিণত হয়। আত্মার সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক নাম হলো আত্মচৈতন্য। এই আত্মচৈতন্যের মাঝেই কর্তা, কর্ম, জ্ঞাত ও অজ্ঞেয় সব একীভূত হয়। আত্মা অমর। যেহেতু আত্মা আধ্যাত্মিক সত্তা।

আত্মা ঊর্ধাভিমুখী বা নিম্নাভিমুখী হতে পারে। উহা উর্ধে প্রজ্ঞার দিকে ধাবিত হতে পারে অথবা নিম্নে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির দিকে নেমে আসতে পারে। আত্মার ঊর্ধাভিমুখিতাকে প্রজ্ঞায় প্রত্যাগমন বলা হয়। ঊর্ধাভিমুখিতার জন্য আত্মা নিজের মধ্যে বিলয়প্রাপ্ত হয় এবং আল্লাহর সাথে একীভূত হয়। আল্লাহ অনুপম। তিনি তাঁর মহত্ত্ব আত্মার উপর বর্ষণ করে থাকেন। এর জন্যই আত্মা তাঁর দিকে ধাবিত হয়। তাঁর অপার মহিমা উপলব্ধি করে আত্মা পূর্ণতা লাভ করে। এখানেই আত্মা মুক্তির আস্বাদ লাভ করে। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি অভিলাষী আত্মা নিজ হতে দূরে সরে যায়। এটাই তার নিম্নাভিমুখিতা।

১১। রূহ সম্পর্কে ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর ধারণার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে এই যে, 'রূহ' জগতের যাবতীয় বস্তু হতে স্বতন্ত্র—মানুষের আসল সত্তা। আল কুরআনে ঘোষিত হয়েছে—"আল্লাহ তাঁর আত্মা মানুষের মাঝে প্রবিষ্ট করিয়েছেন।" সূর্য যেমন জগতের বস্তুসমূহের উপর কিরণপাত করে সেগুলোকে প্রাণ দীপ্ত করে তোলে, তেমনি ঐশী আলোক রূহ দেহের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে একে স্পন্দনময় করে তোলে।

দার্শনিকদের মতে আত্মা অমর। এই মতের বিরোধিতা করে ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেছেন যে, আত্মা এবং দেহ উভয়ই অমর। জন্মের পরে যেমন দেহ ও আত্মার মিলন হয়, তেমনি হাশরের দিনে দেহ ও আত্মার মিলন হবে। তিনি বলেন যে, যেহেতু আত্মার ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রকার (Category) প্রযোজ্য নয়, তাই আত্মার কোনো পরিমাণ নেই। আত্মা যদিও শ্রেষ্ঠ তবুও এর কোনো আকার নেই। আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।

আল্লাহ পাক যেমন জগত শাসন করেন, তেমনি আত্মাও দেহকে শাসন করে থাকে। আল্লাহর প্রধান সিফাত বা গুণ হলো ইচ্ছা। মানুষের আত্মারও প্রধান গুণ ইচ্ছা। বলা হয়েছে—

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ -

অর্থাৎ যে নিজেকে চিনেছে, সে অবশ্যই তার প্রভুকে চিনেছে। সুতরাং আত্মবিকাশের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহকে জানতে পারে।

মানুষের আত্মার প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণ করবার উদ্দেশ্যে ইমাম গাযযালী (রহঃ) তিনটি জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।

(ক) عَالَمُ الْمُلْكِ আলামুল মুলক। উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, পরিদৃশ্যমান ও পরিবর্তনশীল জগত।

(খ) عَالَمُ الْمَلَكُوْتِ আলামুল মালাকুত। ইহা অপরিবর্তিত, চিরন্তন, জ্যোতির্ময় জগত। প্রথম জগত এই জগতের ছায়া মাত্র।

(গ) عَالَمُ الْجَبَرُوْتِ আলামুল জাবারুত। উহা উপরোক্ত দুটি জগতের মধ্যবর্তী। আত্মা এই জগতে অবস্থান করে। আত্মা সকল সময় ঐশী জগতের দিকে নিবদ্ধ থাকে। আত্মিক শক্তি বলেই মানুষ ঐশী জগতের সাথে সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হয়। বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে এর অবস্থিতি। সাধনা অনুযায়ী এর স্তর নির্ধারিত হয়ে থাকে। সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছুতে পারলে মানবাত্মা নূরে এলাহীর দর্শন লাভ করতে পারে। একমাত্র নবীগণ, সুফীগণ, সাধকগণ ও আউলিয়াগণ এই স্তরে পৌঁছতে পারেন। সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইমাম গাযযালী (রহঃ) আত্মা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাতে পেরেছেন।

১২। মানবদেহ গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে এ পর্যায়ে কিছুটা আলোচনা করা দরকার। কেননা, মানবদেহের সাথে যে রূহের সম্পর্ক সেই সম্পর্ক অন্য কোনো সৃষ্টির মাঝে পরিদৃষ্ট হয় না। মানুষ ছাড়া অন্যান্য সৃষ্টির মাঝেও প্রাণ আছে। যেমন গাছ, মাছ ইত্যাদি। গাছের প্রাণ, মাছের প্রাণ মানব প্রাণের মতো নয়। মানবদেহ দুই ধরনের প্রাণ ধারণ করে থাকে। (ক) জৈবিক প্রাণ এবং (খ) আল্লাহর নির্দেশঘটিত আসল প্রাণ বা রূহ।

বস্তুতঃ মানবদেহের গঠন প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ প্রদান করা হয়েছে আল কুরআনে। সূরা মুমেনুনের ১২, ১৩ এবং ১৪ নং আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ -

অর্থাৎ এবং নিশ্চয়ই আমি মানুষকে মৃত্তিকার উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছি।

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِيْنٍ -

অর্থাৎ তারপর আমি ত কে শুক্রবিন্দুরূপে এক নিরাপদ স্থানে স্থাপন করি।

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً -

অর্থাৎ তারপর আমি সেই শুক্র বিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করি।

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً -

অর্থাৎ পুনরায় সেই জমাট রক্তকে গোশতপিণ্ডে পরিণত করি।

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ عِظَمًا -

অর্থাৎ তারপর ঐ গোশতপিণ্ড থেকে অস্থি তৈরি করি।

فَكَسَوْنَا الْعِظَمَ لَحْمًا -

অর্থাৎ তারপর সেই অস্থিকে গোশ্‌ত দ্বারা ঢেকে দেই।

ثُمَّ اَنْشَانَهُ خَلْقًا اٰخَرَ -

অর্থাৎ তারপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি।

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ -

অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ পাক তিনি কত মহান।

এই আয়াতসমূহের আলোকে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, মানবদেহের গঠন প্রক্রিয়া নানা রকম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে। বহু রূপান্তরের ঘাট পার হয়ে মানুষ নামের এক জীবিত ও বুদ্ধি সম্পন্ন সৃষ্টি আত্মপ্রকাশ করে। পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনের ধাপগুলো হচ্ছে এই ঃ

(ক) মৃত্তিকার নির্যাস (سُلَٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ) বা মাটি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ পাকের কুদরতের শেষ নেই, মহিমার অন্ত নেই। তাঁর সৃষ্টি কৌশলের এক অপূর্ব নিদর্শন হলো মানুষ। তাই মানুষের স্মরণ রাখা দরকার যে, সে মাটির মানুষ। আল্লাহ্ পাক তাকে মাটি থেকেই পয়দা করেছেন। এই পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাক সরাসরি মাটির দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন। আর আদম (আঃ)-এর সন্তানদের সৃষ্টি স্থলেও রয়েছে মাটির উপাদানই। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাক মাটি (طِيْنٍ) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আল্লামা কালবী (রহঃ) বলেছেন ঃ আলোচ্য আয়াতের (طِيْنٍ) অর্থাৎ মাটি শব্দ দ্বারা হযরত আদম (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। প্রখ্যাত মুফাসসের কাতাদাহ (রহঃ)ও এই মতই পোষণ করেছেন।

আর আলোচ্য আয়াতের سُلَٰلَةٍ অর্থাৎ নির্যাস শব্দ দ্বারা সেই প্রবহশীল পানি বা শুক্রবিন্দুকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা মানুষের পৃষ্ঠদেশ হতে বের করা হয়। এই মত প্রকাশ করেছেন তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম একরামা (রহঃ)। আর তাফসীরে মুয়ালিমুত তান্‌জীলের রচিয়তা আল্লামা বগভী (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে سُلَٰلَةٍ শব্দটির অর্থ হচ্ছে পানির নির্যাস বা শুক্রের নির্যাস।

আল্লামা ইবনে কাছির (রহঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুসনাদে আহমাদ-এ সংকলিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। এতে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে একমুষ্টি মাটি দ্বারা পয়দা করেছেন, যা সারা পৃথিবী থেকে বাছাই বা চয়ন করা হয়েছিল। আর এজন্যই আদম সন্তানের বর্ণ ও আকার হয়েছে বিভিন্ন প্রকার। কেউ কালো, কেউ সাদা, কেউ সুশ্রী, কেউ বিশ্রী বা কদাকার, কেউ লাল, কেউ মিশ্র বর্ণের। আবার তাদের মাঝে কেউ নেকবখত ও পুণ্যবান এবং কেউ বদবখত ও বদকার। মানব সৃষ্টির সূচনাতেই এই অবস্থার পরিবর্তন

ঘটতে থাকে। এ পর্যায়ে পিয়ারা নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীস খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ মৃত্যুর পর মানুষের সারা শরীর পচে যায়। শুধু পৃষ্ঠের হাড় পচে না। সেই হাড়ের উপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি বিকাশ অব্যাহত থাকে। আর হাড়ের উপর গোশতের আস্তরণ রাখা হয়, যাতে তা গোপন, নিরাপদ ও শক্তিশালী থাকে। এরপর তার মাঝে রূহ ফুঁৎকার করা হয়। তখন সে জীবন্ত মানুষরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

(ক) শুক্রবিন্দুরূপে মাতৃজঠরে স্থাপনকরণ। আলোচ্য আয়াতের نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ অর্থাৎ শুক্রবিন্দুকে নিরাপদ স্থানে রাখার বিষয়টি একথাই প্রমাণ করে যে, মাটির নির্যাস হতে সৃষ্টি শুক্রবিন্দু (نطفة) মাতৃজঠরে স্থানলাভ করে এবং জঠরের উত্তাপ গ্রহণ করে। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যতই উত্তাপ গ্রহণ করতে থাকে ততই সেই শুক্রবিন্দুর পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

(গ) শুক্রবিন্দু জমাট (عَلَقَةً) শব্দটি সুস্পষ্ট বলে দেয় যে, মাতৃজঠরে শুক্রবিন্দু উত্তাপ গ্রহণ করার ফলে জমাট রক্তে পরিণত হয়। আরবি (عَلَقَةً) শব্দটির দ্বারা কখনো কখনো জোঁক বুঝানো হয়। এতে বুঝা যায় যে, জমাট রক্ত জোঁকের মতো দেখায়।

(ঘ) জমাট রক্তকে গোশতপিণ্ডে রূপান্তরিতকরণ। মাতৃ উদরে অবস্থিত জমাট রক্তসদৃশ বস্তুটি আরও উত্তাপ গ্রহণ করে মাংসপিণ্ডে (مُضْغَةً) রূপান্তরিত হয়। বস্তুটি ক্রমেই শক্ত হতে থাকে। এই অবস্থায়ও একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পরিবর্তনের কাজ চলতে থাকে।

(ঙ) রক্তপিণ্ড হতে অস্থি তৈরিকরণ। এই আয়াতে فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا। অর্থাৎ রক্তপিণ্ডকে অস্থিতে বা হাড়ে রূপান্তরিত করি কথাটির দ্বারা বুঝা যায় যে, এ পর্যায়েও রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তরের ভিতর দিয়েই জমাট রক্ত আকারের বস্তুটি অস্থি বা হাড়ে পরিণত হয়।

(চ) অস্থি বা হাড়কে গোশতের দ্বারা আবৃতকরণ فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا। আয়াতে সুস্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, অস্থি বা হাড়ও এক অবস্থায় থাকে না। ধীরে ধীরে এর উপর গোশতের প্রলেপ তৈরি হতে থাকে।

'পরিবর্তনের' এই ধারাবাহিকতা যখন একটি স্তরে উন্নীত হয় বা শক্তি সঞ্চার করে তখন মানবদেহের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহ পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত হয়ে উঠে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সুঠাম আকার ধারণ করে। আকার এবং আয়তন ক্ষুদ্র অথবা ছোট হলেও দেহ সৃষ্টির কাঠামোগত দিক পূর্ণতা লাভ করে।

(ছ) অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তোলা। এই পর্যায়টি আল কুরআনে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ

ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ -

অর্থাৎ তারপর একে আমি অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। এখানে অন্য এক সৃষ্টি خَلْقًا اٰخَرَ বলতে কী বুঝায়, তা অনুধাবন করা খুবই দরকার। আসুন, এবার এদিকে লক্ষ্য করা যাক।

অস্থি বা হাড়কে গোশতের প্রলেপ দ্বারা আচ্ছাদিত করায় যে দেহটি পর্যায়ক্রমে তৈরি হয় এবং আল্লাহর নির্দেশঘটিত রূহ ধারণ করার যোগ্যতা অর্জিত হয়, তখন আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে এতে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। ফলে একটু পূর্বে যা ছিল জড়পদার্থ ও নিশ্চল, তা এক জীবন্ত সৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। এ কথাটি অন্য এক আয়াতে এভাবে এসেছে যে, অস্থির উপর যখন গোশতের প্রলেপ প্রদান করা হয় এবং তা নড়াচড়া করতে থাকে। শুধু তাই নয়, মানুষ যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখনও তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। যেমন বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বৃদ্ধ। এসকল পরিবর্তনের সিঁড়ি বেয়েই মানবজীবন এগিয়ে চলে সম্মুখের পানে। কত রং ও রূপের বাজার বসে মানুষের মাঝে, তা বলাই বাহুল্য। এদিকেই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে এই আয়াতে ঃ

وَفِىْ اَنْفُسِهِمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ -

অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের মাঝে ও আল্লাহ পাকের সৃষ্টি নৈপুণ্যের বিস্ময়কর নিদর্শনাদি রয়েছে তবে কি তোমরা লক্ষ্য কর না?

তবে অন্য এক সৃষ্টি خَلْقًا اٰخَرَ-এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইমাম কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো সেই নবজাতক শিশুর মুখে ও মাথায় চুল বের হওয়া। এটি একটি সৃষ্টি কৌশলের নতুন দিক।

আর হযরত মুজাহেদ (রহঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে মুফাসসের ইবনে জোরায়েজ (রহঃ) বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে নতুন এক সৃষ্টির অর্থ হলোড়া পরিপূর্ণ যৌবন লাভ করা, যৌবনের পূর্ণ অঙ্গনে উপনীত হওয়া।

এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন যে, নতুন এক সৃষ্টি خَلْقًا اٰخَرَ-এর তাৎপর্য হল মাতৃগর্ভে মানব শিশুটির নর অথবা নারীতে রূপান্তরিত হওয়া।

প্রখ্যাত ভাষ্যকার আওফী (রহঃ) বলেছেন যে, خَلْقًا اٰخَرَ বা নতুন সৃষ্টি কথার তাৎপর্য হলো মানবজীবনে বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা দেয়া। যেমন জন্মলাভের পর দুধপান করা, ধীরে ধীরে নড়াচড়া ও বসার সামর্থ্য অর্জন করা এবং পর্যায়ক্রমে দণ্ডায়মান হওয়া, হাঁটার চেষ্টা করা, শক্ত খাবার গ্রহণে সমর্থ হওয়া এবং শৈশব হতে যৌবনে উপনীত হওয়া ইত্যাদি। এগুলো সবই হলো خَلْقًا اٰخَرَ বা অন্য সৃষ্টির বাস্তব রূপায়ণ।

মোটকথা, মানব সৃষ্টির সাতটি স্তরের কথা আলোচ্য আয়াতগুলোতে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম স্তর হচ্ছে মৃত্তিকার সারাংশ। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে শুক্র বা বীর্য। তৃতীয় স্তর হচ্ছে জমাট রক্ত। চতুর্থ স্তর হচ্ছে মাংসপিণ্ড। পঞ্চম স্তর হচ্ছে অস্থি পিঞ্জর। ষষ্ঠ স্তর হচ্ছে অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃতকরণ। এ পর্যন্ত পরিপূর্ণ সৃষ্টির ফলে এক প্রকার ধারণ করার শক্তি অর্জিত হয়। এটাই হচ্ছে জৈব রূহ। এরপর সপ্তম স্তর হচ্ছে মানব সৃষ্টির পূর্ণত্ব দান বা রূহ সঞ্চারকরণ। রূহ সঞ্চারের পরই মানব সৃষ্টির পূর্ণতা অর্জিত হয়।

এ প্রসঙ্গে ইবনে আবি শায়বা (রহঃ) স্বীয় মোসনাদ গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি বর্ণনা সংকলন করেছেন। এই বর্ণনাটি তফসীরে কুরতুবীতে আলোচ্য আয়াতের তফসীরে উদ্ধৃত করেছেন। মূল ঘটনাটি হচ্ছে এই যে, একবার হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাঁর দরবারে সমবেত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা বলুন, শবে কদর রমজান মাসের কোন তারিখে হয়? উত্তরে সবাই এই বলে পাশ কাটিয়ে

গেলেন যে, আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। সমবেত সাহাবীদের মাঝে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)ও ছিলেন এবং তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। এ ব্যাপারে ওমর ফারুক (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, 'হে আমিরুল মুমেনীন!' আল্লাহ পাক সপ্ত আকাশ ও সপ্ত জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের সৃষ্টিও সপ্তস্তরে সম্পন্ন করেছেন আর সাতটি বস্তুকে মানুষের খাদ্য হিসেবে চয়ন করেছেন। সুতরাং আমার তো মনে হয় যে, শবে কদর রমজানের সাতাশতম তারিখেই হবে। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এই অভিনব উত্তর শ্রবণ করে উপস্থিত সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, এই বালকের মাথার চুলও এখন পর্যন্ত পুরোপুরি গজায়নি। অথচ সে এমন কথা বলেছে যা আপনারা বলতে পারেননি। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মানব সৃষ্টির সপ্তস্তর বলে একথাই বুঝাতে চেয়েছেন, যা উল্লিখিত আয়াতসমূহে বিবৃত আছে। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মানুষের যে সাতটি খাদ্যবস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন, তা আল কুরআনে সূরা আবাসায় বিবৃত আছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ

فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا وَّحَدَائِقَ غُلْبًا وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا۔

অর্থাৎ এতে আমি উৎপন্ন করি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সব্জি, যয়তুন, খেজুর, বহু বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদির খাদ্য।

এই আয়াতসমূহে (আয়াত নং ২০, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১) আটটি বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর প্রথম সাতটি বস্তু অর্থাৎ শস্য, আঙ্গুর, শাক-সব্জি, যয়তুন, খেজুর, বহুবৃক্ষ ও ফল মানুষের খাদ্য বলে স্বীকৃত। আর সর্বশেষ বস্তুটি হচ্ছে গবাদি পশুর খাদ্য।

১৩। মানব সৃষ্টির সর্বশেষ স্তরটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই স্তরে মানবদেহে রূহ সঞ্চারিত হয় এবং জীবন সৃষ্টি হয়। এই خَلْقًا اٰخَرَ বলে তাই বিশ্লেষিত হয়েছে। একে এক নতুন সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করার কারণ হচ্ছে এই যে, মানব সৃষ্টির প্রথম ছয়টি স্তর, উপাদান ও বস্তুজগতের বিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। যেমন মাটির নির্যাস, রক্ত, শুক্র, গোশত, অস্থি এবং অস্থির উপর গোশতের আচ্ছাদন সংযোজন

সবকিছুই ছিল বস্তু বা উপাদান ভিত্তিক। কিন্তু সপ্তম স্তর, বস্তুজগতের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং তা অন্য জগতের রূহের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই স্তর বিশেষতঃ রূহ দেহে স্থানান্তরিত হওয়ার স্তর। خَلْقًا اٰخَرَ বলতে এই রূহ সঞ্চারকেই বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) শা'বী, মুজাহিদ, ইকরামা প্রমুখ তফসীরবিদগণ এক নতুন সৃষ্টি বলতে রূহ সঞ্চারকেই গ্রহণ করেছেন। মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করার পর যখন তা শক্তি অর্জন করে, তখন আলমে আরওয়াহ (عَالَمِ الْاَرْوَاح) তথা রূহ জগত থেকে রূহকে এনে আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই জৈব রূহের সাথে এক নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন। এই দেয়ার হেকমত বা মর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া মানুষের সাধ্যাতীত। এই প্রকৃত রূহকে মানব সৃষ্টির বহু পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। অনাদিকালে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এসকল রূহকে আলমে আরওয়াহ তথা রূহের জগতে সমবেত করে তাদের নিকট হতে এই স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেছিলেন এই বলে যে, اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তখন সবাই সমস্বরে বলেছিল بَلٰى হাঁ। মানবদেহের সাথে এই স্বীকৃতিদানকারী রূহের সম্পর্ক স্থাপিত হয় তখন, যখন মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টির কাজ পূর্ণ হয়ে যায়। এখানে 'রূহ সঞ্চার' বলতে জৈব রূহের সাথে প্রকৃত রূহের সম্পর্ক স্থাপনকেই বুঝতে হবে। প্রকৃতপক্ষে মানব জীবন এই প্রকৃত রূহের সাথে সম্পর্ক রেখেই চলে। মানুষ যখন ঘুমায় তখন প্রকৃত রূহ জৈব রূহের সাথে একটি সূক্ষ্ম সম্পর্ক অব্যাহত রেখে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার মূল জগত আলমে আরওয়াহ-এর দিকে ছুটে যায় এবং সেই জগতে বিচরণ করতে প্রয়াস পায় এবং মূল মালিক আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে। জৈব রূহের সাথে সংশ্লিষ্ট দেহ কাঠামোর সাথে মূল সম্পর্ক এ পর্যায়ে চিরতরে ছিন্ন হয়ে যায় না। মূল রূহ পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে এবং ঘুমন্ত মানুষটি সজাগ হয়ে জগতের কাজে মনোনিবেশ করে।

১৪। পরিশেষে সফলকাম ও বিফল মনোরথ ব্যক্তিদেরকে তাদের পরিচয় তুলে ধরে এই উপসংহারের পরিসমাপ্তি টানতে প্রয়াস পাব।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের মধ্যে কারা সফল এবং কারা বিফল তাদের বিবরণ তুলে ধরে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا۔ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا۔ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا۔

অর্থাৎ আর শপথ প্রাণের/মানুষের, এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর। তারপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সেই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে। এবং সেই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে। (সূরা শামস, আয়াত ৭-৮-৯-১০; পারা ৩০, রুকু-১)

এখানে ৭নং আয়াত وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا-এর দুরকম অর্থ হতে পারে। (ক) শপথ মানুষের প্রাণের এবং তাকে সুবিন্যস্ত করার। এবং (খ) শপথ নফসের এবং তার, যিনি সেটিকে সুবিন্যস্ত করেছেন। এই দুটি অর্থের মাঝে এমন একটি সংযোগ প্রচ্ছন্ন রয়েছে যা অনেকের পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব। অর্থাৎ মানুষের প্রাণ এবং নাফস উভয়কে যদি একই অর্থে জৈব রূহ বলে ধরে নেয়া হয় অথবা জৈব রূহ ও আসল রূহের সমন্বয়ে গঠিত মানুষ ধরা হয়, তাহলে শপথ বাক্যের জবাব

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا۔

এই আয়াতে زَكّٰهَا শব্দ দ্বারা যে নিজের নফসকে পবিত্র করে ও শুদ্ধ করে সে সফলকাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আরবি تَزْكِيَةٌ 'তাযকিয়া' শব্দটির অর্থ হচ্ছে আভ্যন্তরীণ বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ পালন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন করে, সে সফলকাম। বাহ্যিক পবিত্রতার বিষয়টি সকলেরই জানা আছে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ও শুদ্ধতা অর্জন করতে হলে নাফসকে বা রূহকে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অনুগত করে তুলতে হবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র আদর্শকে নিজের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এমনি করেই তাযকিয়ায়ে নাফস হাসিল হওয়ার পথ সুগম হবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি নিজের নাফসকে পাপের পথে

নিমজ্জিত করে ফেলেছে, সে ব্যর্থ হয়েছে। তার এই ব্যর্থতা দুনিয়ার জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না এবং সীমাহীন আখেরাতের জীবনেও তার এই ব্যর্থতা তাকে পদে পদে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত করে ছাড়বে। আলোচ্য আয়াতে دس শব্দটির অর্থ হলো মাটিতে প্রোথিত করা, মাটিতে দাবিয়ে ফেলা। নিজের নাফসকে মাটিতে প্রোথিত করার অর্থ হলো পাপ-পঙ্কিলতার আবর্তে নিজের নাফসকে নিমজ্জিত করে ফেলা।

কোনো কোনো তাফসীরকারক এই আয়াতের অর্থ এভাবে করেছেন ঃ সে ব্যক্তি সফলকাম হয়, যাকে আল্লাহ্ পাক বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করেন এবং সে ব্যক্তি ব্যর্থ হয়, যাকে আল্লাহ্ পাক গোনাহে ডুবিয়ে দেন। এই আয়াতের আলোকে বুঝা যায় যে সকল মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত। সফলকাম ও ব্যর্থ।

এখন 'তাযকিয়ায়ে নাফসের' জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, তা জানা থাকা একান্ত আবশ্যক।

দেহ ও মনের পবিত্রতা অর্জনের জন্য যে পথ অবলম্বন করা দরকার, তাহলো তাসাউফ। তাসাউফ শব্দের মূল ধাতু হচ্ছে 'সওফ'। এর অর্থ পশম। আর তাসাউফের অর্থ পশমি বস্ত্র পরিধানের অভ্যাস। তারপর মরমী তত্ত্বের সাধনায় কারো জীবনকে নিয়োজিত করার কাজকে বলা হয় তাসাউফ। যিনি নিজেকে এরূপ সাধনায় সমর্পিত করেন তিনিই ইসলামের পরিভাষায় সুফী নামে অভিহিত হন।

অতীতে এবং বর্তমানে এই সুফী শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে আরও যে সকল উক্তি করা হয়ে থাকে এর সবকিছুই প্রত্যাখ্যানযোগ্য। সুতরাং এ সকল উক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত না করাই শ্রেয়তর বলে মনে করা হয়।

সুফীবাদ সম্ভাবনাময় এক ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। হিজরি ৫০ বছরের মধ্যে সুফী বলতে ইরাকের সমস্ত মরমীদের বুঝাত। এই সময়ে খুরাসানের সালামাতিয়া মরমীদের বেলায় সুফী শব্দের ব্যবহার হতো না। হিজরি দুইশত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর সুফী শব্দের বহুবচন 'সুফিয়্যা' শব্দটি সমগ্র মুসলিম মরমী সম্প্রদায়ের উপর প্রযুক্ত হতে লাগল। তারপর হতে অদ্যাবধি এটি একটি অন্যতম বিশেষ মুসলিম জীবন রীতিরূপে স্বীকৃত হয়ে আসছে।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর সবা দেশ এবং সব জাতির মধ্যেই মরমী জীবনের প্রতি যে প্রবণতা পরিদৃষ্ট হয়, হিজরির প্রথম দুই শতাব্দীতে ইসলামেও এর অভাব পরিলক্ষিত হয়নি। কিছু কাহিনীর কথা বাদ দিলেও আমরা দেখতে পাই যে, জাহিদ এবং ইবনুল জাওজী সেই যুগের চল্লিশ জনেরও অধিক খাঁটি সুফীর নাম সংরক্ষণ করেছেন। তাদের মরমী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এবাদত-বন্দেগীর আনুষ্ঠানিক আচার পদ্ধতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বাস্তবধর্মী জীবনাদর্শের মূর্ত প্রতীক। মুসলিম সমাজ হতে তিনি বৈরাগ্যকে বিদায় দিয়েছিলেন। ইহুদি ও খ্রিস্টানরা যে বৈরাগ্য প্রথার জন্ম দিয়েছিল, তিনি তার মূলোৎপাটন করে বলেছিলেন ঃ

لَا رَهْبَانِيَّةَ فِى الْاِسْلَامِ -

অর্থাৎ ইসলামে বৈরাগ্য বলতে কিছুই নেই। সংসার ত্যাগী বৈরাগ্যের উদ্ভাবন করেছিল খ্রিস্টানরা। তাদের অবস্থাকে তুলে ধরে আল কুরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ "কিন্তু সন্ন্যাসবাদ তো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল, আমি তাদেরকে এর বিধান দেইনি, অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি।" (সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ২৭; পারা ২৭, রুকু-৪)।

এখানে رَهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوْهَا শব্দের দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, সন্ন্যাসবাদ বা বৈরাগ্য ছিল খ্রিস্টানদের উদ্ভাবিত ব্যাপার। তাদের এই উদ্ভাবন ছিল স্বাভাবিক প্রকৃতির চাহিদার বিপরীত। এই বৈপরীত্যকে ইসলাম কোনো কালেই সমর্থন করেনি। বরং ইসলামের পছন্দনীয় জীবন ব্যবস্থা হলো 'যুহ্দ' সম্বলিত জীবনাচার। ইসলাম সমর্থিত যুহ্দ হলো নফল সহ ইবাদতগুলো সম্পন্ন করা এবং সকল প্রকার জাগতিক বস্তুর উপর এতটা আকর্ষণ না থাকা যাতে মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে যায়। একই সাথে নফল ইবাদতে এতটুকু বাড়াবাড়ি না করা যাতে সংসার জীবনে অনিয়ম দেখা দেয়। খ্রিস্টান সন্ন্যাস পুরুষ ও সন্ন্যাসী নারী বিবাহ বিবর্জিত জীবন যাপনকে ধর্ম লাভের উপায় বলে মনে করে থাকে। অথচ

ইসলাম এটাকে মোটেই সমর্থন করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ঃ

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِىْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ -

অর্থাৎ "বিবাহ আমার সুন্নাত, যে আমার সুন্নাতকে অবহেলা করবে সে আমার দলভুক্ত নয়।" উপরোল্লিখিত কুরআনের আয়াত এবং হাদীসের আলোকে এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামের সুফীবাদ হলো আল্লাহ এবং তাঁর হাবীব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রবর্তিত নীতি ও আদর্শের সমাহার। তাই তাসাউফের ভিতর দিয়েই একজন মুমিন মুসলমান প্রকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বত লাভে সমর্থ হয় এবং আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য ও কুরবত লাভে কৃতার্থ হয়। এটা আল্লাহ পাকের এক বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ। এ সম্পর্কে আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ -

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের এক বিশেষ করুণা, তিনি স্বীয় বান্দাদের মাঝে যাকে ইচ্ছা করেন এই করুণার দ্বারা বিভূষিত করেন।

পরিশিষ্টের এ পর্যায়ে আমরা মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে এ কামনাই করব– আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে 'রূহ' সম্পর্কে জানার এবং বুঝার তাওফিক দান করেন, আমীন!

উর্দু অনুবাদক কর্তৃক বিবৃত
ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর জীবন কথা

হুজ্জাতুল ইসলাম যায়নুদ্দীন, আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৪৫০ হিজরি সালে তুস নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর মাতৃভূমি গাজালায়। যা 'তুস' নগরের নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম। তিনি আবু হামিদ ইস্ফারায়ী এবং আবু মুহাম্মদ জুওযানীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। প্রথম দিকে তিনি তুস নগরে অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি শিক্ষা সমাপ্তির জন্য নিশাপুরে ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলীর নিকট চলে যান। ইমাম গাযযালী ইমাম শাফিয়ীর (রহঃ) মাযহাবের মূলনীতি ও শাখা বিষয়াদির প্রসিদ্ধ বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

ইমাম গাযযালীর প্রণীত পুস্তকের সংখ্যা চারশো ভলিয়মে পরিণত হয়। এহয়াউল উলূম তিনি এক হাজার পাঁচশো দিনে প্রণয়ন করেন। 'হাল্লি-মাসায়েলে-ই গামিযা' গ্রন্থের প্রণয়ন মহাগ্রন্থ এহইয়াউল উলূম লিখার পর সাব্যস্ত হয়। "তাফসীর ইয়াকুতুত্তাবীল" তিনি ৪০ ভলিয়ামে লিখেছেন। কিমিয়াই সাআদাত, বাসীত, অসীত, অজীয, খুলাসা, মুস্তাসফা, তিহফাতুল ফালাসিফা, মিহাকুন্ নযর, মিয়ারুল ইলম, মাকাসিদ, মাফতুনবিহি আলা গায়বিহি, জাওয়াহিরুল কুরআন, আল মাকসাদুল আসনা ফী শারহি আসমাইল হুসনা, মিশকাতুল আনওয়ার কিতাবাদিও ইমাম গাযযালীর রচিত। আর 'মাসহুল' গ্রন্থ রচনা করে তিনি যখন তাঁর উস্তাদ ইমামুল হারামাইন-এর নিকট নিয়ে গেলেন তখন তিনি ইমাম গাযযালীকে (প্রশংসা করে) বলেছিলেন ঃ

"তুমি আমাকে জীবিতাবস্থায়ই দাফন করে দিলে।" অর্থাৎ তোমার প্রণীত গ্রন্থাদির সামনে আমার গ্রন্থাদির মূল্য রইল না। বাগদাদের শাসনকর্তা কর্তৃক তিনি যখন বাগদাদের মাদরাসা-ই-নিযামিয়ায় শিক্ষকতার পদ পেলেন তিনি ওখানে বহুদিন অধ্যাপনা করতে থাকেন।

তাঁর অধ্যাপনা এত জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে, তিনি যখন মাদ্রাসা হতে ঘরে ফিরতেন পাঁচশো ফকীহ (ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞ) তাঁর ডানে-বামে আশপাশে ভীড় জমাতেন। অতঃপর তিনি দুনিয়াবিমুখ (زُهْدٌ) হয়ে উঠলেন। আর অধ্যাপনা এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যস্ততা পরিত্যাগ করলেন। আর হজ্জে গমনের প্রস্তুতি নিলেন। বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ হতে কৃতকার্য হয়ে তিনি সিরিয়া ফিরে গেলেন। দীর্ঘকাল সেখানে আত্মশুদ্ধির কঠিন সাধনারত রইলেন। অতঃপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে চলে গেলেন। ওখান থেকে মিশরে গেলেন। কিছুদিন ইস্কান্দারিয়াতে রইলেন। পুনরায় তিনি সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করলেন। কিছুদিন পর তিনি তাঁর প্রিয় তুস নগরে আগমন করলেন। আর জীবনের শেষ নাগাদ এখানেই অবস্থান করলেন। একটি মাদ্রাসা আর একটি খানকাহ (আত্মশুদ্ধির আশ্রম) প্রতিষ্ঠিত করলেন। আর স্বীয় সময় শিক্ষাদানে এবং অন্যান্য কল্যাণকার্যে বণ্টন করে দিলেন। অনন্তর, সোমবার জমাদিউস-সানির ৫০৫ হিজরি সালে তিনি ৫৫ বছর বয়সে ঊর্ধ্বজগতের বাসিন্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য রওয়ানা হয়ে গেলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যেন উচ্চতর জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন।

সমাপ্ত